প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম ১০/২এ টেমার লেন / কল-৯
মুদ্রণ : গোপাল পাল/স্টার প্রিন্টিং প্রেস ২১এ রাধানাথ বোস লেন / কল-৬

ফরাসী সাহিত্য ও রাজনীতির, বিশেষ করে প্রতিরোধ-আন্দোলনের কিম্বদন্তী পুরুষ লুই আরাগঁর জন্ম ১৮৯৭ সালের ৩রা অক্টোবরে, পারির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। আরাগঁ তাঁর পারিবারিক নাম নয়, ঠিক ছদ্মনামও বলা যায় না, বরং বলা যায় স্বআরোপিত নাম। প্রকৃত নাম গ্র্যাঁদেল। তিনি ছিলেন লুই আঁদ্রিয়োর অবৈধ সন্তান। কিন্তু নিজের জন্ম নিয়ে আরাগঁর কোনো অস্থিরতা ছিলো না। সামাজিক স্বীকৃতিবিহীন ভাবে মানুষ হলেও, আশৈশব আরাগঁ ছিলেন অসম্ভব জেদী আর আত্মবিশ্বাসী, পরবর্তীকালে যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতেই সাহায্য করেছিলো। শৈশব ও কৈশোর কাটে নিঃসঙ্গতা আর গভীর পড়াশোনার মধ্যে। দুর্লভ ছিলো তাঁর স্মৃতিশক্তি। ছাত্রাবস্থাতেই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, সহকারী চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়। অসম সাহসিকতার জন্যে সামরিক সম্মানও লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তিনি নানান সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারাটা দুনিয়া জুড়ে যখন চলছে গভীর মন্দা, প্রায় গোটা ইউরোপের মানুষ যখন বিধ্বস্ত; অন্যদিকে তখন রুশদেশের শ্রমিকরা জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে সমাজতন্ত্র। এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে সচেতন কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁদের জীবন ও আদর্শের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চাইছিলেন, ব্যাপৃত ছিলেন অস্তিত্বের আনন্দে নয়, অস্তিত্বের রহস্য আর বিস্ময় অনুসন্ধানে। এই অনুসন্ধান খুব একটা সহজসাধ্য ছিলো না। এ অনুসন্ধানে ছিলো আত্মনির্যাতন, ছিলো নিষ্ঠা, ছিলো চেতনার গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেরণা। এই সত্য-উপলব্ধির অনুপ্রেরণাতেই তরুণ আরাগঁকেও অতিক্রম করতে হয়েছে তৎকালীন ফরাসী সাহিত্য-আন্দোলনের নানান স্তর—দাদাইজম, স্যুররিয়ালিজম, কিউবিজম, সিম্বলিজম, রিয়ালিজম ইত্যাদি।

আজন্ম কালই লুই আরাগঁ ছিলেন বিদ্রোহী। প্রচলিত সাহিত্য-রীতি আর ধ্যান-ধারণাগুলোকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই লুই আরাগঁ, আঁদ্রে ব্রতঁ (১৮৯৬-১৯৬৬) এবং ফিলিপ সুপো (১৮৯৭-১৯৬৭) ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'লিতেরাত্যুর' পত্রিকা। জুরিখে 'দাদা' আন্দোলনের মূলে প্রবক্তা ছিলেন রুমানিয়ার প্রবাসী কবি ত্রিস্তাঁৎসারা (১৮৯৬-১৯৭১)। যাকিছু কৃত্রিম আর সাজানো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই 'দাদা' আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে

ওয়া পারিতে আসার পর আরাগঁদের 'দাদা' আন্দোলন আরও তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু দুতিন বছর পর, ১৯২২ সাল থেকে এই আন্দোলনের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। পল এলুয়ার (১৮৯৫-৫২), ব্রঁত, আরাগঁ প্রমুখেরা চান গভীর কল্পনা আর আকাঙ্খার সম্পূর্ণ মুক্তি, চান স্বপ্ন আর বাস্তবকে মূর্ত করে তুলতে। এরই প্রেক্ষাপটে জন্ম স্যুররিয়ালিজমের, পরবর্তীকালে যা দেশ ও কালের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বের বহু তরুণ কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করতে পেরেছিলো, আঘাত হানতে পেরেছিলো অবক্ষয়ী সমাজের একেবারে মর্মমূলে। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় এঁদের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'লা রেভোল্যুসিয় স্যুররেয়ালিস্ত' বা 'স্যুররিয়ালিস্ট বিপ্লব'। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন বহু তরুণ কবি শিল্পী সাহিত্যিক। সাহিত্য ও রাজনীতির মেলবন্ধনে আরাগঁর ভূমিকা ছিলো আবার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। আগেই বলেছি, অসম্ভব জেদী আর সত্যানুসন্ধানী আরাগঁ চিরটা কালই ছিলেন বিদ্রোহী। ফলে লেনিন-অনুপ্রাণিত রুশ বিপ্লব বা সাম্যবাদের প্রতি তিনি যে অনুরক্ত হয়ে উঠবেন, সেটাই ছিলো স্বাভাবিক। ১৯২৭ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন।

ইতিমধ্যেই লুই আরাগঁ কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন: গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক—সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর ছিলো সুস্পষ্ট। কেননা পর্যায়ক্রমে তিনি যে সাহিত্য-আন্দোলনই অতিক্রম করুন না কেন, তাঁর ভাবনার শিকড় ছিলো ঐতিহ্যময় ফরাসী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে, মনন ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে তিনি ছিলেন দুর্লভ এক প্রতিভার অধিকারী। ফলে, তাঁর ক্ষেত্রে, গদ্য ও পদ্যের সীমারেখা মুছে একাকার হয়ে যেতো। তাঁর ছ-সাত বছর বয়েসের এমনও কয়েকটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে মনে হবে বুঝি তাঁর পরিণত বয়েসেরই ফসল। কবিতা লিখতে শুরু করেন দশ বছর বয়েস থেকে। ১৯২০ তে অবশ্য প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফ্যো দ্য যোয়া' এবং ১৯২১-এ প্রথম উপন্যাস 'আনিসে উ ল্য পানোরামা'। ১৯২৩ সালে আরাগঁ বার্লিন হল্যান্ড লন্ডন ইতালি স্পেন ভেনিস পরিদর্শন করেন। ১৯২৩ সালেই প্রকাশিত হয় প্রথম নাটক 'এক রমণীর সন্ধ্যায় মুকুর-বসানো আলমারি' এবং ১৯২৪ সালে গল্প ও নাটিকার সংকলন 'ল্য লিবেরতিনাজ'। স্যুররিয়ালিস্ট পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে কাব্যগ্রন্থ 'ল্য মুভমাঁ পেরপেত্যুয়েল' ১৯২৫ এবং উপন্যাস 'ল্য পেইজাঁ দ্য পারি' বা 'পারির কৃষক' ১৯২৬ উল্লেখযোগ্য।

সাম্যবাদের প্রতি অনুরক্ত হবার পর আরাগঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯২৮ সালের ৫ই নভেম্বরে 'লা কুপোলে' পানশালায় এলসার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণটি। বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি (১৮৯৩-১৯৩০) পারিতে এসেছিলেন আরাগঁর সঙ্গে পরিচয় করতে। মায়াক-

ভূমিকই তাঁর শ্যালী এবং বান্ধবী এলসা ত্রিয়োল (১৮৯৬-১৯৭০)-এর সঙ্গে আরাগ'র আলাপ করিয়ে দেন। আরাগ'র জীবনে সেটা একটা স্মরণীয় দিন। এলসা ছিলেন গর্কি'র স্নেহধন্যা এক রুশ লেখিকা, বয়েসে আরাগ'র চাইতে বছর খানেকের বড় এবং ১৯২৩ সালেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পূর্ব প্রণয়িনী ন্যান্সি কানার্ডের সঙ্গে আরাগ'ও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন কিছু-দিন আগে। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তেই এলসা এবং আরাগ' পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন, তারপর প্রণয় থেকে পরিণয়। সেই থেকে আনন্দ বা বেদনায়, সংকটে অথবা সংগ্রামে আরাগ'র দৈনন্দিন জীবনে এলসা জড়িয়ে ছিলেন ওত-প্রোত ভাবে। আরাগ'র জীবনে, এমনকি ভাবনার গভীরেও, এলসা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ একটা জগৎ, আরাগ'র ভাষায় 'এলসা পাশে থাকলে মনে হয় যেন যুদ্ধের অর্ধেকটাই জয় করা হয়ে গেছে।' পরবর্তীকালে এলসা নিজের লেখ-নীর জোরে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের একজন অগ্রণী লেখিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় আগের চাইতে আরাগ'র অনেক পরিণত কাব্যগ্রন্থ 'লা গ্রাঁদ গেতে' এবং গদ্যগ্রন্থ 'লে ত্রেত দু স্তাইল'। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে আরাগ' মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিপ্লবী লেখক সম্মেলনে যোগ দেন· সঙ্গী ছিলেন এলসা এবং অকৃত্রিম বন্ধু জর্জ সাদুল। রাশিয়া পরিদর্শনের পর আরাগ' 'ফ্রঁ রুজ' বা 'লাল সীমান্ত' নামে একটি কবিতা লেখেন, যেটা ১৯৩১-এর অক্টোবরে প্রকাশিত তাঁর 'পেরসেক্যুতে পেরসক্যাত্যর' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে ফরাসী সরকার ষড়-যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন। কিন্তু বিশ্বের বহু মননীদের তীব্র প্রতিবাদে সরকার সে দণ্ডাদেশ তুলে নিতে বাধ্য হন।

বলা বাহুল্য, যে স্যুররিয়ালিস্ট আন্দোলন একদা পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, সালভাদর দালি, ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকার মতো বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছিলো, নান্দনিকের চাইতে নৈতিক আদর্শের প্রতি যার নিষ্ঠা ছিলো অকৃত্রিম, সেই সাহিত্য আন্দোলন থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় আরাগ'র এই যে পদক্ষেপ, সৃজনশীলতায় এর অবদান ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আত্মিক বিচ্ছেদ, অন্যদিকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্ভাসিত—এই দুই উপলব্ধির সন্ধিক্ষণে বোধ ও আঙ্গিকের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরাগ'র জীবনও যেভাবে দ্রুত আবর্তিত হচ্ছিলো, তাতে তাঁর নিয়মিত জীবিকার পথই আসছিলো রুদ্ধ হয়ে। ঐ সময়ে তিনি অত্যন্ত সাধারণ একটা সাংবাদিকতার কাজ করতেন আর এলসা তৈরি করতেন নানান পুঁতির মালা। বিক্রির জন্যে আরাগ' সেই মালা নিয়ে যেতেন বিভিন্ন দোকানে। 'পেরসেক্যুতে পেরসক্যাত্যর' ছাড়াও আরাগ'র এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'উরা লুরাল' ১৯৩৪ এবং উপন্যাস 'লে ক্লশ

'চোরাচালান', অর্থাৎ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে লুই আরাগঁ ১৯৪১ সালে 'ফিগারো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'লাইলাক আর গোলাপ'-এর মতো শক্তিশালী কবিতাও বৈধ নামে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে 'লে লেত্র ফ্রাঁসেজ' নামে একটি গুপ্ত পত্রিকা প্রকাশনা ও পরিচালনার দায়ে জাক দ্যকুর, জর্জ পলিৎজের, জর্জ দ্যুদাশ ও জাক সলোমঁকে পুলিস গ্রেফতার করে এবং ১৯৪২ সালের মেতে মঁ ভ্যালেরিয়্যাঁর ফায়ারিং স্কোয়াডে নাৎসিরা তাঁদের গুলি করে মারে। নিসে এই খবর পৌঁছোনোর পর, মঁ ভ্যালেরিয়্যাঁর যেসব বন্ধুদের হত্যা করা হয়েছে এবং অন্য সমস্ত শহীদদের স্মরণ করে লুই আরাগঁ 'রোসেলিয়্যাদ' ১৯৪৩ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত যে মর্মস্পর্শী কবিতাটি লিখেছিলেন, 'ন্যোলাতেল', ডিসেম্বর ১৯৪২, সেটিও তিনি বৈধ ভাবেই লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালে তাঁর 'লা মুজে গ্রেভ্যাঁ' বা 'মোমকাজ করা যাদুঘর' প্রকাশিত হয় 'ফ্রাঁসোয়া লা কোলের' ছদ্মনামে। এর পর থেকে 'ছেঁড়া জুতোর মতো' বহুবার তিনি নিজের নাম পালটাতে বাধ্য হয়েছেন।

উপর্যুক্ত চারটি ছাড়াও, দ্বিতীয় পর্যায়ের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'লা দিয়ান ফ্রাঁসেজ' বা 'ফ্রান্সে কুচকাওয়াজের প্রভাতী ভেরী' ১৯৪৪ এবং 'লা নুভো ক্রেভ ক্যর' ১৯৪৮। প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'লে ভোয়াই-য়াজ্যর দ্য ল'্যাপেরিয়াল' বা 'দুর্ভাগ্যের অভিযাত্রী' ১৯৪২, 'অরেলিয়্যাঁ' ১৯৪৪ এবং ছ খন্ডে 'লে কম্যুনিস্ত' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কবিতা উপন্যাস বা 'অ্যাঁ রেয়ালিসম সোসিয়ালিস্ত'-এর মতো প্রবন্ধ-গ্রন্থ ছাড়াও এই পর্যায়ের কয়েকটি ছোটগল্প আরাগঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯৪৫ সালে লন্ডনস্থ ফরাসী প্রকাশন-সংস্থা 'লে কাইয়ে দ্যু সিলাস' সর্ব-প্রথম 'ত্রোয়া কঁৎ' বা 'তিনটি কাহিনী' নামে একটি শীর্ণ গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। সরকারের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে লেখক হিসেবে আরাগঁ 'স্যাঁ রমঁ্যা আরনো' ছদ্মনামটি ব্যবহার করেন। পরে ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রকাশক গালিমার 'ল্য মাঁতির-ভ্রে' নামে একটা গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন, যার মধ্যে প্রতিরোধ বিষয়ক ছটি গল্পের আলাদা একটা বিভাগ রয়েছে—'সেরভিত্যুদ এ গ্রাঁদার দে ফ্রাঁসে/সেন দেজানে তেরিবল' বা 'ফরাসীদের দাসত্ব ও মহত্ব / ভয়ঙ্কর বছরগুলোর দৃশ্যাবলী'। সৃজনী প্রতিভার উদ্ভাসিত এই পর্বের গল্পগুলি সত্যিই তুলনাবিহীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ঠান্ডা লড়াইয়ের কাল থেকে শুরু হয় আরাগঁর সাহিত্য সৃষ্টির তৃতীয় পর্যায়। তাঁর এই পর্যায়ের সামগ্রিক সাহিত্য-আলোচনা সত্যিই দুরূহ। কেননা, কেউ কেউ যেমন একবাক্যে স্বীকার করেছেন লুই আরাগঁ আধুনিক কালের একজন 'মহান' সাহিত্যিক, অন্যদিকে আবার কারো কারো ধারণা আরাগঁ শুধু মাত্র 'যুগোপযোগী', অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ না হবার সম্ভাবনাই সব চাইতে বেশি। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু বলবো, হয় তাঁরা যুদ্ধোত্তর কালে আরাগঁর মানসিকতাকে ঠিক বুঝতে

পারেননি, নয়তো আরাগ'র বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে তাঁদের আগে কোনো ধারণা ছিলো না। কেননা আরাগ' মনে করতেন দেশ স্বাধীন হলেও প্রকৃত শান্তির পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি। একদিকে গত মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপের ছোট ছোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যখন নিজেদের পুনঃগঠনের কাজে ব্যস্ত ; অন্যদিকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো তখন পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার সারাটা বিশ্বকে করে রেখেছে তটস্থ। এরই প্রেক্ষাপটে আরাগ'র সাহিত্যের উত্তরণ। একদিকে যেমন বিশ্বশান্তির জন্যে যোদ্ধা-কবিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্নায়ু-যুদ্ধের অস্থিরতা এবং সামগ্রিক অর্থে নৈরাশ্য ও বেদনা, সেই সঙ্গে বিশ্বের বহু ঘটনা আর অতীতের নানান স্মৃতি মরমী কবিকে স্পর্শ করেছে গভীর ভাবে।

এই পর্যায়েই, আঙ্গিক ও মননে, আরাগ'র সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে পরিপূর্ণ ভাবে এবং বিস্ময়কর ধরনের বিষয়-বৈচিত্রে। ১৯৫৪ সালে লুই আরাগ' ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ওই বছরেই 'লেনিন শান্তি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি কন-ফেডারেশন ন্যাশনালের সভাপতিও নির্বাচিত হন। তাঁর এই পর্যায়ের উল্লেখ-যোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'লেজিয়ো এ লা মেমোয়ার' বা 'চোখ আর স্মৃতি' ১৯৫৪, 'ল্য রমাঁ ইনাশভে' ১৯৫৬, 'এলসা' ১৯৫৯, 'লে পোয়েৎ' ১৯৬০, 'পোয়েজি ; ১৯১৭-১৯৬০' ১৯৬০, 'ল্য ফু দেলসা'বা 'এলসার পাগল' ১৯৬৩, 'ল্য ভয়েজ এন হল্যাঁদ' ১৯৬৫, 'লে শাঁবর' ১৯৬৬ এবং 'এলেঁজি আ পাবলো নেরুদা' ১৯৬৬। উপন্যাসের মধ্যে 'লা স্যমেন স্যাঁৎ' ১৯৫৮, 'লা মীজ আ মর', 'ব্লাঁশ উ ল্যুবলি', 'লিজোয়ার পারালেল' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আজীবন ধমনীর প্রতিটা রক্তস্রোতে বহমান ছিলো যে নারীর অস্তিত্ব, ১৯৭০ সালে সেই এলসা ত্রিয়োলের আকস্মিক মৃত্যু একদা সংগ্রামী কবিকে একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। এর পর থেকে আরাগ' প্রায় আর কিছু লেখেননি বললেই চলে। শুধু ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ উপন্যাস 'তেয়াতর' এবং ১৯৭৫ সালে নোবেল-বিজয়ী বিখ্যাত ফরাসী কবি সাঁ-জন পের্সের মৃত্যুতে একটি ছোট্ট নিবন্ধ। সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ রচনা। এলসার মৃত্যুর প্রায় একযুগ পরে ফ্রান্সের তথা সমগ্র বিশ্বেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক লুই আরাগ'রও মৃত্যু ঘটে ১৯৮২ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে।

•

এবার এই সংকলন প্রসঙ্গে যে কটি কথা নিতান্তই না বললে নয়, তা হলো 'লুই আরাগ'র নির্বাচিত সংকলন'-এর পরিবর্তে 'লুই আরাগ'র প্রতিরোধের সাহিত্য

সংকলন' রাখলেই বোধহয় যথার্থ নামকরণ করা হতো, কেননা প্রতিরোধ-সংগ্রামকালীন আরাগঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে থেকে আমি কেবল তাঁর সামান্য কয়েকটি গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ নিয়েই এই সংকলনটিকে সাজাতে চেয়েছি, সেই সঙ্গে নির্বাচন করেছি প্রতিরোধ-আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর কয়েকটি নিবন্ধ। অর্থাৎ যার জন্যে আরাগঁ সারাটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তাঁর সেই অবিস্মরণীয় প্রতিরোধ-পর্বের যাকিছু অনন্য সৃষ্টি তার থেকে নির্বাচিত কিছু রচনা নিয়ে এই সংকলন, তার আগের বা পরবর্তী অন্য কোনো পর্বের নয়।

সুদীর্ঘকাল আগে, ১৯৫৫ সালে নবভারতী থেকে প্রকাশিত দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরীর 'লুই আরাগঁর কবিতা'-ই ছিলো বাংলায় আরাগঁর একমাত্র অনুবাদ গ্রন্থ। উনিশটি কবিতার এক শীর্ণ সংকলন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা—সমগ্র বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এটাই ছিলো সব চাইতে দুঃসাহসিকতম প্রচেষ্টা। কেননা কবিতার যথার্থ অনুবাদ সত্যিই দুরূহ এবং বিদগ্ধ জনেরা খুব ভালো করেই জানেন আরাগঁর অনুবাদ, তা সে কবিতা হোক বা গদ্যই হোক, আরও দুরূহ। দুর্লভ শব্দ চয়ন, ছন্দ আর আশ্চর্য মিলের জন্যে আরাগঁর কবিতার যথাযথ বাংলা অনুবাদ প্রায় কল্পনাতীত বললেই চলে। যত অক্ষমভাবেই হোক, দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরীই প্রথম সেই দুঃসাহসিক কাজটা ঘটাবার স্পর্ধা রেখেছিলেন। 'লুই আরাগঁর কবিতা'-র মুখবন্ধ লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় কবি বিষ্ণু দে। পরের বছরে, ১৯৫৬ সালে, বিষ্ণু দে নিজেও 'হে বিদেশী ফুল'-এ আরাগঁর তিনটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তারও কয়েক বছর পরে ১৯৫৯ সালে, 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি 'আরাগঁ' নামে একটি নিবন্ধও লেখেন। বাংলায় আরাগঁ-চর্চার সেই প্রথম সূত্রপাত এবং শেষও বটে। কেননা গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে বিচ্ছিন্নভাবে আরাগঁর দু-একটি গল্প বা কবিতা ছাড়া বাংলায় তেমন করে আর কিছুই অনুবাদ হয়নি।

সেই প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই আরাগঁর নির্বাচিত রচনার একটা সংকলন সম্পাদনা করার পরিকল্পনা করি ১৯৮০ সালে। আরাগঁর তখনও জীবিত ছিলেন। সংকলনটির ব্যাপারে আমাকে অকৃত্রিম সাহায্য করেন দুই ফরাসীবিদ শ্রদ্ধেয় কবি অরুণ মিত্র এবং অবন্তী সান্যাল। 'প্রতিরোধ-আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নায়ক লুই আরাগঁ' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি অবন্তীদাই অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাকে অনুবাদ করে দেন। ১৯৭৯ সালে 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোট গল্প'-এ প্রকাশিত আরাগঁর 'দেখা-সাক্ষাৎ' গল্পটি অরুণদা সংকলনে নেওয়ার অনুমতি আমাকে দেন। এমন কি প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও 'রোরা কঁৎ' গল্পগ্রন্থের অন্য দুটি গল্পও অনুবাদ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বইটি হাতের কাছে খুঁজে না পাওয়ায় উনি আর তা করে উঠতে

পারেননি। অসুস্থতার জন্যে আমিও বিরক্ত করতে পারিনি। পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত আরাগঁর একটি অসাধারণ গল্প 'অতিথি', যেটিকে আমি ১৯৭২ সালে ফ্যাসিবিরোধী গল্প-সংকলন 'প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি'-তে স্থান দিই এবং আমার করা আরও দুটি গল্প 'প্রতিবেশী' ও 'শহীদ' নিয়ে 'লুই আরাগঁর নির্বাচিত সংকলন'-এর পাণ্ডুলিপিটি আমি ১৯৮১ সালের এপ্রিলে 'দ্রুপদী'-র শ্রী নানু মুখার্জীকে দিই। কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত কারণে প্রকাশনাটি বন্ধ হয়ে যায়এবং দীর্ঘ আট বছর অজস্র উপরোধ-অনুরোধ সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটি আমি উদ্ধার করতে পারিনি। তার চাইতেও বেদনাদায়ক যে পাণ্ডুলিপিটির কোনো নকল আমার কাছে ছিলো না। ফলে সুদীর্ঘকাল বাদে পাণ্ডুলিপিটিকে আবার সম্পূর্ণ নতুন করে করতে গিয়ে নির্মম ভাবে হারাতে হয়েছে অবন্তীদার করা সুদীর্ঘ প্রবন্ধটাকে, সেই সঙ্গে আমার করা আরও কিছু নতুন কবিতা এবং 'এই মহাযুদ্ধের কবি লুই আরাগঁ' শীর্ষক প্রবন্ধটার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অবশ্য লাভের মধ্যে, ১৯৮৪ সালে 'প্রতিবাদের গল্প সংগ্রহ' থেকে পেয়েছি শ্রীমতী সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর করা অনন্য একটি গল্প 'সহ-যোগী', শ্রদ্ধেয় কবি দিনেশ দাস ও সিদ্ধেশ্বর সেনের একটি করে কবিতা।

ইতিমধ্যে প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে অরুণদার 'আরাগঁ এবং আরাগঁ' শীর্ষক সুদীর্ঘ রচনা, যার কিছু তথ্য আমার এই মুখবন্ধটা লেখার ক্ষেত্রে অসম্ভব সাহায্য করেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে রচনাটি বাঙালী পাঠকের আরাগঁকে বুঝতে আরও বেশি সাহায্য করবে। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেই অবন্তীদা আমাকে ফরাসী উচ্চারণের ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। উপরুক্ত সবাইকেই জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আগেই বলেছি—আরাগঁর অবিস্মরণীয় প্রতিরোধ পর্বের যাকিছু অনন্য সৃষ্টি, তার থেকে সামান্যতম কিছু নিয়ে এই সংকলন। তবে তাঁর এই পর্বের ছটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি অনন্য ছোট গল্প, ছটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রায় সবকটি থেকেই নির্বাচিত ৩৭টা কবিতা, আশ্চর্য মরমী একটা প্রবন্ধ এবং আরাগঁর ওপর একগুচ্ছ রচনা 'সামান্যতম' হলেও, নিঃসন্দেহে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কেননা আরাগঁর মূল রচনা সংগ্রহ করাও খুব একটা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। এবং সবশেষে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বলি, বাংলায় লুই আরাগঁর যথাযথ রূপান্তর দুরূহ জেনেই এই সংকলন, যদি প্রতিরোধ-সংগ্রামে কিম্বদন্তী নায়কের সামান্যতমও কোনো রেখাচিত্র বাঙালী পাঠকের মণিকোঠায় ফুটিয়ে তোলা যায়, তারই আশায়।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ — অসিত সরকার

কলকাতা

উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে রিভিয়েরা সমুদ্র-সৈকত বরাবর আঘাত হানার সময় আমেরিকান সেনাবাহিনী সারা দেশজুড়ে ফরাসী প্রতিরোধ-বিপ্লবের সুসংগঠিত শক্তি দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। ফরাসী প্রতিরোধের অভিজ্ঞতালব্ধ সক্রিয় সহযোগিতাই সেদিনের সেই রোদ-ঝলমলে দিনগুলোতে মিত্রশক্তিকে আল্পসের মধ্যে দিয়ে রোন উপত্যকা থেকে আলসাস পর্যন্ত দ্রুত সামরিক অভিযানে সাহায্য করতে পেরেছিলো।

প্রতিরোধ-অন্দোলনের সঙ্গে আমরা বরাবরই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে-ছিলাম এবং বিজয়ী জার্মানদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের বীরত্বপূর্ণ নানান কার্য-কলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অত্যন্ত জটিল ধরনের হওয়া সত্ত্বেও গোপন আন্দোলনের বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও যে এ রকম একটা সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব, আমরা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

কথাটা কিন্তু সত্যি, এটা শুধুমাত্র জঙ্গী বা গোপন সাহিত্য ও সংবাদপত্রেরই সংগঠন নয়, সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটা স্তরেই প্রসারিত ছিলো এর নিপুণ তৎপরতা। আমাদের মধ্যে যাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো ফরাসী জন-জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা, এই সংগঠনকে আগে থেকেই তার সব রকম ব্যবস্থাকে প্রস্তুত রাখার ভঙ্গি দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। আমরা দেখেছি প্রায় প্রতিটা শহরেই সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট কিছু অভিজ্ঞ কর্মী মজুত রাখা ছিলো যাতে স্বাধীনতা পাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফরাসীরা তাদের বৈধ সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করতে পারে।

ওরা প্রস্তুতই ছিলো, যেহেতু দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময় ভিসি ও দখল-দারী জার্মান-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেই ওরা গোপনে সংবাদপত্র সম্পাদনা করে গেছে, ধরা পড়লে যার একমাত্র শাস্তি ছিলো হয় মৃত্যু, নয়তো নির্বাসন। যে কোনো পরিস্থিতিতে কেমন করে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হয় ওরা জানতো। সুতরাং স্বাধীন হওয়ার পর ওরা কি অসীম উৎসাহ নিয়েই না কাজ করবে সেটা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

আলপাইনের ঠিক মধ্যিখানে, গেরিলা অধ্যুষিত গ্রনবলে আমরা একদল *সংবাদপত্র-কর্মীর দেখা পেয়েছিলাম, যারা 'ফিগারো' সংবাদপত্রের ক্যাথলিক* সাহিত্য-সমালোচক আঁদ্রে রুশোর নির্দেশে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। আঁদ্রে রুশোর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম কেমন করে লুই আরাগঁর নেতৃত্বে ফরাসী লেখক শিল্পী সাহিত্যিক ও মনীষীরা সংগঠিত হয়েছেন গ্রোম

পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট একটা প্রোটেস্টান শহর দিয়্যলাফিতে।
ও'র মুখেই শুনেছি, ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে জাতীয় লেখকসংঘের প্রধান হিসেবে লুই আরাগ'কে বরাবরই সংবাদপত্র-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো, গোপন সংবাদপত্র প্রকাশের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতে হতো, এমন কি স্বাধীনতার মুহূর্তে কারা এ ব্যাপারে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, তাও তাঁকেই নির্বাচন করতে হতো। সারাটা অঞ্চলের স্থানীয় সম্পাদকরা আমাদের জানিয়েছেন—পশ্চাদ অপসরণের সময় জার্মানরা যাতে বাজেয়াপ্ত-করা ছাপার যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দিতে না পারে, বা ওদের ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপন পত্রিকাগুলি আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এ সমস্ত ব্যবস্থা আরাগ'ই করে দিতেন।
ম'ন্তালিমার যুদ্ধের ঠিক পরেই, ইজের আর রোন নদী-উপত্যকার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল যখন সবে মুক্ত হয়েছে, মার্সেই থেকে আমেরিকান সেনাবাহিনী তখন তিন ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে আল্পসের মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। আমাদের অগ্রগামী সেনাবাহিনী তখনও যুদ্ধ করতে করতে লিয়'র দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টাতে এমন একজনও সংবাদপত্রের সম্পাদক বা সাহিত্যিককে খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি আরাগ'র গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক খবর দিতে পারতেন। তবে এটুকু ও'দের কারুরই অজানা ছিলো না যে আরাগ' তখন কাজ করে চলেছেন মুক্ত অঞ্চলে।
আত্মগোপন করে থাকার সময়টাতেই লুই আরাগ' হয়ে উঠেছিলেন অদ্ভুত রহস্যময় একটা চরিত্র। তবে সবাই আমাদের সুনিশ্চিত করেছেন যে আরাগ' এখনও বেঁচে আছেন এবং অসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। অন্তরাল-সংগ্রামের সেই মুহূর্তগুলোতে অনেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করার স্পষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। জার্মান আর ভিসির সামরিক বর্বরতাকে উদ্ভাসিত করে দেওয়ার জন্যে তিনি নিজে হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, নয়তো নির্জন কোনো রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্তেহারগুলো লেখা হবে, ছাপা হবে এবং গোপনে তা বিলির ব্যবস্থা করা হবে। সেই সময়ে অনেকেই যাঁরা সম্পাদনা করতেন, কার লেখা ও'রা নিজেরাই জানতে পারতেন না, এমন কি কোথায় ছাপা হবে তাও না। আন্তরিক উত্তাপ আর উষ্ণতা দিয়ে আরাগ'ই পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে দিতেন।

ক্যাথলিক থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সবারই ছিলো আরাগ'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। দেশে, এমন কি দেশের বাইরেও, ফরাসী প্রতিরোধ-আন্দোলনের বলিষ্ঠ কণ্ঠের কবি হিসেবেই ও'রা যে শুধু লুই আরাগ'কে চিনতেন তা নয়, চিনতেন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি ও'দের কাজের মর্ম-মূলে যোগাতেন প্রেরণা আর আত্মপ্রত্যয়, যিনি ও'দের ব্যক্তিগত সমস্যাতেও

সাহায্য করতেন নানান ভাবে। ও'দের কাছ থেকেই শোনা আরাগঁ কিভাবে ডাক্তার উকিল ছাত্রী সাংবাদিক বিচারক এবং অন্যান্য পেশার লোকজনদেরও জাতীয় লেখকসংঘের মাধ্যমে প্রতিরোধ-আন্দোলনে সামিল করে তুলতে পেরেছিলেন।

একবার আমাদের ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে, ভেরকরের মধ্যে দিয়ে, দ্রোম থেকে দিয়্যলাফি পর্যন্ত দীর্ঘ এক শুভেচ্ছা-সফরে পাঠানো হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো গ্রনবল বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় আঁদ্রে মুশোকে সাহায্য করার জন্যে আরও কয়েকজন যোগ্য লেখককে খুঁজে বার করা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, স্বাধীনতার পর গ্রনবলই ফ্রান্সের একমাত্র বেতারকেন্দ্র যা প্রথম ইথার তরঙ্গে তার সংবাদ প্রেরণ করতে পেরেছিলো। দিয়্যলাফিতে সবাই আমাদের একবাক্যে জানালে লুই আরাগঁ আর তাঁর স্ত্রী এলসা ত্রিয়োলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ও'রা তখন স্যাঁ-দোনার ছোট্ট একটা গ্রামে অপেক্ষা করছেন, যাতে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ও'রা লিয়'তে পে'ৗছতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ও'দের ছদ্মনাম এবং আস্তানাটার হদিশ সেই প্রথম আমরা জানতে পারি।

দিয়্যলাফি থেকে বেশ কয়েক ঘন্টার পথ, আল্পসের দিক থেকে চকিত ধেয়ে আসা ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করেই আমরা এগিয়ে চললাম। কনকনে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে খোলা জিপ। ঝলকে ঝলকে হিমেল বাতাসের তীক্ষ্ণ চাবুক এসে আছড়ে পড়ছে আমাদের চোখে-মুখে। বৃষ্টি অবশ্য আগেই থেমে গেছে, টকটকে লাল অস্তগামী সূর্যটা ঢলে পড়েছে দিগন্তের গায়ে, আর তারই প্রদীপ্ত আভায় আমরা দেখলাম র্যমাঁ থেকে স্যাঁ-দোনা পর্যন্ত সারাটা পাহাড়ী পথে চলেছে একের পর এক জোড়ো মেঘের দ্রুত আনাগোনা।

আমরা যখন এসে পে'ৗছলাম, লুই আরাগঁ আর তাঁর স্ত্রী এলসা ত্রিয়োলে তখন সবে তাঁদের বৈধ সংবাদপত্র লা দ্রোম এন আর্মসের শেষ সংস্করণটা শুকোবার জন্যে মেঝেতে বিছোচ্ছেন। সি'ড়ির নিচের ছোট্ট বসার ঘরটায় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো। অত্যন্ত খাড়াই সংকীর্ণ সি'ড়ির নিচে থেকেই আরাগঁ চে'চিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন, 'এলসা. সব কাজ ফেলে রেখে শিগগির নিচে দেখবে এসো কারা এসেছেন!'

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বেচারি এলসা আর একটু হলে আমাদের গায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেন।

ছোট্ট একটা টেবিল ঘিরে আমরা সবাই বসলাম। বাইরে থেকে আসায় প্রথম-প্রথম ঠান্ডায় ভীষণ কাঁপছিলাম, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা ফলের-ছোবড়ায় ধরানো আগুনে আমরা একটু একটু করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম। আরাগঁ জানালেন, 'গত শরৎ থেকেই এগুলো আমরা সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। এ তল্লাটে কোথাও কয়লা পাওয়া যায় না, কাঠ পাওয়াও

কষ্টকর। যথেষ্ট উত্তাপের ব্যবস্থা করতে পারলাম না বলে সত্যিই আমরা দুঃখিত। তবে আমার মনে হয় এঁদিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারবেন।'
যা সম্পর্কে আরাগঁ প্রথম আলোচনা শুরু করলেন, তা হলো ফরাসী জনগণের মানসিক অবস্থা। অসাধারণ বাগ্মিতায়, আমেরিকান মানুষদের কাছে দীর্ঘ দিন ধরেই বলতে চাওয়া শব্দগুলো ঝরনা ধারার মতো অনায়াস ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়ে এলো। বারবার সতর্ক করে দিয়ে উনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন —নাৎসি অপপ্রচার আর তার কার্যকলাপের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও আমাদের মনের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে রয়েছে এবং দীর্ঘ নির্যাতনের এই যে কয়েকটা বছর, এর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকেও মন থেকে মুছে ফেলা অত্যন্ত কঠিন।
'দুর্বিসহ কষ্ট আমরা সহ্য করেছি,' আবেগদীপ্ত কণ্ঠে আরাগঁ বলে চললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে বেশি সহ্য করেছি আত্মিক নির্যাতন। আগামী ভোরে কি ঘটবে কিছু না জেনে প্রতিদিন বেঁচে থাকাটা যে কি বিড়ম্বনা সে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। হয়তো আপনার পরিচিত কিংবা প্রিয়জন কেউ, কিংবা হয়তো আপনি নিজেই পরের দিন ভোরে উধাও হয়ে গেলেন। যাদেরকে আপনি চেনেন, শ্রদ্ধা করেন কিংবা ভালোবাসেন, একদিন নিজে চোখে তাদেরকে উধাও হয়ে যেতে দেখলেন, তার ঠিক কয়েকমাস পরেই শুনলেন তাদেরকে গুলি করে মারা হয়েছে, নইলে তার চাইতেও খারাপ—জার্মানীর সুদূরে কোনো দাস-শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের দেশের হয়ে কোনো শব্দ, কোনো ভাবনাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করতে যাওয়া, স্বাধীনতার স্বপক্ষে কোথাও সামান্যতম এতটুকু প্রতিবাদ করতে যাওয়ার অর্থই হলো অন্য কোনো পৃথিবীতে পৌঁছবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নেওয়া। চোখের সামনে দেখছি আমার দেশের মানুষের প্রাণশক্তিকে ফোঁটায় ফোঁটায় নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে শারীরিক, মানসিক, এমন কি নৈতিক দিক থেকেও বিধ্বস্ত করা হচ্ছে; আর আমাদের যে শত্রু, মনের ব্যাপ্তিকে পরিমাপ করার ব্যাপারে যে খুবই নিপুণ, ভালো করেই জানে মনগুলোকে কেমন করে বিষিয়ে তুলতে হয়। চোখের সামনে দেখছি সারা দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার-যন্ত্রে সেই বিষকে প্রতিশ্রুত করে আজ সর্বত্র প্রবেশ করানো হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষের মনে। ফলে যারা দুঃসাহসী, যারা সংগ্রাম করতে চায়, তাদের প্রতি ঘৃণা ভয় আর সন্দেহ যে কি মারাত্মক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—আপনাদের ঠিক বোঝানো সম্ভব নয়। এখানে কিছু দিন বাস না করলে আপনারা তা স্পষ্ট উপলব্ধিও করতে পারবেন না।
'আমার দেশের মানুষ ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত বন্ধু, শুধু এই কথাটা কখনও ভুলবেন না। এ কথা ভোলার অর্থই হলো আমাদের নৈতিকতা আর সাহসের মধ্যে বিভ্রান্তিকর একটা ফাটল সৃষ্টি করা—উত্তেজনায়, অপেক্ষায়, হতাশায়

যা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। যেসব আমেরিকানদের আপনারা চেনেন, যাদের সঙ্গে আপনারা কাজ করেন, তাদেরকে বলুন—ফরাসীরা যা করেছে তার জন্যে তাদেরকে যেন শ্রদ্ধা করে। শক্তি আর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার কঠিন কাজে ওরা যেন তাদের সাহায্য করে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্স যা অর্জন করেছে তার জন্যে যেন তাকে সম্মান জানানো হয়।'

কাবাসর এ এমনই এক আবেদন, যা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো অনুকম্পা নয়, এ যেন সমগ্র ফ্রান্সের ন্যায্য দাবী।

এবং সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লুই আরাগঁর মুখ থেকে শুনলাম ফরাসী জনগণের আত্মাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে জার্মানরা যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ চার বছরের সংগ্রাম প্রসঙ্গে আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব। ১৯৩৯ সালের আগস্টে সেই যে সংবাদপত্রের কুর্সি ছেড়ে জন-সমাবেশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারপর থেকে এই প্রতিরোধ-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে অবশ্য আমার অনেক সহকর্মী, বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আরাগঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, নানান তথ্য ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াও লুই আরাগঁর কর্মময় ঐ চার বছরের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষ করে, নাৎসি আর ফরাসী ফ্যাসিস্ট—এই দুই অশুভ শক্তির সমবেত হানার মধ্যেই কাউকে যখন জোর করে বাঁচতে হয়, কাজ করতে হয়, তখন তার নিজের কাহিনী মনে হয় আরও অবিশ্বাস্য।

●

২৫ শে জুন ১৯৪০, যুদ্ধবিরতির বিশেষ ওই দিনেই লুই আরাগঁ বর্দো থেকে পাঠানো এলসা ত্রিয়োলের একটা তারবার্তা পেলেন। ওটা উনি যখন পাঠিয়েছিলেন, জার্মানরা তখনও পর্যন্ত বর্দো অধিকার করে রেখেছিলো। তারবর্তাটা হাতে পাওয়া সত্ত্বেও আরাগঁ জবাব দেননি। এর কয়েকদিন পরে এলসা মোটরযোগে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন দরদগন জাবেরলাকে, যেখানে সীমারেখা বরাবর প্রথম অনুসমর্থিত দলের সঙ্গে তাঁর সেনাবাহিনীকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। ৩১শে জুলাইয়ে সৈন্যদল ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত এলসা আরাগঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় দফতরেই ছিলেন।

এখন আবার সবকিছুই নতুন করে শুরু করার সময় হয়েছে, কিন্তু এলসা পাশে থাকলে আরাগঁর মনে হয় যুদ্ধে যেন অর্ধেকটারই বেশি জয় করা হয়ে গেছে। ওঁরা চলে এসেছিলেন করেজ বিভাগের রনো দ্য জুভনেলের শাতোতে। ওঁরা সপ্তা তিনেক সেখানে ছিলেন। এই সময়ে আরাগঁ বেসামরিক পোশাকেই

ঘুরে বেড়াতেন এবং খবর পেলেন তাঁর ফরাসী প্রকাশক গালিমার এখন কারকাসনেই বাস করছেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তো আর বন্ধুদের ওপর নির্ভর করে চালানো যায় না, তাই তিনি প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু গালিমার জানালেন ব্যবসার অবস্থা খুবই অনিশ্চিত। অগ্রিম তো দূরের কথা, আপাতত পুরনো পাওনাও কিছু দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আরাগ' তখন আমেরিকায় তাঁর বন্ধু এবং প্রকাশক স্যামুয়েল জোয়ানকে তারবার্তা পাঠালেন, যিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু অর্থ পাঠালেন এবং নতুন করে উপার্জন করতে না পারা পর্যন্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কারকাসনে লুই আরাগ' প্রায়ই কবি জো বুসকেকে দেখতে যেতেন, যিনি গত যুদ্ধে আঘাতের ফলে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। বুসকের বাসায় সবসময় কবি শিল্পী সাহিত্যিক আর সব ধরনের মননীদের ভিড় লেগেই থাকতো। দরজা জানলা বন্ধ করে ও'রা সবাই যা ঘটেছে আর যা ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে সতর্ক ভঙ্গিতে আলোচনা করতেন। ওখানে আসতেন জাঁ পলআঁ আর তাঁর স্ত্রী জুলিয়া। বাঁদা. জাঁ গ্রামবেরজে. বরিস ভিলদ. বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে প্রাণ হারান। যেহেতু জো বুসকের বাসাটি ছিলো সবার জন্যে অবারিত দ্বার, তাই জাঁ মিস্তলারের মতো সন্দেহভাজন ও বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষরাও যাওয়া-আসা করতেন। প্রজাতন্ত্রের শেষ দিনগুলোতে জাঁ মিস্তলার ছিলেন পেতাঁর গুপ্তচরদের অন্যতম।

মাদাম পেতাঁর গোঁড়া ভক্ত এক বয়স্কা মহিলা, এক সময়ে যাঁর একটা মনিহারী দোকান ছিলো, আরাগ'রা তাঁরই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আগস্টের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত কারকাসনেই ছিলেন। এখানে বসবাসের সময় থেকেই আরাগ' 'লা ক্রেভ-ক্যর' বা ভগ্ন হৃদয়'-এর কবিতাগুলি লিখতে শুরু করেন এবং অর্থের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ও'দের দুর্দশায় বিচলিত হয়ে এবং রাজনৈতিক সমর্থন সম্পর্কে কিছু না জেনেই বয়স্কা বাড়িওয়ালী আর একটা দোকান কেনার প্রস্তাব দেন, যেটা ভদ্রমহিলার হয়ে ও'রাই চালাবেন। এই ব্যবসা আসন্ন দুঃসময়ে যেমন ও'দের কাছে জীবন-ধারণের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে, তেমনি প্রয়োজনের সময়ে খাবার দাবারও কিছু সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু আরাগ'রা সেই প্রলোভনে সাড়া দেননি। পুলিস ও'দের অনুসরণ করছিলো, কেবল আরাগ'র সাম্প্রতিক সামরিক সম্মানই তাঁকে গ্রেফতার হওয়ার হাত থেকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে দিচ্ছিলো।

লুই আরাগ' বিরামবিহীন লিখে চলেছেন, কবিতাগুলো বন্ধুদের দেখাচ্ছেন, কখনও কখনও বা বুসকের বাড়িতে নিজেই পড়ে শোনাচ্ছেন। বন্ধুরা কিন্তু খোলাখুলিই তাঁর কবিতায় সমালোচনা করতেন। তাঁদের মতে এগুলি খুবই

বিপজ্জনক এবং এর জন্যে আরাগঁকে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। আরাগঁ তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতেন। বন্ধুদের মতে এই মুহূর্তে দেশপ্রেমের অর্থ চুপ করে থাকা। কিন্তু আরাগঁর মতে নিশ্চুপ হয়ে থাকাটা অদূরদর্শীতাকেই নির্দেশ করবে, নয়তো ভীরুতাকে। কবিদের জন্যে যেটা অত্যন্ত জরুরী, উনি বেশ জোর দিয়েই বলতেন, তা হলো নিজেদের প্রকাশ করার জন্যে নতুন পথ বা বিশেষ ভঙ্গি আবিষ্কার করতে হবে, মূক হয়ে থাকলে চলবে না।

কিন্তু এই ধরনের চিন্তা আর কাজে আরাগঁ ছিলেন প্রায় একা। কারকাসনে ওঁর অবস্থান আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, যুদ্ধ-বিরতির পর লিয়ঁ থেকে যখন ল্য ফিগারো পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এই পর্যায়ের ওঁর অত্যন্ত শক্তিশালী একটি কবিতা 'লাইক আর গোলাপ' এবং সেটা প্রকাশিত হয়েছিলো ওঁর অনুমতি ছাড়াই। বিভিন্ন মহল থেকে বন্ধুরা ওঁকে সতর্ক করে দিলেন যে এই ধরনের খোলাখুলি ভাবনার কিছু লেখা যেন প্রকাশ করার অনুমতি না দেন। সংগ্রাম পরবর্তীকালে যাঁরা আরাগঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের তখনও পর্যন্ত মার্শাল পেত্যাঁর প্রতি আস্থা ছিলো অটুট।

পিয়ের সেগেরস্ আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আরাগঁর সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিলো। ভিলনাভ-লে-আভিনঁ্য থেকে তাঁরা এসেছিলেন আরাগঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেই প্রথম দুজনের চাক্ষুস পরিচয়। যুদ্ধ বিরতির পর সেগেরস্ তাঁর যুদ্ধকালীন পত্রিকা 'পয়েত কাস্কে' কে (শিরস্ত্রানধারী কবি) 'পোয়েজি ৪০' নামে প্রকাশ করছিলেন। তিনি আবেদন করলেন আরাগঁ যেন এই নবীন পত্রিকাটিকে টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করেন এবং স্বাধীনচেতা লেখকগোষ্ঠী যেন এটাকে তাঁদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে লুই আরাগঁ মরক্কোয় তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন, তাতে বিস্তারিত বিবরণ ছিলো কি ভাবে বৃদ্ধ ফরাসী কবি স্যাঁ-পল রুর মৃত্যু ঘটেছিলো। দ্রুত ফ্রান্স জয়ের পর উন্মত্ত অবস্থায় নাৎসি সৈন্যরা কবির ভিলা কোয়েসলিঅাঁর বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁর মেয়ে দিভিনেকে আক্রমণ করে। ওরা তরুণী কন্যা, এমন কি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসা বাড়ির পরিচারিকাটিকেও ধর্ষণ করে। বৃদ্ধ কবি ওদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে পশুরা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে কবি এবং পরিচারিকাটিকে আঘাত করে। রু এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা দুএকদিনের মধ্যেই মারা যান। ক্ষতের চাইতে বৃদ্ধ মানুষটা অন্তরেই আঘাত পেয়ে ছিলেন সব চাইতে বেশি।

এই ঘটনায়, বিশেষ করে ফ্রান্সে জার্মান এবং ভিসি সরকার—উভয়েরই কৃত্রিম মুখোশটা খসে গিয়ে প্রকৃত সত্যটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠায়, আরাগঁ যে কি

ভীষণ বিচলিত হয়েছেন সেগেরস্, সেটা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি পোয়েজিতে যুদ্ধের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখার জন্যে আরাগঁ'কে অনুরোধ করলেন। সেগেরস্ বর্ণনা করেছেন আরাগঁ কেমন করে এক ঘন্টার মধ্যে, পরাজয়ের মুহূর্তে ফরাসী চেতনার স্বপক্ষে, কি চমৎকারই না একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'স্যাঁ-পল রু, অথবা আশা' প্রকাশিত হয়েছিলো লুই আরাগঁ'র নিজের নামেই, অবশ্য ভিসি সেনসর কর্তৃক অনেক ছাঁটকাটের পর পোয়েজির প্রথম দিকের একটা সংখ্যাতে।

কারকাসনেই ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে আরাগঁ তাঁর 'ভগ্ন হৃদয়'-এর কবিতা-গুলি শেষ করেন। সেই শীতের আগে পর্যন্ত আরাগঁ তাঁর পাণ্ডুলিপিটা পৌঁছে দিতে পারেননি। নিসে ধাঁ পলআঁ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আরাগঁ তখনই পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। পলআঁই পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে নিয়ে প্যারিতে ফিরে আসেন এবং লুই আরাগঁ'র প্রকাশক গালিমারকে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করতে রাজি করান। গালিমারেরও দ্বিধা ভাবটা কেটে গেলো যখন তিনি দেখলেন যে 'লাইলক আর গোলাপ' কবিতাটি প্রকাশের জন্যে জার্মানরা ল্য ফিগারো পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ বা কোনো রকম উত্যক্ত করেনি।

১৯৪০ সালে ডিসেম্বরের শেষের দিকে আরাগঁ'রা কারকাসনের আস্তানাটি ছেড়ে যেতে সক্ষম হন। বড়দিনের উৎসবে ভিলনভা-লে আভিনঁ্য-এর কাছে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসার জন্যে সেগেরস্‌রা আরাগঁ'দের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ও'দের সঙ্গে থেকে যাওয়ার জন্যে সেগেরস্ খুবই জেদ ধরেছিলেন, কিন্তু আরাগঁ'রা নিসে চলে যাওয়াই মনস্থ করেন। সেগেরস্ সেই সময় আবারও পোয়েজির সম্পাদক হবার জন্যে আরাগঁ'কে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর অতি-পরিচিত রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে পত্রিকা প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে হয়তো সমঝাওতা করতে হতে পারে ভেবে আরাগঁ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে দুই কবিই স্থির করেন—যাঁরা এক সময়ে নিজস্ব মতামত জনসমক্ষে তেমন ভাবে তুলে ধরতে সাহস পাননি, অথচ দেশের সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতাও করেননি, সেইসব লেখকদের ও'রা সংঘবদ্ধ করবেন। সেই সময়ে কোনো লেখকই, এমন কি পোয়েজির সংগঠকরাও জার্মানদের আক্রমণ করার কথা ভাবতে পারছিলেন না। কিভাবে সেটা সম্ভব সে সম্পর্কে কারুর কোনো ধারণাই ছিলো না। আরাগঁ এবং সেগেরস্ পরিকল্পনা করলেন —চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত প্রভাব এবং পত্রিকার আদর্শের মাধ্যমে তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন এবং হাতে-কলমে শেখাবেন কেমন করে ভিসি সেনসরশিপ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ করতে হয়। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই আরাগঁ 'ল্য ল্যঁস দ্য রিবেরাক' বা রিবে-রাকের শিক্ষা নিবন্ধটি লেখেন, যেখানে যুদ্ধবিরতির খবরটা প্রথম শোনার

পর তাঁর নিজের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, তার কথাই বলেছেন।

এমনিভাবে প্রতিরোধ-আন্দোলনের লেখকদের কাছে পোয়েজিই হয়ে উঠেছিলো প্রথম শ্রেণীর 'বৈধ' সাহিত্য-পত্রিকা। যাঁরা তখনও পর্যন্ত ভাবছেন ভিসি শাসনের নিয়ন্ত্রনাধীনে প্রকাশিত প্রতিটা বৈধ সাহিত্য-পত্রিকা মানেই হীনবীর্য এবং ব্যর্থ, তাঁদের আমি পরামর্শ দেবো অবরোধের সময় প্রকাশিত পোয়েজি পত্রিকার উনিশ নম্বর সংখ্যাটি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তে। পরাজয়ের পর প্রথম সংখ্যাগুলো শুরু হয়েছিলো আরাগঁর 'ভগ্ন হৃদয়'-এর জীবন্ত স্তবকগুলি দিয়ে এবং অন্তর্ভুক্ত ছিলো লোয়া মার্স, পিয়ের এমানুয়েল, লুই পারো ও অন্যান্যদের কবিতা আর নিবন্ধ। সেনসরশিপ বিভাগের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ হয়তো এই নতুন প্রকাশনটি অনুমতির ক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিতে পেরেছিলো। হয়তো সহযোগী জার্মান সেনসররা এই পত্রিকার পাতাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তো না, নয়তো এমনই মাথামোটা যে কাঁটাতারের তীক্ষ্ন মুখগুলো তাদের চোখে পড়তো না।

সেগেরসদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর পর আরাগঁরা নিসে চলে আসেন, ওঁরা সেখানে পৌঁছোন ১৯৪০ সালে ৩১শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়। ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৪২ সালের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত ওঁরা নিসের রিভিয়েরাতেই বসবাস করেছিলেন। অবশ্য এরই ফাঁকে ফাঁকে সাংগঠনিক প্রয়োজনে আরাগঁকে সারা দেশময় অজস্রবার যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন যে অবরোধের সময়ে তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে লেখকদের সাহায্য করা যাতে প্রতিরোধ-আন্দোলনে তাঁরা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারেন। কাজ শুরু করে দিতে আরাগঁ একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করেননি। তাঁর একটা দিকের কাজের ভার দেওয়া হয়েছিলো মাক্স-পল ফুশের ওপর, যিনি যুদ্ধবিরতির ঠিক আগেই উত্তর আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন এবং অনধিকৃত ফ্রান্সের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি বৈধ সাহিত্য-পত্রিকা 'ফঁতেন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম কয়েকটি সংখ্যার জন্যে ফুশে 'ভগ্ন হৃদয়'-এর একগুচ্ছ কবিতা, 'লা লঁ্যাস দ্য রিবেরাক' নিবন্ধটি এবং এলসা ত্রিয়োলের একটা গল্প পেয়েছিলেন।

এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা—জেনেভায় 'কাইয়ে দ্যু রোন' নামে একটি পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার আত্মপ্রকাশ, যেটি যুদ্ধের সময়ে বিশ্বের অন্য যেকোনো প্রকাশকের চাইতে অনেক বেশি ফ্রান্সের প্রতিরোধ-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করতে পেরেছিলো। ১৯৪১ সালের বসন্তে আরাগঁ জেনেভাতে বিখ্যাত সুইস সাহিত্য-সমালোচক অ্যালবার্ট বেগুইনকে লিখেছিলেন সেনসরশিপ এড়ানোর জন্যে উনি ফরাসী সাহিত্যিকদের কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা। ১৯২০ সালে পারিভ্রমণের সময়

বেগুইন যখন ছাত্র, সেই সময় তরুণ দাদাইস্ট, আরাগঁর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়েছিলো। বেগুইন সঙ্গে সঙ্গে আরাগঁর চিঠির জবাবে জানালেন সর্বান্তকরণে সাহায্য করতে রাজি আছেন। এর কয়েকদিন পরেই বেগুইন ওঁর এক বন্ধু বারনার্ড আন্থোনিওজকে নিসে পাঠালেন আরাগঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। দীর্ঘ আলোচনার পর আরাগঁ পরিষ্কার বোঝতে পারলেন যে জেনেভায় 'কাইয়ে দু রোন'-এর মতো স্বনির্ভর কোনো প্রকাশন সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত হলে বহু ফরাসী লেখক তাঁদের নীরবতা ভাঙতে পারবেন।

গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি ছাড়াও নিসে থাকার সময়ে লুই আরাগঁ এবং এলসা ত্রিয়োলে দুজনেই আবার পুর্ণোদ্যমে লিখতে শুরু করেছিলেন। কোলাহল-হীন রাস্তার ওপর নির্জন এই আস্তানাটায় পরিসীমিত একটা ভাতায় আরাগঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন। এখানেই আরাগঁ তাঁর অন্য একটা কবিতা সংকলনের পাণ্ডুলিপি শেষ করেন এবং পাণ্ডুলিপিটি সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন, যেটা ১৯৪১ সালের শেষের দিকে সুইজারল্যাণ্ড থেকেই 'লেজিয়্যো দেলসা' বা 'এলসার চোখ' নামে প্রকাশিত হয়। এলসাও তখন তাঁর কয়েকটি ছোট উপ-ন্যাস রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, যেগুলি পরে 'মিল্ রগ্রে' নামে প্রকাশিত হয়।

*

১৯৪১ সালের জুনে ওঁরা অনুভব করলেন যে দক্ষিণের লেখকবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্যে পারি যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। যদিও তখন কারুর পক্ষে পারি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসাটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না, তবু আরাগঁরা স্থির করলেন যে এর জন্যে সরকারী অনু-মতি চাওয়াটা নিরাপদ হবে না। তাই ওঁরা গোপনেই সীমারেখা পেরুনোর ব্যবস্থা করলেন। জর্জ দুদাশ, যিনি পরাজয়ের পর পারিতে কয়েকটি গোপন পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন, পরে যাঁকে নাৎসিরা গুলি করেও মেরেছিলো, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তাঁর ওপর নির্দেশ ছিলো আরাগঁদের সীমারেখা পেরুনোর ব্যাপারে সাহায্য করার। পায়ে হেঁটে সীমানা পেরুতে গিয়ে আরাগঁরা তুরের দক্ষিণে জার্মান প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েন এবং একই ভাবে ধরা পড়া অন্য অনেকের সঙ্গে ওঁদেরকেও অন্তরীন করে রাখা হয়। ওঁদের সঙ্গে নিজেদের পরিচয়পত্র ছিলো, কিন্তু আরাগঁর নাম তখনও পর্যন্ত তেমন বিখ্যাত হয়ে জার্মানদের কানে পৌঁছয় নি। ১৬ই জুলাইয়ে মুক্তি পাবার পর আরাগঁরা আবার পারির পথে রওনা হন।

পারিতে আরাগঁর বন্ধুদের মধ্যে জর্জ পলিৎজের, জাক দাকুর, বা পলজাঁ, জর্জ দুয়ামেল, দানিয়েল কাজানোভা এবং অন্য আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হলো।

তখনও পর্যন্ত প্যারিতে ঝর্ক পলিৎজের এবং জাক দ্যকুর প্রতিষ্ঠিত প্রতিরোধ-আন্দোলনের একটিই মাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা ছিলো 'লা পাঁসে লিবর'। তখনও পর্যন্ত পত্রিকাটির একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হলেও, প্যারিতে প্রতিরোধ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে চাওয়া অজস্র মননীদের ওপর তার প্রভাব পড়েছিলো অত্যন্ত প্রবলভাবে। লেখকরা অঘোষিত একটা সভায় মিলিত হলেন, যেখানে জাতীয় লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠা করার এবং মুখপত্র হিসেবে একটি গোপন পত্রিকা প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। উপরুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও সেই প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক, রেভারেন্ড পের মেদিয়্য, জাঁ ব্লাঁজা এবং ঝাঁ গ্যুএনো। সম্পাদক হিসেবে জাক দ্যকুরের নাম ঘোষণা করা হলো।

প্যারিতে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসটা ছিলো খুবই উত্তেজনায় ভরা। মূল উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়াও দক্ষিণ অঞ্চলের সংগঠনের ভার পড়লো আরাগঁদের ওপর। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স হয়ে ও'রা প্রথমে গেলেন ক্যাসেল নভেলের রনো দ্য জুভনেলে। সেখানে লেয় মুসিনাক ও'দের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাত্যর হয়ে মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হঠাৎ এক তরুণ শিল্পী বন্ধু বরিস তাস-লিৎস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, যিনি তখন ঝাঁ ল্যুর্সা, গ্রোমইর, দ্যুফি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় একদল ফরাসী শিল্পীর সঙ্গে ওব্যুস পরদা তৈরি কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

পরাজয়ের সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন সময়টাতে ওব্যুসতে ফরাসী পরদা বয়নশিল্পের পুনঃরুজ্জীবনকে সেগেরস্ এবং আরাগঁর নিরলস প্রয়াসে উজ্জীবিত কবিতার সমতুলই বলা যায়। আরাগঁ উল্লেখ করেছেন যে পরদা বয়নের ক্ষেত্রে আঁচল হিসেবে ব্যবহার করার পুরনো ফরাসী প্রথাকে ও'রা ফিরিয়ে এনে-ছিলেন, ঠিক যেমনটা করা হতো ষোড়শ শতাব্দীতে। এমনি ভাবে অসীম উৎসাহ আর নিপুণ তৎপরতায় ও'রা এল্যুয়ার, আরাগঁ, আপোলিনের ও অন্য অনেকের কবিতা সমেত আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর সব আধুনিক পরদা ও'রা সারা ফ্রান্সে বিক্রি করতেন। শিল্পীরা নিজেরাও কবিতা লিখতে শুরু করে-ছিলেন, যেগুলো পরবর্তীকালে লেজেতোল দ্য কোরসি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিলো।

কাত্যর থেকে আরাগঁরা লেজাঁগলে সেগেরসদের সঙ্গে দেখা করতে যান। পথিমধ্যে ঝর্ক সাদুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তুলুজে থামেন। ও'রই মাধ্যমে ঝাঁ কাসোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি এর কয়েকদিন পরেই ধরা পড়েন। কারাগারে কাসো একগুচ্ছ আশ্চর্য সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে যা 'গোপনে রচিত ৩৩টি সনেট' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো, যে সংকলনের অনন্য একটি মুখবন্ধ লিখেছিলেন লুই আরাগঁ নিজে।

সেগেরসের 'পোয়েজি' যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটাতে পারলেও দক্ষিণ অঞ্চলে জার্মান-

পক্ষাবলম্বী সহযোগীরা তখনও পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ ভালোই কাজ করে চলেছে। 'নুভেল রভ্যু ফ্র্যাঁসেজ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দ্রিয়্য লা রশেলকে নির্বাচন করা হয়েছে, যিনি ফরাসী মননীদের 'নতুন ব্যবস্থা'-র স্বপক্ষে আনার জন্যে দুর্মর্ম পরিশ্রম করে চলেছেন। উনি ওঁর বন্ধু রানে ভ্যাসঁকে ভিসিতে পাঠিয়েছিলেন 'ইদে' নামে সহযোগীদের একটি সাহিত্য-পত্রিকা শুরু করার কাজে। ১৯৪২ সালে পেত্যাঁ সরকারের অধীনে সেন-সরশিপের প্রধান পদটা স্বীকার করে নিয়ে ভ্যাসঁ তাঁর প্রকৃত স্বরূপটাকেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তুলুজে গেস্টাপোর কিছু প্রতিনিধিদের সাহায্যে একদল পেত্যাঁপন্থী লেখক 'পিরেনে' নামে অন্য একটা সাহিত্য-পত্রিকা শুরু করেন। কিন্তু এই পত্রিকাগুলোর কোনোটাই তেমন সম্মান অর্জন করতে পারেনি, বরং কোনো কোনো মহলে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করেছিলো। তবে ভবিষ্যতে এরা যদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এদেরই বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে 'পোয়েজি' এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত 'ফঁতেন' তাদের সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। এই সময়ে অবশ্য ক্ষতিকর নয় এমন কিছু পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। মার্সেই থেকে প্রকাশিত 'লে কাইয়ে দ্যু সুদ' পত্রিকাটিকে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে অথচ আন্তরিক ভাবেই সম্পাদনা করা হতো। ১৯৪১ সালের বসন্তে একদল বুদ্ধিজীবীর পাল্লায় পড়ে ধনী এক শিল্পপতির ছেলে 'কঁফ্লুয়াঁস' নামে মাঝামাঝি শ্রেণীর অথচ বেশ রুচিসম্মত একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করেন। রানে তাভের্নিয়ে এবং মার্ক বারবেজা, প্রতিভাবান দুই তরুণ হন এই পত্রিকার কর্ণধার।

বারবেজা সম্প্রতি 'লারবালেৎ' নামে নিজেই একটি পত্রিকা শুরু করেছেন, যাতে তখনও পর্যন্ত অনূদিত না হওয়া বৃটিশ আর রুশ লেখকদের রচনাই বেশি প্রকাশ করা হয়। বছরে দুবার মাত্র ২০০ সংখ্যার সংস্করণ। সীমিত সংখ্যা হলেও চমৎকার কাগজে বারবেজা পত্রিকাটি নিজে হাতে ছাপান। এই সময়ে 'লারবালেৎ'-এর গুণগত মান ছিলো খুবই উচ্চাঙ্গের।

লিয়ঁতে 'ফিগারো' পত্রিকার সাহিত্যবিভাগটি সম্পাদনার ভার ছিলো ক্যাথা-লিক লেখক ও সমালোচক আদ্রে রুসোর ওপর। 'সেৎ জুর' নামে একটা সাপ্তাহিক গল্প-পত্রিকাও ছিলো, সম্পাদনা করতেন লুই-মার্তা শোফিয়ে এবং এর পৃষ্ঠপোষক ছিলো একদল উৎসাহী শিক্ষিত তরুণ। এছাড়াও ছিলো বেশ কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র, যার ওপর প্যারির বিভিন্ন সাহিত্যজীবী মানুষের জীবিকা নির্ভর করতো।

আরাগঁ স্থির করলেন লিয়ঁ অঞ্চলের সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবেন এবং তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাও পেয়েছিলেন। লিয়ঁতেই তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ হয়েছিলো ফ্রান্সের বিখ্যাত মহিলা সাংবাদিক আঁদ্রে ভিওলিস-এর সঙ্গে, এডিথ টমাসের সঙ্গে যিনি শক্তিশালী ছোটগল্পকার হিসেবে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও ছিলেন আঁদ্রে রুশো, মার্ক বারবেজা, স্তেফান প্রিয়ালেন, ক্লদ আভলিন, লুই-মার্তা শোফিয়ে এবং আগেকার দুই বন্ধু ঝর্ক আলমা এবং পাসকাল পিআ, বর্তমানে যাঁরা প্রতিরোধ-সংগ্রামের সক্রীয় কর্মী এবং আরাগ' যাঁদের লেখকসংঘের কাজে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

ভিলন্যভ-লে-আভিন্যঁ-এ ফিরে এসে আরাগ'রা সেগেরসে্র শ্বশুরে বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলেন। তাঁদের এই প্রত্যাবর্তন খুবই সময় উপযোগী ছিলো। কেননা ঠিক এই সময়টাতেই আভিন্যঁ-এর কাছে শাতো দ্য লুরমার'াতে শুরু হয়েছিলো জ্যন্ ফ্রাঁস নামে তরুণ মননীদের একটা অধিবেশন। যদিও এর পৃষ্ঠপোষক ছিলো ভিসি,তবু বহু তরুণ দেশপ্রেমী এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন কি পরবর্তীকালে যিনি প্রতিরোধ-আন্দোলনের একজন সক্রীয় কর্মী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, সেই ক্লদ রের মতো নেতারাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু শিল্পী সাহিত্যিক কবি গায়ক অভিনেতাকে এই সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয়, এমন কি আরাগ'কেও। আরাগ' নিজে না যাবার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু তিনি বহু বন্ধুকে এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে উৎসাহিত করেন এবং এই মঞ্চটিকে দেশপ্রেমী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল একটি সংগঠনে পরিণত করার আহ্বান জানান। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাক্স-পল ফুশে, যিনি এই উদ্দেশ্যে আলজিয়ার্স থেকে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন এবং পোয়াজিতে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে জ্যন্ ফ্রাঁস-এর এই সম্মেলনটা ছিলো আভিন্যঁ ও ভিলন্যভে ধারাবাহিক কয়েকটা সমাবেশরই ফলশ্রুতি, যেসব সমাবেশে লেখক ও মননীরা খোলাখুলি ভাবেই নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতে পেরেছিলেন এবং এখন ওঁরা ভবিষ্যতের জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে চলেছেন। জুলাইয়ে পারি থেকে ফিরে এসার পরেই আরাগ' প্রতিরোধ-সংগ্রামের লেখকদের উদ্দেশ্যে প্রথম ম্যানিফেস্টো লিখলেন এবং ওই সম্মেলনে তা ব্যাপকভাবে বিলি করা হলো। ফুশে এই ফতোয়ার একটা কপি সঙ্গে নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় ফিরে গেলেন। স্থির হলো লোয়া মার্স সেগেরসে্র সঙ্গে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সহসম্পাদক হিসেবে সাহায্য করবেন, শুধু তাই নয়—এখন থেকে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হবে, তার ওপর কর্তৃত্ব বিকাশের জন্যে সব রকম চেষ্টাও চালানো হবে।

এই সময়ে ভিলন্যভে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আগন্তুক ছিলেন অ্যালবার্ট বেগুইন। সঙ্গে ছিলো তাঁর স্ত্রী রেম'দ ভ্যাস'। উনিও একজন বিখ্যাত লেখিকা।

ও'রা সুইজারল্যান্ডে প্রকাশের জন্যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন এবং আগের চাইতে আরও নিয়মিত ভাবে পারস্পরিকতা গড়ে তুলতেন। ব্যবস্থা করা হলো লিয়'তে নতুন সুইস রাজদূত ফ'সোয়া লাশনালের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। প্রতিরোধ-সংগ্রামে লেখকদের প্রতিনিধি হিসেবে লাশনালের এই যে ভূমিকা, সত্যিই এর মূল্য ছিলো অপরিসীম। কাইয়ে দ্যু রোন এবং সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বই ও পত্রিকা ফরাসী সেনসরের দৃষ্টি এড়িয়ে সুইস সীমান্তঅঞ্চল অ্যানেমাসের মধ্যে দিয়ে সুপ্রচুর পরিমাণে ফ্রান্সে এসে পেঁাছতো। লাশনাল ছিলেন প্রতিরোধ-আন্দোলনের সক্রীয় কর্মী, পরে সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ায় আপার স্যাভয় অঞ্চলের মাকি'তে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে বহুল প্রচারিত একটা সুইস সাপ্তাহিকী ছিলো 'ক্যুরিয়া'। পত্রিকাটি সবকিছুর সংমিশ্রনে একটা জগাখিচুড়ি বিশেষ হলেও, যথেষ্ট পরিমাণে দেশাত্মবোধক সাহিত্যও পরিবেশন করা হতো।

*

১৯৪১ সালের অক্টোবরে আরাগ'রা নিসে ফিরে এলেন। ভিলন্যভে থাকার সময়ে এবং নিসে ফিরে আসার কিছু পরে এলসা 'মিল রগ্রে'-এর গল্পগুলি রচনা করেছিলেন। ১৯৪২ সালের মে'তে পারি থেকে দনোয়েল কর্তৃক বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব জনপ্রিয়তাও লাভ করে।

১৯৪১ সালের হেমন্ত এবং শীতকালটা ফরাসী লেখকদের, বিশেষ করে আরাগ'দের পক্ষে ছিলো খুবই বিপজ্জনক সময়। শুরুতেই বাড়িওয়ালি তাঁর আশ্রয় থেকে ও'দের স্থানচ্যুত করলেন। অনেকদিন পর্যন্ত আরাগ'রা জানতেই পারেননি যে ও'দের থাকতে না দেওয়ার প্রকৃত কারণ ছিলো—ও'দের অনুপস্থিতিতে পুলিস এসে বাড়িওয়ালিকে চাপ দিতো যাতে উনি আরাগ'দের গতিবিধি সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজ-খবর পুলিসকে জানান। ভদ্রমহিলা কিন্তু কখনই তা করেননি, অন্যদিকে আবার পুলিসকে প্রত্যাখ্যান করার মতো সাহসও তাঁর ছিলো না। ফলে আরাগ'দের চলে যেতে বলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। আরাগ'রা কো দেজেতাজুনির ছোট্ট একটা বাসায় চলে এসেছিলেন। যেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর রীতিমতো খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে সত্ত্বেও ও'রা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও'দের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ফেরার কয়েকদিন পরে পারি থেকে প্রকাশিত আরাগ'র 'ভগ্ন হৃদয়'-এর আত্মপ্রকাশ আঁতাতকারী লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্রী হৈ চৈ ফেলে দেয়। নুভেল রাভু ফ্রাসেজ পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় দ্রিয়া লা রশেল ফ্রান্সের সমস্ত প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রধান সংগঠক, জার্মান ও ভিসি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক বহু রচনার লেখক ও গোপন যাবতীয় পত্র-

* জার্মানী গেরিলা বাহিনী

পত্রিকা প্রকাশনায় পরিচালক হিসেবে আরাগঁকে অভিযুক্ত করলেন। এ অভিযোগের অনেকটাই অতিরঞ্জিত হলেও, সবটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা এই ষড়যন্ত্রে আরাগঁ ছাড়া আরও অনেকেই ছিলেন।

প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের ওপর নেমে আসা প্রথম গণহত্যা এবং উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক ধরপাকড় ওই সব অভিযোগেরই অন্যতম ফলশ্রুতি। এই সময়ে ব ক ব'সেরুজ' নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে জার্মানরা যখন গুলি করে মারে, আরাগঁ জনসমক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করে 'এক্স ফ্রাঁসে' নামে একটি কবিতা লেখেন, যেটা লা সুইস কন্তাঁপোরেন নামে একটা সুইস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরাগঁকে গ্রেফতারের জন্যে গেস্টাপো পেতাঁ সরকারের ওপর ক্রমশই চাপ দিতে থাকে এবং ভিসি সেনসর তাঁকে একজন 'নিদে'শক' হিসেবে চিহ্নত করে এন. আর এফ বিধি প্রয়োগ করে এবং পোয়েজি ও অন্যান্য ফরাসী পত্রিকাগুলিকে লুই আরাগঁর কোনো কিছু লেখা প্রকাশ না করার নির্দেশ দেয়।

সেটা ছিলো আরও বেশি সতর্ক হবার কাল। তারপর থেকে ফ্রান্সে নিজের নামে আরাগঁর খুব কম লেখাই প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের বাকি বছরগুলোতে আরাগঁর ছদ্মনাম ছিলো অজস্র, যেমন ফ্রাঁসোয়া লা কোলের, জর্জ মেই-জারগু, আর্নো দ্য স্যাঁ রম্যাঁ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর ছদ্মনাম যতই থাক না কেন, বন্ধুদের কাছে আরাগঁর রচনাশৈলী খুব সহজেই ধরা পড়ে, এমন কি তাতে যদি কোনো স্বাক্ষর না থাকে, তবুও।

গ্রেফতার তখনও পর্যন্ত লেখক-সংঘের প্রারম্ভিক সংগঠনকেও স্পর্শ করতে পারেনি, পারি থেকে রচনা আর সংবাদ নিয়ে দূতীদের নিয়মিত নিসে পৌঁছনো ছিলো অব্যাহত। দুজন লেখক রনে লাপর্ত এবং ক্লদ-আঁদ্রে প্যুজে প্রায়ই আসতেন আরাগঁদের বাসায়, যেখানে এলসা ত্রিয়োলে গভীর মগ্ন থাকতেন তাঁর প্রথম দীর্ঘ উপন্যাস 'ল্য শেভাল ব্লাঁ' বা 'সাদা ঘোড়া' রচনার কাজে, আর আরাগঁ ব্যস্ত থাকতেন তাঁর 'ওরেলিয়াঁ' উপন্যাসটা শেষ করার তাগিদে, যেটা উনি কারাবাসে থাকার সময়েই শুরু করেছিলেন।

এর পরেই পারি এবং উত্তরাঞ্চলে জার্মানদের নিপীড়ন ওঠে চরমে। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরের প্রায় শেষের দিকে কাগজে প্রকাশিত হলো বহু বন্ধুর নির্বাসন আর মৃত্যুসংবাদ, যাঁদের অনেকেরই সঙ্গে সাম্প্রতিক পারি ভ্রমণের সময় আরাগঁদের দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছিলো। প্রথম যাঁকে জার্মান ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিতে হয়েছিলো, তিনি হলেন গাব্রিয়েল পেরি, কমিউনিস্ট সংবাদ-পত্র 'ঊমানিতে'-র বৈদেশিক ভাষ্যকার, যিনি ছিলেন আরাগঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী, সাংবাদিক হিসেবে যাঁর অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা ছিলো অপরিসীম। প্রায় একই সময়ে সাতাশজন রাজবন্দীকে কমিউনিস্ট হওয়ার অভিযোগে ফরাসী সরকার জামিন স্বরূপ জার্মানদের হাতে

তুলে দেয়। গুপ্ত আততায়ীর হাতে একজন জার্মান কর্নেলের নিহত হবার ঘটনার পরের দিনই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে ওই সাতাশজন রাজবন্দীকেই শাতোব্রিয়াঁর শিবির থেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হয়।

শাতোব্রিয়াঁর ঘটনা এক ভয়ঙ্কর নজীর সৃষ্টি করেছিলো। অন্যের অপরাধের জন্যে নিরপরাধী জামিনদারদের গুলি করে মারার ঘটনাটাই ছিলো প্রথম প্রকাশিত সংবাদ। বন্দীদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে ভিসি এবং জার্মানরা অবশ্য কৃতকর্মের জন্যে মার্জনা চেয়েছিলো, কিন্তু যদি কোনো প্রতিবাদ না করা হয় তাহলে যেকোনো জায়গায় এই ধরনের গণহত্যা ঘটতেই থাকবে। ১৯৪২ সালের প্রথম দিনগুলোতে বিশেষ দূত মারফত পাঠানো বেশ কয়েকটা চিঠি ও নথিপত্র থেকেই আরাগঁ শাতোব্রিয়াঁর হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে পারেন।

আরাগঁ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ-আন্দোলনের স্বপক্ষে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কয়েকটি আবেদন লেখেন, যার একটার জন্যে তিনি আজও খুবই গর্বিত, যেটা জার্মানদের প্রতি ফরাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলো। আরাগঁ রচনাটার নাম দিয়েছিলেন 'লে মারতির' বা 'শহীদ', লেখকের নামের জায়গায় স্বাক্ষর ছিলো 'শহীদদের সাক্ষীরা'। রচনাটি চোরা পথে দেশের বাইরে চলে যায় এবং প্রতিবেশী প্রতিটা মিত্র-রাষ্ট্রের বেতার-কেন্দ্র থেকে তা প্রচার করা হয়।

এর অল্প কয়েকদিন বাদে গেস্টাপো লেখক-সংগঠনকে সরাসরিই আক্রমণ করে। লা লিবর পাঁসের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো অনেক পরে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাতীয় লেখক-সংঘের মুখপত্র 'লে লেত্যর ফ্রাঁসেজ'-এর প্রথম সংখ্যা ঝাক দাকুর কর্তৃক প্রকাশিত হলো এবং প্রায় একই সময়ে গেস্টাপো মুজে দ্য লোমের কর্মীদের গ্রেফতার করলো। অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর ওরা আবিষ্কার করতে পারলো যে দাকুর এবং ঝর্জ পলিৎজের 'লা লিবর পাঁসে' পত্রিকাটির পরিচালক এবং ওঁরা কোনো না কোনো ভাবে লেখক-সংঘের প্রকাশন বিভাগের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত। হয়তো ওঁদের দিয়ে কথা বলাতে পারবে ভেবে ভিসির গোপন পুলিস (বর্তমানে যাদের একটা অংশ ফ্রান্সে নাৎসিদের সাহায্য করছে) দাকুর, পলিৎজের এবং ঝাক সলোমঁকে গ্রেফতার করে। সেতে ফরাসী পুলিস ওঁদের জার্মানদের হাতে তুলে দেয়। জার্মানরা ওঁদের তিনজনকেই গুলি করে মারে।

ওঁদের কেউই লেখক-সংঘের কোনো তথ্য বা কাজের প্রণালী সম্পর্কে কিছুই জানাননি। তবু সাময়িক কালের জন্যে বিরতি এবং পুনঃগঠনের কাজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিলো। কেননা এইভাবে গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ড যদি সমানে চলতে থাকে, নেতৃস্থানীয় ফরাসী মননীরা হয়তো চুপ করে থাকবেন, হয়তো ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ-আন্দোলন তার যোগ্য নেতৃত্ব থেকেই বঞ্চিত হবে।

জুলাই, ১৯৪২ সালের আগে পর্যন্ত আরাগ'রা নিসেই ছিলেন। ওখানে ও'দের বাসাটা নতুন আর পুরনো বন্ধুদের ভিড়ে সবসময়েই সরগরম থাকতো। এ'দের মধ্যে নিয়মিত আসতেন সেগেরস্, পাসকাল পিয়া এবং ড্রাভেরনিয়ে। পল গ্রা আসতেন মাঝে মাঝে, আর শেষের দিকে এলসা ত্রিয়োলের প্রতিভার আকৃষ্ট হয়ে আসতেন রজে মার্তা্যা দ্যুগার। বহুকালের পুরনো বন্ধু ফ্রিক্সা ৎসারাও মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন সানারি থেকে। নতুন করে আবার লেখা শুরু করার জন্যে আরাগ'রা তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতেন। যে মাসে আরাগ'র মা মারা যান কাত্যর-এ। ও'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগ দেবার পর তিনি ওই অঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করলেন। ও'দের মধ্যে ছিলেন লুর্কা, আঁদ্রে ফ্রামসের এবং ঝর্ক শাদুল।
১৯৪২ সালের জুলাইয়ে আরাগ'রা আবার ভিলনাভে ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেগেরস্দের কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই গ্রীষ্মেই ভিলনাভ আবার বিপুল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। প্রতিরোধ-আন্দোলনের মুখপত্র পোয়েজি, ক'ন্ফ্লুয়াঁস ও ফন্তেনের সম্পাদকরা একত্রে মিলিত হতেন তাঁদের কর্মতৎপরতার সমন্বয়সাধন করতে এবং তাঁদের কাছে এসে পৌঁছনো পাণ্ডুলিপিগুলো ভাগাভাগি করে নিতে। পারি থেকে যোগাযোগ-কারীরাও নিয়মিত এখানে এসে পৌঁছতেন।
এখানেই ও'রা জানতে পারেন যে জাক দ্যাকুরের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে লেখকদের জাতীয়-সংঘকে আবার পুনঃগঠিত করা হয়েছে। 'ল্যা লেতর ফ্র্াসে' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার নিয়েছেন ক্লদ মরগান। এই সময়েই পল এলুয়োর, ঝাঁ লেসকার, ঝাঁ-পল সার্ত প্রমুখ বেশ কিছু প্রাণোজ্জ্বল কবি ও সাহিত্যিক এবং ঝাঁ ব্রুলারের মতো প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী পারিতে জাতীয় লেখক-সংঘে যোগ দেন। ঝাঁ ব্রুলারই 'এদিসিয়ঁ দ্য মিনুই' নামে একটি গোপন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি যে উনিই 'ভেরকর', অথচ ও'র লেখা পড়েছে সবাই। ১৯৪২ সালের শরৎ থেকেই 'ল্যা লেতর ফ্র্াসে' পত্রিকাটি আবার নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে।
সেই গ্রীষ্মেই আরাগ'রা দিয়্যলফি পরিভ্রমণে যান। সঙ্গে সেগেরস্ও ছিলেন। দ্রোম কেন্দ্রে বহু লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই পরিভ্রমণকালেই গোপনীয়তার কাল যে খুব সামনেই এগিয়ে আসছে সেটা আরাগ'রা বুঝতে পারেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। দিয়্যলফির ওপর পাহাড়গুলোর মধ্যে ক'-তে ও'রা রাখালদের গ্রীষ্মকালীন একটা পরিত্যক্ত কুঠরি খুঁজে বার করেছিলেন। সেখানে গেস্টাপোর দেওয়া মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত দুই জার্মান উদ্বাস্তু বন্ধুকে ও'রা লুকিয়ে রেখেছিলেন। মনে মনে স্থির করেছিলেন

ওঁদের জীবনে যাই ঘটুক না কেন তবু ওঁরা পলাতক দুজনকে লুকিয়ে রাখবেনই।

দুঃস্বপ্নের আন্দোলিত দিনের ওই গুমোট পরিবেশের পর আরাগঁরা পাহাড়ী অঞ্চলের মুক্ত বায়ু প্রাণভরে উপভোগ করছিলেন এবং আপাত নির্জন এই অঞ্চলের মুক্ত পরিবেশ তাঁদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারছিলো। গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় আরাগঁ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর পক্ষে সেইসব মানুষদের কাছে থাকাটাই অত্যন্ত জরুরী, ভাবনায় যাঁরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। অন্তত দিয়্যলফিতে গড়ে উঠুক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের এমন একপ্রাচীর যা তাঁদেরকে রক্ষা করবে, একজন বিচক্ষণ নিশ্চুপ মানুষও শ্রদ্ধা জানাবে তাঁদের অপরিচিতিকে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকশো মননী, লেখক, কবি, শিল্পী, শিক্ষক, ক্যাথলিক, প্রোটেসট্যান্ট, ইহুদি দিয়্যলফিতে গোপনে আস্তানা গেড়েছিলেন। কোনো পূর্বপরিকল্পনাবিহীনভাবেই ওঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পাহাড়ী অঞ্চলে, যেখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে পালিয়ে আসা ফরাসী হিউগ্যান্টরা একদিন গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে অতর্কিতে পুলিস হানাসত্ত্বেও, উঁচু উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা দিয়্য-লফি ছিলো খুবই সুরক্ষিত। দিয়্যলফি আর পরবর্তী গ্রাম বুর্দো—এই দুই-য়ের মাঝখানে ছিলো ওক গাছের ঘন জঙ্গল। এখানেই কয়েক শতাব্দী ধরে দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত ফ্রান্সের স্বাধীন প্রোটেসট্যান্ট সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র চালোনার ব্যাপারে হিউগ্যান্ট মোড়লরা সভায় মিলিত হতেন। এখন আবার সেই ফরাসী প্রোটেসট্যান্ট সম্প্রদায়ের নেতা পাস্তর বোয়েগনে নিজেই এই দিয়্যলফিতে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যান্য প্রোটেসট্যান্ট নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন মানবাধিকারের পক্ষে ক্ষতিকর জার্মান ও ভিসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে। আভিনঁ থেকে আভ্যন্তরীন পাহাড়ী পথে মাত্র ষাট কিলোমিটার এবং লিয়ঁ থেকে খুব বেশি হলে একশো কিলোমিটার। ফলে অন্য কোথাও লেখকদের সঙ্গে যোগা-যোগের চাইতে জায়গাটাকে আদর্শই বলা যায়। অনায়াসেই পৌঁছনো যায় এমন একটা দুর্ভেদ্য মধ্যে প্রায় গোটা কুড়ি প্রেসে রয়েছে, যেখানে থেকে গোপনে ছাপার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুবই সহজ।

রুশো, জানিসলা ফুমে, রানে তাভেরনিয়ে এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে একটা অধিবেশনে মিলিত হবার জন্যে আরাগঁরা দিয়্যলফি থেকে লিয়ঁতে গিয়ে-ছিলেন। ভিলনাভে ফিরে এসে আরাগঁ 'পোঁ ফ্রাঁসে দাঁ লা তাক্সুত' পত্রিকার জন্যে তাঁর অন্তিম 'বৈধ' কবিতাগুলি দ্রুত শেষ করছিলেন। বাসায় ফেরার পথে ওঁরা সাঁ রেমি দ্য প্রভিন্স-এ থেমেছিলেন অন্ধ কবি মে.র্ঁ আর তাঁর স্ত্রী মেরির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

অক্টোবরে ওঁরা আবার নিসে ফিরে আসেন। উত্তর আফ্রিকায় মিত্র-সেনা অবতরনের খবর যখন এসে পৌঁছলো, আরাগঁরা তখন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সামান্য কিছু জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে ভিসির অধীনে তাঁদের বৈধ জীবনের সময়-সীমাকে ছিন্ন করার জন্যে তাঁরা উন্মুখ হয়েই ছিলেন। প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হলো প্রায় তখন থেকেই।

*

অক্ষশক্তি বাহিনী* অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশ করে ১৯৪২ সালের ১১ই নভেম্বরে। ভিন্তিমিগলিয়া থেকে ইতালিয়ান বাহিনী যখন নিসে প্রবেশ করে, আরাগঁরা তখন উধাও হয়ে গেছেন। গেস্টাপো আর অভরার প্রতিনিধিতে সারাটা অঞ্চল ছেয়ে গেলো, খুঁজতে লাগলো ভিসি যুদ্ধবিরতিকালীন সৈন্য-বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে, যারা আগেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রোন উপত্যকার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল আর আল্পসের পাদদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ভিসির সময়কালে বিশেষ সুযোগ সুবিধে নিয়ে যাঁরা গেস্টাপোর বিরুদ্ধে কাজকর্ম চালিয়েছে বলে ওরা বিশ্বাস করে, সেইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের সুদীর্ঘ একটা তালিকা ওরা আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলো। প্রতিরোধ-আন্দোলনের গোপন সূত্র থেকে আরাগঁদের জানানো হয়েছিলো যে ওঁদের নামও সেই তালিকায় রয়েছে, তাই ওঁদের পালানোর ব্যাপারেও সব রকম সাহায্য করা হয়েছিলো।

ভিলন্যভ-লে-আভিনঁতে বন্ধুদের কাছে কয়েকদিন থাকার পর আরাগঁ দিয়া-লফি থেকে ছ কিলোমিটার উঁচুতে ক'-র কাছে রাখালদের পরিত্যক্ত সেই কুঠরিতে আত্মগোপন করেন। সপ্তা দুয়েক পরে এলসা তাঁর জার্মান বন্ধুদের নিয়ে আরাগঁর সঙ্গে মিলিত হন। বছরটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও'রা ক'-র সেই গোপন আস্তানাতেই ছিলেন। এখানেই আরাগঁ জার্মান সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে রচিত ঝাক দাকুরের নিবন্ধগুলির একটি সংকলন সম্পাদনা করেন, পরে বেটি পারি থেকে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাজীদের চাইতে জার্মানীর প্রকৃত সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠায় সংকলনটি ফরাসীদের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো।

অল্প কয়েকদিন এই পাহাড়ী অঞ্চলে থাকার সময়েই আরাগঁরা অনুমান করতে পেরেছিলেন ফ্রান্স কেমন সম্পূর্ণরূপে তার স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। প্রথম দিকে যে কটি মাকি ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে এই গ্রামটাই ছিলো সব চাইতে কর্মতৎপর সদর-দফতর। জার্মানীতে বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবিরে যোগ দেবার জন্যে যেসব তরুণদের প্রতিনিয়তই শাসানো হচ্ছে, পালিয়ে আসার সুযোগ পেলে তারা এই পাহাড়ী অঞ্চলের মাকিতে যোগ দিচ্ছে।

* জার্মান ও ইতালির নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মশক্তি

প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রতীতিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলার প্রয়োজনেই ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারীতে পরিচয়পত্রবিহীন, থাকা ও রেশনের অনু-মতিপত্র ছাড়াই আরাগঁরা আবার লিয়ঁতে ফিরে এলেন। তাভের্নিয়ে তাঁর বিশাল মঁ সেইজির বাড়িতে ও'দের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ক'ক্লয়াসের বাড়তি অফিস-ঘরটায় আরাগঁরা মাস ছয়েক ছিলেন।

ক'ক্লয়াসের ওই গোপন আস্তানাতেই আরাগঁ লিয়ঁর লেখকদের নিয়ে পরপর কয়েকটা সভা করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে দক্ষিণ অঞ্চলের জন্যে জাতীয় লেখক-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো। সারাটা দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিটা শহর আর গ্রামে সংঘ তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের পাঠাতে পেরেছিলো। এ'দের মধ্যে এমন বহু লেখকও ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে আরাগঁ ১৯৪০ থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যেই, কাঁধে কাজের অজস্র বোঝা থাকা সত্ত্বেও, আরাগঁ লেখক-সংঘের একেবারে মূল অংশ থেকে উদারপন্থী আদর্শে দীক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটা বিস্তীর্ণ সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখান থেকে অন্যান্য জাতীয় কমিটিগুলো সার্থক রূপ নিতে পারবে। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডক্তার, শিল্পী, আইনজীবী, বিচারক এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছিলো, প্রচার করেছিলো তাদের ঘোষণাপত্র এবং জার্মানদের সঙ্গে আঁতাতের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছিলো।

আন্তঃপেশাভিত্তিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিলো ১৯১৭ সালে প্রি গঁকুর পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাথলিক লেখক স্তানিসলা ফুমে, আকাদেমি ফ্রঁসের সাম্প্রতিক গ্রাঁ প্রিক্স পুরস্কারবিজয়ী আঁরি মলেরব, ব্রা প্রভো, যিনি সেই বছরেই ভেরকর রণাঙ্গনে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, ক'ক্লয়াসের অন্যতম সম্পাদক ওগ্যুস্ত আগল এবং আরাগঁকে নিয়ে।

উদারপন্থী শিল্প ও সংস্কৃতির সভ্যদের প্রতিরোধ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার পরেই ও'রা দেখলেন যে এইসব মননীদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে প্রতিটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নেতারা স্থানীয় বিষয়ের ওপর একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধক সমিতিকে 'এতোয়াল' নামে দক্ষিণ ফ্রান্সের কয়েকশো অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে 'এতোয়াল' নামেই সব ধরনের পেশার ব্যক্তিবর্গের জন্যে একটি মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হতো যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন আরাগঁ। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত উনিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো, মননীদের সন্নিবেশিত করা হয়েছিলো বন্দী সাথীদের রক্ষার কাজে, বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গের কাছে আবেদন রাখা হয়েছিলো ও'রা

যেন পাহাড়ী এলাকায় মাকিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন।

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এইসব কমিটি সারাটা দক্ষিণ ফ্রান্স জুড়ে খুব ভালোই অগ্রগতি ঘটিয়েছিলো। ১৯৪৪ পর্যন্ত ওগুলো সক্রিয় ছিলো এবং জুন-জুলাই-আগস্টের জাতীয় অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণের সময় মিত্রশক্তি প্রবেশের সমর্থনে ফরাসী জনগণকে সুসংগঠিত করার কাজে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করেছিলো।

এইসব কমিটিগুলির মধ্যে আরাগঁর ধারণা অনুযায়ী প্রতিরোধ-আন্দোলনে যার সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, তা হলো জাতীয় মেডিক্যাল কমিটি। এই কমিটি গঠনের সময় তিনি নিজে প্রথম প্রচারপত্রটি রচনা করেন, প্রতিনিধিস্থানীয় ডাক্তারদের সভ্য হবার জন্যে আহ্বান জানান এবং এর সভার সভাপতিত্ব করেন। এমন কি মাকি ইউনিটের জন্যে তিনি প্রাথমিক শুশ্রূষার ওপর ভারি চমৎকার একটা গ্রন্থও সম্পাদনা করেন এবং অন্যদের উপদেশ দেন কেমন করে মাঠে-ঘাটে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

প্রাথমিক শুশ্রূষার ওই শীর্ণ গ্রন্থটার জন্যে আরাগঁ নিজের লেখা কোনো কাব্যগ্রন্থ বা উপন্যাসের মতোই সমান গর্ববোধ করতেন। এই কমিটির কাজকে তিনি বরাবরই গেরিলাবাহিনীকে সাহায্য করার কাজে পরিণত করতেন, কেননা ভ্রাম্যমান এই ইউনিটের শক্তি ১৯৪৩ সালের শরতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। আরাগঁ চেয়ে ছিলেন যে শহর গ্রামের চিকিৎসকরা প্রতিটা অঞ্চলে, যেখানেই মাকি ইউনিট আক্রমণ চালাবে, বরাবরই যেন স্থায়ী জরুরী ভিত্তিতে আহতদের সেবা করতে পারেন। পাহাড়ী কমিটি বেশ কয়েকটা গোপন হাসপাতাল স্থাপন করেছিলো এবং সেগুলিতে তরুণ স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার ও রুগ্নজনে ধাত্রী হিসেবে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণীরা মজুত থাকতো। অসামরিক ডাক্তার আর ধাত্রীদের কয়েকটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছেলো, যাঁরা জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় গোপন প্রতিরোধ-আন্দোলনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। সাংবাদিকদের জাতীয়-সমিতিওগড়ে তোলার কাজে তাঁর সেই একই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, যাঁরা দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত গোপন ছাপাখানাগুলোকে সচল রেখেছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্তে এই সমিতির সভ্যরা দুশোরও বেশি সংবাদপত্র প্রকাশ করছিলেন, প্রতি সপ্তায় যাদের প্রচার সংখ্যা ছিলো এক লক্ষেরও বেশি।

অন্য একটা দল, সংগ্রামের ক্ষেত্রে আরাগঁ যাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, সেটা হলো বিচারক ও শাসকদের জাতীয়-সমিতি। বহু তরুণকে জার্মানীতে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে নির্বাসন পাঠানোর ব্যাপারে হুকুম জারি প্রভৃতি ভিসির নানান অত্যাচার ইতিমধ্যেই আদালতের ওপর যথেষ্ট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ভিসির এইসব ফরমানের বিরুদ্ধে বহু শাসক রীতিমতো অবজ্ঞাও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যেহেতু শত্রু এখন সর্বত্রই পরিপূর্ণ দখল

নেবার চেষ্টা করছে। তাই স্বাভাবিক ভাবে আইনের সাহায্যেই ওদের দুষ্কর্মের মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।
বৈধ পেশার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে কাজ করেও বিচারকদের জাতীয়-সমিতি অ্যাঁচরেই বিচারের জন্যে আনা কয়েকজন দেশপ্রেমীকে জামিন দিলেন। দেশ-প্রেমমূলক বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের জন্যে এই সমিতির সভ্যরা শাস্তি-দানও প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাঁরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলেন যে নারী-পুরুষকে যেভাবে গ্রেফতারের ভয় দেখানো হচ্ছে, তাতে আগেভাগেই তাদেরকে থাকিতে যোগ দেওয়াটা অনেক বেশি সতর্কতার কাজ হবে। ১৯৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসেই সমিতি জার্মান আর তার ভিসি সমর্থকদের গোপনে হানা দিয়ে, গোপনে গ্রেফতার করে, গোপনে বন্দী করে রাখার প্রকৃত সর্বের প্রথায় ওদের কর্মতৎপরতা পরিচালনায় বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য করেছিলো যাতে নিয়মের মধ্যে দিয়েই কাউকে অন্তত আদালতে হাজির করা যায়।
১৯৪৩ সালের বসন্তেই লেখকসংঘ দক্ষিণ অঞ্চলে তিনটে প্রকাশনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলো, যারা ছড়িয়ে থাকা ডজন খানেক শহরে প্রতিরোধ-সাহিত্যের জনপ্রিয় সংস্করণগুলো প্রকাশ করতো। এই সিরিজের প্রথম বইগুলির মধ্যে ছিলো আরাগঁ'র 'লা ক্রিম ক'ত্র লেসপ্রি,' জার্মান কর্তৃক লেখক ও মননীদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরে বইটি পারির এদিশিয়ঁ দ্য মিনুই থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

লিয়ঁ'র জাতীয় লেখক-সংঘ পারির লেখক-সংঘের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলো। এবার ওয়া প্রস্তুত হলো এদিশিয়ঁ দ্য মিনুই প্রকাশন-সংস্থার মাধ্যমে গোপন অবস্থার সময়ের কিছু দুর্লভ রচনা বই আকারে প্রকাশ করতে, কেননা তখনও পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছিলো তা সবই ছিলো ছড়ানো ছিটানো এবং সস্তা তুলোট কাগজে ছাপা। দক্ষিণাঞ্চল অবরোধের পর থেকে পিয়ের সেগেরসই এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্বভার নিয়ে প্রায়ই পারি যাওয়া-আসা করতেন।
জাতীয় লেখক-সংঘ মূলত দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয়-সমিতি গোপন সিদ্ধান্ত নেন—দুটি অঞ্চল থেকেই প্রকাশিত ফ্যাসীবিরোধী প্রতিটা সাহিত্যের প্রকাশনকে আরও কেন্দ্রীভূত একটা সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং এদিশিয়ঁ দ্য মিনুই থেকে প্রকাশিতব্য পান্ডুলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে ব্রুলার (ভেরকর) ও ইভন দেভিনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে। নতুন বই নির্বাচনের ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বভার রইলো পল এলুয়ারের ওপর।
প্রকাশনার ব্যাপারে নিজে সরাসরি অংশ না নিলেও, এই প্রকল্পে লুই আরাগঁ'র ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিশিয়ঁ দ্য মিনুই-এর দুটো

বই তিনি ছিলেন এবং আরও তিনটে বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। দক্ষিণ অঞ্চলে লেখক-সংঘের প্রধান হিসেবে এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব ছিলো অপরিসীম, এবং এই সিরিজের দুটো বই তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

●

এইসব কাজ যখন পরিপূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে, ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ে, প্রতিরোধ-আন্দোলন স্থির করে যে আরাগঁর মতো অতি পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে লিয়ঁর মতো বড় শহরে থাকাটাই কিছুটা নিরাপদ। ওঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন আরাগঁর জন্যে এমন একটা জায়গা খুঁজে বার করবেন যেখানে উনি খুব সহজেই আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন। আরাগঁরা চেয়েছিলেন দিয়া-লভিতে চলে যেতে, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আরাগঁকে অনেকেই চেনায় ফলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ভেবে সে প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই এলসা আর তিনি স্যাঁ-দোনা গ্রামের ছোট্ট একটা বাসায় চলে আসেন, যেখানে আমরা ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছিলাম। সেখান থেকে ওঁরা বেশ সহজেই নিয়মিত মাসিক সভায় যোগ দেওয়ার জন্যে লিয়ঁতে পেঁছিতে পারতেন। ওই জায়গাতে ছদ্মনামে ওঁরা গ্রামবাসীদের কাছে প্রায় অপরিচিত আগন্তুকের মতোই কাটিয়ে ছিলেন।

প্রকাশনার জন্যে যাকিছু লেখাপত্র দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কোনো প্রচারপত্রের প্রয়োজন হলে, কোনো দূতীকে পাঠানো হতো ওই কাজের জন্যে ভারপ্রাপ্ত লেখকের কাছে, নইতো নির্দিষ্ট সময়সূচী আগেই জানিয়ে দেওয়া হতো এবং ওই নির্দিষ্ট সময়ে লেখক তাঁর পান্ডুলিপি পূর্বনির্ধারিত জায়গায় রেখে আসতেন—সাধারণত জায়গাটা হতো হয় কোনো গ্রাম্য ডাকবাকস্, নয়তো গাছের গুঁড়িতে কোনো ফোকর কিংবা পাথরের ফাটল। তৃতীয় ব্যক্তি পান্ডুলিপিটা যে কখন নিয়ে গেছে লেখক কিছুই জানতে পারতেন না, অথচ তা ছাপার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই সম্পাদকের কাছে পেঁছে গেছে। অবশ্য ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা চোখে দেখার আগে হয়তো কখনও কখনও কয়েক মাসও কেটে যেতো।

স্যাঁ-দোনার এই নির্জন কুঠরিটায়, যেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা ভাবতো লুই আর এলসারা বোধহয় মিজিশ্যার লোক, কেননা ওঁরা গ্রাম থেকে হুটহাট প্রায়ই কোথায় যেন পাড়ি দিতেন—নানা ধরনের অজস্র কাজ থাকা সত্ত্বেও দুজনেই অবিরাম লিখে যেতেন। এখানেই আরাগঁ তাঁর শক্তিশালী গাথা 'ল্য মুজে গ্রেভ্যাঁ' রচনা করেন। 'প্রাণঘাতী নির্যাতনের মধ্যে গাওয়া কোনো বীরের গাথা,' 'পারি থেকে দূরে', 'ফরাসী তূর্যের গাথা'র মতো অত্যন্ত বহুল প্রচলিত গীতিকবিতা; এবং 'সুপ্রতিবেশী' 'অতিথি, 'সহযোগী'-র মতো অসাধারণ কয়েকটি ছোটগল্প; গোপন পত্র-পত্রিকার জন্যে অজস্র নিবন্ধ, প্রচারপত্র ও আবেদন রচনা তাঁর এই সময়েই সৃষ্টি।

এলসা ট্রিয়োলেও কিছু কম তৎপর ছিলেন না। জন্মসূত্রে রাশিয়ান হওয়ার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে ও'কে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তে হতো। রাশিয়ান বন্দীদের সাধারণত নগররক্ষী-বাহিনী হিসেবে দেশের দুর্গম দুর্গম সব অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, যারা সুযোগ পেলেই এই পাহাড়ী অঞ্চলে পালিয়ে আসতো। এলসা ওদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতেন এবং মাকিতে যোগ দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতেন। অসম্ভব ব্যস্ততা সত্ত্বেও এলসা তাঁর প্রতিরোধ-আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ছোট উপন্যাসের সংকলন 'লে আমন দাভিন'‌)' এই সময়েই শেষ করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আরাগঁ তাঁর কাব্য-সংকলন 'লা মুজে গ্রেভ্যাঁ' রচনা শেষ করেন। দুটো বই-ই প্রায় এক মাসের ব্যবধানে পারির এদিশিয়ঁ দ্য মিনুই থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

●

১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে জাতীয় লেখক-সংঘ পারিতে আর একটা কেন্দ্রীয় গোপন সভা করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে জাতীয় অভ্যুত্থানের আগে তাঁদের কাজের শেষ পর্যায়ের খুঁটিনাটি বিবরণগুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে নেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে আরাগঁরা দ্বিতীয়বার পারি গিয়েছিলেন এবং এবার সম্পূর্ণ জাল পরিচয়পত্র নিয়ে। যেহেতু এই সভায় প্রকাশন সূচী নির্ধারণ করা হবে, তাই ও'দের সঙ্গে ছিলো বিভিন্ন বইয়ের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি। ওগুলো ছিলো এলসার চওড়া একটা হাতব্যাগে। 'লা ফাঁস দ্য ভিভর এ দ্য মুরির দ্য গাব্রিয়েল পেরি' বা 'গাব্রিয়েল পেরির বাঁচা মরার প্রস্তুতি' পাণ্ডুলিপিটা ছিলো একেবারে ওপরে। প্রথমে মনে হয়েছিলো যাত্রাটা বুঝি নির্ঝঞ্ঝাটেই সম্পন্ন হবে। কেননা, ১৯৪১ সালের মতো চিহ্নিত-এলাকা বরাবর তেমন বিপজ্জনক পাহারা কিছু ছিলো না। কিন্তু একটা স্টেশনে গেস্টাপোর প্রতিনিধিরা হঠাৎ ট্রেনটায় হানা দেয় এবং প্রতিটা কামরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতে শুরু করে। আরাগঁরা স্পষ্টই অনুমান করতে পারলেন এ যাত্রায় আর মুক্তি পাওয়া গেলো না।

মেটো-সবুজ রঙের উর্দিপরা একজন সৈন্য আরাগঁদের কামরায় উঠলো এবং যাত্রীদের প্রতিটা জিনিসপত্তর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলো। ভিড়েভরা কামরায় আরও অনেক মহিলা ছিলেন এবং এলসার পালা আসার আগে ও'দের হাতব্যাগগুলো সব পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। এলসার হাতব্যাগের ঠিক ওপরেই ছিলো চেনটানা উজ্জ্বল নতুন আর একটা ছোট ব্যাগ। তরুণ সৈনিক হাতব্যাগ থেকে সেই ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়ে দেখলো। 'স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, এ যাত্রায় আমাদের আর কোনো আশা নেই।' দৃশ্যটা বর্ণনা করে আরাগঁ আমাকে পরে বলেছিলেন। 'কিন্তু ঠিক তখুনি দরজার সামনে থেকে একজন পদস্থ অফিসার সৈনিকটিকে ডাকলেন। ছোট

ব্যাগটা এলসার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সৈনিকটি বেরিয়ে গেলো। ও যখন ফিরে এলো তখন ভুলেই গেছে যে একটা হাতব্যাগ পরীক্ষা করা বাকি ছিলো। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও আবার চলে গেলো। আমরা তখন নিঃশ্বাস নিতেও সাহস পাচ্ছিলাম না।'

পারি স্টেশনে পল এলুয়ার আর তাঁর স্ত্রী ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আরাগঁর কাছে সেটা ছিলো একটা আশ্চর্য নাটকীয় মুহূর্ত। ১৯৩১ সালে স্যুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে আরাগঁর সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর থেকে দুজনের মধ্যে আর একটিও শব্দ বিনিময় হয়নি। বহু বছরের অজস্র বিভ্রান্ত ঘটনা আবার দুজনকে একই পথে মিলিয়ে দিলো।

এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার তেমন ঘটনাবহুল কিছু ছিলো না। সঙ্গে আনা পাণ্ডুলিপিগুলো আরাগঁ যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের দক্ষিণ অঞ্চলে কাজের বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রীয় গোপন সভায় পেশ করেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন পল এলুয়ার, রুদ মরগান, জাঁ পলআঁ, জাঁ রুলোর, জাঁ লেসকার, পিয়ের দ্য লেসকার, জাঁ-পল সার্ত এবং আরও অনেকে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সমিতিকে সাহায্য করার জন্যে সুভেলেম' নাশিওনলেকে আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনাও করা হয়েছিলো।

এই সম্মেলনটি ছিলো খুবই সময় উপযোগী। বিভিন্ন প্রতিরোধ-আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো এবং শেষের দিকের নানার ঘটনায় তা আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলো। ভিসির এলাকাধীন অঞ্চল জার্মানদের দখল করে নেওয়ার ফলে ভিসির সাম্ভাব্য পরবর্তী-মৈত্রী ভূমিকাকেও দীর্ঘ আলোচনার পর নাকোচ করে দেওয়া হয়েছিলো। একদিকে স্তালিনগ্রাদ, লিবিয়া, তিউনিস, এমন কি সম্প্রতি ইতালিতে সম্মশক্তির চরম পরাজয়, মিত্রবাহিনীর দ্রুত অবতরণের প্রতিশ্রুতি ফরাসীদের মনে অসীম বল সঞ্চার করতে পেরেছিলো, লেখকদের মধ্যে মুছে দিতে পেরেছিলো যাকিছু তুচ্ছ বিভেদ। অক্টোবর শেষ হবার আগেই আরাগঁরা কাজের জন্যে আবার তাঁদের স্যাঁ-দোনার বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন।

•

নিজের এবং সতীর্থদের সম্পর্কে আরাগঁ ছিলেন খুবই ঋজু। তিনি গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের কাজ অস্ত্র বহন করার চাইতে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং প্রতিরোধ-আন্দোলনের এই অদ্ভুত যুদ্ধে এটা খুবই গৌরবময় একটা অধ্যায়। শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর এবং সামগ্রিকভাবে লেখকদের যোগ্যতা সম্পর্কে আরাগঁর কোথাও কোনো সন্দেহ ছিলো না। একটা জাগ্রত জনগণকে সংগ্রামী বাহিনীতে কিংবা প্রতিরোধ-আন্দোলনকারী একটা দলে পরিণত করাটা—এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট অন্য দেশপ্রেমীদের কাজ। এ সম্পর্কে আরাগঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ—

তাঁর দলের কোনো লেখকই এ কাজে অংশ নেবে না।
একবার ওঁর অসম্ভব ক্রোধের কথা আমার মনে আছে, যখন কাঁ মার্সনাক নামে প্রতিভাবান একজন তরুণ কবি এবং লেখক-সংঘের এক বিশেষ দূতী, মাকি-বাহিনীতে দুমাস সময় নষ্ট করে ফিরে এসেছিলো। দুমাস আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাণ্ডুলিপি দিয়ে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে তাকে দূরের একটা শহরে পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু ফেরার পথে বিপ্লবের জন্যে আক্রান্ত হয়ে সে মাকির একদল বন্ধুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। ফিরে আসার পর দায়িত্বপূর্ণ পদটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আরাগঁ তাকে কথার চাবুকে একেবারে জর্জরিত করে ছেড়েছিলেন।
মার্সনাক চলে যাবার পর আরাগঁ আমাকে বলেছিলেন ও কি ভাবে ১৯৪৩ সালে জার্মান বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছিলো। 'ও আমাদের খুবই প্রতিভাবান একজন তরুণ কবি। আমি জানি কেন ও একাজ করেছে। একজন তরুণ যে জার্মান বন্দীশিবিরের মতো ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় কাটিয়েছে, তার পক্ষে জার্মানদের ঘৃণা না করে থাকাটা কেমন করে সম্ভব? তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুযোগ ত্যাগ করাটা খুবই কঠিন।' তাঁদের দলের কারো কারো বিরুদ্ধে এই 'অতি-তৎপর' ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও আমি জানি আরাগঁ নিজেও প্রতিরোধ-আন্দোলনের লড়াই বিভাগে সরাসরি অংশ গ্রহণের জন্যে তীব্র আর্তি অনুভব করতেন, আবেগ আর বিপদের মধ্যে শানিয়ে নিতে চাইতেন নিজের অভিজ্ঞতাকে।
১৯৪৪ সালে জুলাইয়ে স্যাঁ-দোনা অঞ্চলে প্যারাস্যুট থেকে অস্ত্রশস্ত্র ফেলার সময় একবার আরাগঁদের উপস্থিত থাকার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছিলো। সুতরাং একদিন রাত্রে আরাগঁ আর এলসা গাঁয়ের সবচেয়ে উঁচু অধিত্যকায় উঠে ছিলেন, আশ্চর্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোয় ওঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিমানগুলো এসে তাদের দুর্লভ ভার মুক্ত করে দিয়ে চলে গেলো। এবারও অস্ত্রশস্ত্র সব লুকিয়ে রাখা হলো কাছের একটা পাহাড়ী গুহায়। আরাগঁরা তাদের গ্রামে ফিরে এলেন নিশ্চিন্তকায়।
সবে ঘন্টাখানেক ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ, হঠাৎ জার্মান বোমারু বিমানের গর্জনে ওঁদের ঘুম গেলো ভেঙে, শুনলেন স্যাঁ-দোনার রাস্তায় রাস্তায় মেশিনগান থেকে গোলাবর্ষনের শব্দ। সংবাদক এসে জানালো ট্রাক আর সাঁজোয়া দিয়ে জার্মানরা গ্রামটাকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। আরাগঁ আর এলসা আবার দ্রুত পোশাক পালটে রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে পালিয়ে, জার্মান বিমান থেকে ছোঁড়া গোলাগুলি কোনো রকমে এড়িয়ে, পাহাড়ের ঢালুতে একটা আঙুর বনে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন। সারাটা দিন ধরে জার্মানরা স্যাঁ-দোনার ঘরবাড়ি আর মানুষজনের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলো।
জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে শান্তিরক্ষার কাজে যেসব বাহিনী অংশ নিয়ে-

ছিলো, তারা তেমন দুঃসাহসী ছিলো না। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে তারা বরা-বরই উপত্যকার নিরাপদ আশ্রয়ে কিংবা সুরক্ষিত নগরে ফিরে যেতো। ধ্বংস-স্তূপ সরানোর কাজে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্যে আরাগঁরা যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, দেখলেন তাঁদের ঘরটার কোনো চিহ্নই নেই। তেরো বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে আটাত্ত বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত—সাতাশজনকে ধর্ষণ করা হয়েছে, নিহত হয়েছে আটজন। প্রতিটা বাড়ি আর দোকানের যথাসর্বস্ব লুঠ করা হয়েছে। এমন কি অত্যন্ত সাধারণ গৃহ-স্থালীর সামান্যতম সম্পদও ওইসব আধুনিক বর্বররা নিয়ে যেতে ভোলেনি। মাকির অবৈধ কর্মতৎপরতা জার্মানদের বাধ্য করেছে নিরাপরাধ মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে—সেদিনের ঘটনায় ভিসির এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আরাগঁ এতটুকুও সময় নষ্ট না করে বেশ কিছু প্রচারপত্র রচনা করলেন, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে ওইসব দমনমূলক সামরিক অভি-যান ছিলো ফাঁদে-পড়া মরিয়া নাৎসিদের শেষ প্রচেষ্টা, যদি ভয় দেখিয়ে সাধা-রণ মানুষকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়। এবং এই ধরনের যৌন বিকৃতিমূলক আচরনের একমাত্র জবাব সরাসরি বিপ্লব।

প্রতিরোধ-আন্দোলনের শেষের মাসগুলোতে আরাগঁদের একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছিলো, যাতে দ্রোম অঞ্চলে মাকি সদর-দফতরের সঙ্গে ওঁরা নিয়মিত যোগা-যোগ রাখতে পারেন। সেখানে ওঁরা যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, জনসাধারণের মনোভাবের ওপর তাদের উপদেশ দিতেন এবং জন-সাধারণকে রক্ষা করার স্বপক্ষে মাকি কম্যান্ডরকে সাহায্য করার কথা বলতেন। এ সময়ে আরাগঁর কর্মতৎপরতা ছিলো প্রায় আকাশছোঁয়া।

*

ফরাসী আর আমেরিকান সাঁজোয়াবাহিনী লিয়ঁকে মুক্ত করে সাওন আর এঁ্যা নদী অতিক্রম করে যখন দ্রুত আলসাসের দিকে ধেয়ে চলেছে, আরাগঁরা তখন সঁ্যা-দোনাতে তাঁদের বসবাসের পালা চুকিয়ে ঝড় বইয়ে দেওয়া সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এতদিন যাদের মধ্যে বাস করে এসেছেন সেইসব মানুষদের বিদায় জানালেন। সেই প্রথম ওরা জানতে পারলো ওঁদের প্রকৃত পরিচয়। আরাগঁরা লিয়ঁতে ফিরে এলেন। এখানে আরাগঁর অসম্ভব ব্যস্ত কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেলো বিভিন্ন সহকর্মীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা অনু-সন্ধানের কাজে আর লেখক-সংঘের প্রথম উন্মুক্ত সমাবেশ আয়োজন করার ব্যাপারে এবং সেই সঙ্গে সদ্য গঠিত তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রীসভার কাজ তদারকিতে।

এই ধরনের প্রগাঢ় উদ্দীপনাময় কাজে পাঁচটা বছর কাটানোর পর আরাগঁ চেয়ে-ছিলেন স্বাধীনতার জন্যে এতদিন যা কিছু বুকের মধ্যে লালন করে এসেছেন, সে সম্পর্কেই কিছু লিখতে; চেয়েছিলেন ধ্বংসস্তূপ থেকে যাকে আবার

নতুন করে গড়ে তুলতে হবে,সেইস্বাস্থ্যের নিয়মবাকিক যান্ত্রিক কাজের শৃংখলে বাধা পড়াটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে। যাসেই অঞ্চলে প্রজাতন্ত্রের কমিসনার হিসাবে স্বাধীনতার এই অগ্রনী নায়কের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাঁর স্বলাভিষিক্ত একজনকে খুঁজে দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে তুলুজ অঞ্চলে একই দায়িত্ব ভার নেবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিলো। সৌভাগ্যবশত সেখানে তাঁর সুহৃদ জাঁ কাসো ছিলেন, যিনি তুলুজেরই অধিবাসী, নিজের চাইতে আরও যোগ্য হিসেবে যাঁর নাম আরাগঁই প্রস্তাব করেছিলেন। সাময়িকভাবে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর 'লা দিয়ান ফ্রাঁসেজ' কাব্যগ্রন্থ শেষ করার কাজে এবং প্রতিরোধ-আন্দোলনের পটভূমিতে একটা উপন্যাস রচনার খসড়া সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে।

কিন্তু তিনি অত সহজে মুক্তি পাননি। পারি মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য-পত্রিকা 'স্য সোয়ার'-কে আবার উজ্জীবিত করা হয়, যুদ্ধের আগেই যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন আরাগঁ নিজে। অন্যতম সম্পাদক জাঁ রিশার ব্লখ তখন ফ্রান্সের বাইরে যিনি ১৯৪১ সালে আসন্ন গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্লখ ফিরে না আসা পর্যন্ত পত্রিকাটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর্তি অনুভব করেছিলেন আরাগঁ। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে আবার পারিতে ফিরে আসতে হয়েছিলো, এবং ডিসেম্বরে ব্লখ ফিরে আসার পর তবেই তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন।

লেখক-সংঘের প্রতি তাঁর উৎসাহ আর উদ্দীপনা ছিলো ঠিক আগেরই মতো। অজস্র কাজের ফাঁকেই তিনি সময় করে নিয়েছিলেন—অবরোধের সময়ে লেখক-সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বাকিছু সাহিত্যকর্মের পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে জাঁ ব্রুলার, পিয়ের দ্য লেসকার এবং পল এলুয়ারের সঙ্গে পরিকল্পনা করার। যুদ্ধপূর্ববর্তী নুভেল রাভ্যু ফ্রাঁসেজ-এর জীবন্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে লে লেত্তর ফ্রাঁসেজকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজেও তিনি অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের দুটি পত্রিকা, প্রতিরোধ-আন্দোলনের সময় যার অপরিসীম মূল্য ছিলো, সেই পোয়েজি এবং কঁফ্লুয়াঁসকে আরাগঁ আবার পারি থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। নভেম্বরের প্রথম দিকে তিনি কোনো রকমে সুযোগ করতে পারলেন তুলুজে অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন জাতীয় লেখক-সংঘের সম্মেলনে যোগ দেবার। সেখানেই জাঁ কাসোর সঙ্গে ওঁর দেখা হলো, যিনি মুক্তির শেষ দিনগুলোতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন। দেখা হলো তাঁর হারিয়ে যাওয়া অন্যান্য বহু সহকর্মীদের সঙ্গে। অন্য দিকে আবার পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেই জানতে পারলেন বহু সহকর্মী বাকি থেকে লড়াইয়ের সময়ে হয় মারা গেছেন, নয় তো জার্মানীতে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

জার্মান কর্তৃক ফ্রান্স অবরোধের সময় লুই আরাগ'র কাহিনী প্রকৃতপক্ষে এক-জন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমগ্র প্রতিরোধ-আন্দোলনেরই কাহিনী। এ কাহিনী প্রতিরোধ-আন্দোলনের আশ্চর্য সচেতন এক নায়কের কাহিনী, যিনি বিজেতার বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ছিলেন দশজন লেখকের চাইতে অনেক বেশি সুসংহত এক যন্ত্র বিশেষ, একজন মানুষ যিনি জনসাধারণের কাছে শত্রুকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন আত্মচেতনার এক নতুন বোধ এবং তাঁদেরই শক্তিতে সাহায্য করে-ছিলেন তাঁদের নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে।

লুই আরাগ' নিজে কখনও দাবী করতেন না যে তিনি একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখক, অথবা তাঁর সময়ে লেখকদের সংগঠক। তাঁদের কাজের সার্থ-কতার জন্যে তিনি অন্য অনেক স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। কিন্তু ফ্রান্সে এটাই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে—তৎপরতায় তিনি ছিলেন কমপক্ষে পাঁচজন মানুষের সমান, আর লেখনীতে পাঁচজনের চাইতে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। পল এলুয়ার, জাঁ বুলার, জাক দাকুর, পিয়ের সেগে-রস্, জাঁ লেসকার এবং আরও অনেকে, সংগ্রামে যাঁরা কোনো অংশে কম দুঃসা-হসী ছিলেন না, কিন্তু এই সংগ্রামে লুই আরাগ'র ভূমিকা ছিলো নিঃসন্দেহে একজন বীরচিত নায়কের ; অথচ আশ্চর্য, আরাগ' আদৌ স্বীকার করতেন না যে তিনি কোথাও কোনো নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

আরাগ' স্বীকার করতেন যে তিনি যা করেছেন সেটা ছিলো নতুন ধরনের একটা যুদ্ধে নতুন ধরনের একজন সৈনিকের কর্তব্য। যেহেতু স্বাধীনতা সমস্ত মানুষকেই সংগ্রামে সামিল হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলো, তাই তিনি মনে করতেন যে লেখকদের কাজ ১৯৪০ সালে যুদ্ধের সময় সৈনিকদের চাইতে আরও দক্ষতার সঙ্গে পালন করা উচিত। আত্মবিশ্বাসের এই প্রত্যাবর্তন, নিজের শক্তি আর ক্ষমতার ওপর এই যে সুনিশ্চয়তা, যা দেখা গেছে তাঁর কাজে আর লেখনীতে, যেন প্রতিরোধের ভরা-জোয়ার বিজেতাকে বাধ্য করেছে বিতাড়িত হতে—এটা ফ্রান্স আর ফরাসী জনগণের সত্যিই এক অদ্ভুত ধরনের পুনর্জন্ম। যেমনটা বহু প্রবীণ ফরাসী লেখকরা করেছিলেন, আরাগ' কিন্তু কখনই তাঁদের মতো যৌবনোচ্ছল প্রতিরোধ-আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। তিনি ছিলেন এরই অত্যন্ত সজীব একটা অংশ, যেমন তিনি আজও রয়েছেন নতুন ফ্রান্সের একজন হয়ে।

পিটার সি- রোডস্

অনুবাদ / অসিত সরকার

৬

যোদ্ধা কবি লুই আরাগঁ

পাবলো নেরুদা তাঁর আত্মজীবনীতে লুই আরাগঁ সম্পর্কে একটি চমৎকার
।ঃ 'মেধা, বাগ্মিতা, বৈদগ্ধ্য ও তীব্রতার সমন্বয়ে গঠিত এক ইলেকট্রনিক যন্ত্রবিশেষ হলেন আরাগঁ। তাঁর সঙ্গে কয়েকঘন্টা কথাবার্তা বলে যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমি নিঃশেষিত, কারণ এই দৈত্যপ্রতিম মানুষটি আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেন।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ফ্যাসিবিরোধী লেখক-সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধের শেষে একবার প্যারিসে এসেছেন নেরুদা। প্যারিসে এলেই অভিজাত কোন গৃহে আমন্ত্রিত হন। সেখানে অভিজাত ফরাসী পানীয় আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়। সেবার এসেছেন আরাগঁদম্পতির গৃহে। যেমন সুগন্ধ তেমনি স্বাদ, অতি মসৃণ সেই পানীয়। আরাগঁ বললেন আজই উপহারের পার্সেল পেলাম, তোমার সম্মানে খুলেছি। এই বাৎসরিক উপহার প্রাপ্তির পিছনে একটি গল্প আছে। বলি :

তখন জর্মানরা ফরাসী দেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং ক্রমশ এগিয়ে আসছে। প্রবল সাহসী অফিসার লুই আরাগঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক পরিসেবক বাহিনী পরিচালনা করতে, শত্রুব্যূহের কাছাকাছি। তিনশ মিটার দূরে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে, আরাগঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছতে দৃঢ়সংকল্প, এমন সময় ক্যাপ্টেন-ইন-চার্জ তাঁকে বাধা দিলেন। বয়েসে ছোট হলেও তিনি ক্যাপ্টেন, আদেশ করলেন, নির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করা চলবে না। জর্মান শত্রু খুব কাছে আছে। আরাগঁও কম জেদী নন। বললেন, আমার আদেশ ওই বাড়ি অবধি পৌঁছতেই হবে। ক্যাপ্টেন বললেন, আমার আদেশ, এখান থেকে এক পাও নড়া চলবে না। তারপর বাধল বিষম তর্ক। কিন্তু সেই তর্ক দশ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। হঠাৎ দুজনে দেখলেন, একটি ভয়ঙ্কর গোলা জর্মান এলাকা থেকে উড়ে এসে বাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িটি পুড়ে ছাই।

অব্যবহিত মৃত্যুর হাত থেকে কবিকে যিনি বাঁচালেন, তাঁর নাম কাউন্ট আলফোঁস দ্য রথশিল্ড। সেই থেকে প্রতিবছর ঘটনার দিনটি স্মরণ করে কাউন্ট তাঁর নিজস্ব ভিনিয়ার্ডে প্রস্তুত বিশেষ মদ্য কয়েক বোতল কবিকে উপহার পাঠান।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। যেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হল। তার আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতৃস্থানীয়েরা হিটলারের ক্ষুধা উপশমের আশায় একের পর এক অঙ্গল উপঢৌকন দিয়ে এসেছেন। কিন্তু হিটলারের

করা নিবৃত্ত করা যায়নি। ফরাসী দেশবাসী আবার বেশি স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত না করা পর্যন্ত শান্তি নেই জর্মানদের মনে। নিরুদা লিখেছেন, চিলিয়ান দূতাবাসে মহান ফরাসী কবি লুই আরাগঁকে আমরা থাকতে দিলাম। প্যারিসের পথে পথে ওরা প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতে পেলে কুটে ফেলবে। চারদিন দূতাবাসে ছিলেন আরাগঁ, দিনরাত লিখলেন, শেষ করলেন তাঁর উপন্যাস 'লে ভোয়াইয়াঝ্যর দ্য ল্যাপেরিয়াল' বা 'প্যাসেঞ্জারস অফ ডেসটিনি'। পঞ্চম দিনে সৈনিকের পোশাক পরে যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন। জর্মানের বিরুদ্ধে এ তাঁর দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অবতরণ।

'মেম্যোয়ারস' থেকে পাবলো নেরুদা অনুসরণে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দুই যুদ্ধের মাঝে লুই আরাগঁ

দুই যুদ্ধের মাঝামাঝি সে এক অশান্ত সময়। নরকের প্রজ্বলিত আগুন দেখে নির্বোধেরা ভাবছে বুঝি ভোর হলো। তখন আমি এক যুবককে চিনতাম। পিছু ফিরে তাঁর দিকে তাকালে আজ বুঝতে পারি, জার্মান অধিকারের সময় থেকে শুরু করে লোককবি ও লোকযোদ্ধা হিসাবে যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে গেছেন লুই আরাগঁ, তার পূর্বাভাস ছাপ রেখে গেছে তাঁর জীবনের একেবারে প্রথম থেকেই। ১৯২০-র দশকের সূচনায় আরাগঁকে আমি প্রথম দেখি। রু দ্য ল্যুনিভের্সিতের এক পুরনো হোটেলে আমার কামরায় এসেছিলেন তিনি। এ ঘরে আমি উঠেছিলাম জেমস্ জয়েস্-এর সুপারিশে। লাল-রঙা মখমলে মোড়া এক হাতা-ধরা চেয়ারে বসেছিলেন আরাগঁ। বসে-ছিলেন ব্যাল্কনির দিকে পেছন ফিরে, উত্তরে সেইন নদীর বাঁ-তীরের দিকে তাঁর চোখ। ছায়ার মাঝে, উত্তেজিত, কুঞ্চিত, সুন্দর মুখমণ্ডলে এক বিষণ্ণ আভা। আমি জানতাম যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এক সাধারণ সৈনিক হিসেবে। বললাম :

'যুদ্ধটা তাহলে শেষ হলো! আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন?'

'তাই বুঝি!' আরাগঁর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা, 'এটাকে আপনি 'শান্তি' বলছেন! আচ্ছা, যুদ্ধের পরিখাগুলোর থেকে এটা ভালো কিসে?'

সেইসব দিনগুলোতে আরাগঁ ভালোবাসতেন আঁদ্রে জিদ্‌কে। জিদের ঝরঝরে গদ্যে মিশে থাকতো এক ধরনের দ্ব্যর্থবোধক ভাব। সেই ভাবের ইচ্ছেমতো অর্থ করতে পারতো তরুণ চিন্তাশীলরা। আরাগঁর পক্ষপাত ছিলো লে কাভ্যু দ্য ভাতিকাঁ-র ওপর, লাফ্‌কাদিয়োর যথেচ্ছ কার্যকলাপ, উদ্দেশ্যহীন অপরাধের ওপর। মেজাজের দিক থেকে তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী, রোম্যান্টিক বিপ্লবী। কিন্তু এমন কি সেইসব দিনেও, যখন তিনি অনুসরণ করেছেন ত্রিস্তাঁ ৎসারার দাদাইজ্‌ম্, আর সংবেদনময় সুপ্রচুর সাহিত্যিক রচনা দিয়ে যাত্রা শুরু করছেন স্যুররিয়্যালিজ্‌মের পথে, তখনও এ সত্য স্পষ্ট ছিলো যে আরাগঁ উঠে এসে-ছেন ফরাসী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র থেকেই। তাঁর চমৎকার, বলিষ্ঠ গদ্যে ফুটে উঠতো চিরায়ত ঐতিহ্য, ঘোষিত হতো বিদ্রোহ—বুর্জোয়া য়ুরোপের বিরুদ্ধে, 'শান্তি'-র মুখোশ-পরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এই তরুণের সুস্থির, প্রশান্ত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে স্পষ্ট ছিলো এক সামগ্রিক সংস্কৃতি, যা তাঁর অনুভূতির ক্ষমতাকে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মাত্রাধিক্যকে ধরে রাখতো সঠিক অবস্থানে। এই 'অতীতের শত্রু'-র ধাঁধার উৎস ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্যিক ও মননশীল ভিত্তির মধ্যেই নিহিত, যেখানে এমন কি সেজানের শিল্পের উৎসও, তিনি জানতেন, নিহিত ছিলো যাদুঘরে।

যতদূর মনে পড়ে ওই বছরেই, অথবা পরের বছর, লেয়ঁ দদে-র কিশোর পুত্র একটা ট্যাক্সির মধ্যে আত্মহত্যা করে 'ঐ শাস্তি'-র প্রতি বুবমানদের বিতৃষ্ণার এক যথার্থ প্রতিফলন ঘটায়। লেয়ঁ দদে ছিলেন এক মারাত্মক ক্ষতিকর প্রচার-পত্রিকা-রচয়িতা। শার্ল মোরার সঙ্গে যৌথভাবে লাকস্যা ফ্রাঁসে সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। তরুণ দদে সাহিত্যিক নৈরাজ্যবাদীদের একটি দলের মধ্যে ছিলো। আরাগঁ আমাকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যারি তখন উগ্র অপরিণতবয়স্ক প্রতিভাধরে ভরপুর। দুর্ভেদ্য আর ফরাসী ভাষার মৃত্যুর নকশা রচনা করে চলেছে তারা। আর তাদের মধ্যে আরাগঁ স্পষ্টতই পৃথক, যতটা পার্থক্য কোনো কালির প্রলেপের সঙ্গে র‍্যাফায়েলের রেখায়; তাদের ভঙ্গিতেই কথা বলতেন তিনি, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, যেন সেগুলির রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ একান্তই স্পষ্ট: এই মানুষটির মধ্যে ছিলো এক সহজাত শৃঙ্খলাবোধ, আর নিজের মূলভূমি তাঁকে যুগিয়েছিলো প্রাণরস।

মরিস্ ব্যারের মৃত্যুসংবাদ আমরা যেদিন শুনি, সেদিন রাত্রে আমি আরাগঁ'র সঙ্গেই ছিলাম। উগ্র জাতীয়তাবাদী পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে মরিস ব্যারে নিঃসন্দেহে ভিন্ন পক্ষের লোকই ছিলেন। কিন্তু, এক মহান সাহিত্যিক ব্যক্তি হিসেবে আরাগঁ তাঁকে সম্মান করতেন। ব্যারের প্রথম দিককার উপন্যাসের আত্মপূজা পরবর্তীকালে স্বদেশপূজায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। নিজের রোম্যান্টিক নৈরাজ্যবাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অহংবোধের প্রতি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু ফলপ্রসূ হতে পারেনি, অথচ তা অসফল হওয়ারও কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ ছিলো না। তৎক্ষনাৎ কোনো পত্রিকায় শোকবার্তা পাঠাতে চাইছিলেন তিনি। শোকবার্তা লেখার জন্যে একটু রাত করে তিনি আমার ঘরে এলেন। আমার টেবিলে বসে শুরু করলেন লিখতে। গ্রেকো-সুলভ সৌষ্ঠব তাঁর সর্বাঙ্গে, ঝরঝর করে লিখে চললেন। সুন্দরভাবে লিখতেন আরাগঁ। ভাবনার পৃথকীকরণ, রেমি দ্য গুর্মঁ যাকে ভালো চিন্তা ও ভালো লেখার প্রলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, লুই আরাগঁ'র কাছে তা ছিলো একান্তই স্বাভাবিক।

ব্যারের গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতির মধ্যে (একজন দাদাবাদীর পক্ষে যা একান্তই দুঃসাহস) এক দূরদর্শীতা মিশে ছিলো। যে মাটিকে জাতীয়-তাবাদীটি ভালোবাসতেন, প্রাণপণে সেবা করতেন, তা ছিলো আরাগঁ'র আরও সর্বাঙ্গীন দূরদর্শীতার অঙ্গ। শুধু ব্যারে ও জিদ্-এর থেকেই নয়, তাঁর তৎকালীন সহযোগী আঁদ্রে ব্রাতঁ, ফিলিপ সুপো প্রমুখদের থেকেও পৃথকভাবে আরাগঁ'র রোম্যান্টিক অহংবোধ তাঁর যুগের, ফ্রান্সের, এবং সমগ্র বিশ্বের এক অস্পষ্ট আভাস দিতো। আরাগঁ'র আবিষ্কৃত অহং পূর্ণাঙ্গ; কোনো সামা-জিক, আত্মিক মাত্রার অভাব তাতে নেই। তাঁর প্রথম দিককার গদ্যে এর আভাস

মেলে, সাহিত্যকে সক্রিয়তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে তৈরি ছিলেন তিনি—আভাস মেলে তাতেও। পরবর্তীকালে, এই সত্য অনুভব করা যায় তাঁর সাম্যবাদে। অবশেষে, সারা দুনিয়া এর সন্ধান পায় এক কুৎসিত বসন্তে, ফ্রান্সের পতন বিষয়ে তাঁর গীতিকবিতায়, যার মধ্যে চাতুর্যহীনভাবে মিশে গেছে একেবারে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত দরদ আর জাতীয় বেদনা।

আমাদের বহুবার সাক্ষাতের প্রসঙ্গে এসে আমার স্মৃতি ছুঁতে চাইছে আরাগ'র সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের সেই দিনটিকে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের বছর। আমরা জানতাম, যুদ্ধ আসছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে। জানতাম, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে স্পেনে, নকল গণতন্ত্রীরা ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করার জন্য খেলা খেলেছে, এবং জার্মানী আর ইতালিতে এই ফ্যাসিস্টদের স্পেনের প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঘৃণাটুকু একান্তই আন্তরিক। আমরা আরও জানতাম, রাশিয়ার বিরুদ্ধে গোপনে লড়াই চালাচ্ছে চেম্বারলেন, লণ্ডন শহর আর ফরাসী রক্ষণশীলরা। আমাদের সেই শেষ আলাপ-আলোচনার স্মৃতি আমার কাছে মহাপ্রলয়ের আগেকার শেষ পাঁচটা বছরের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। শেষবার স্পেনে যাওয়ার আগে-পরে আমি পারিতে ছিলাম। রমাাঁ রলাঁ-র সঙ্গে দেখা হয় ভ্যাজ্‌লে-তে (তাঁর অশক্ত, অতিপ্রিয় হাতদুটি পিয়ানোতে বাজিয়ে চলেছিলো বেথোফেনের শেষ ব্যাগাটেলি); মুাঁ ভ্যান্‌-তে ছিলাম জিদ্‌-এর সঙ্গে; ঝাক মারিতাঁর সঙ্গে দেখা করলাম পারির শহরতলীতে তাঁর অনাড়ম্বর ঘরে। এই অন্তিম যোগাযোগ-গুলির মধ্যে লুকিয়ে ছিলো এক রহস্যাত্মক প্রতীক ; শেষের সেদিন এগিয়ে আসছে, আমরা জানতাম। আর আরাগঁ তখন কি করছিলেন? আমার বন্ধু জাঁ-রিশার ব্লখকে গেস্টাপোর হাত থেকে গোপনে রক্ষা করেছিলো পারির পুলিস বিভাগ। ব্লখের সঙ্গে যৌথভাবে আরাগঁ সম্পাদনা করছিলেন সান্ধ্য-পত্রিকা 'স্য সোয়র'। বিগত বছরগুলি সুদৃঢ় করে তুলেছে তাঁর উদ্দীপনা-কে। তাঁর মধ্যেকার গীতিকারটি সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কারণ উৎসটা তার পৃথিবীর মাটিতে। আর এখন সেই গীতিকার পরিণত হয়েছেন মানুষে—ফ্রান্স যার স্বদেশ, রাশিয়া যার স্বদেশ, য়ুরোপ যার স্বদেশ, স্বদেশ যার তামাম দুনিয়াটাই।

আরাগ'র বিবর্তনের এই চূড়ান্ত স্তরের সূচনা আমি লক্ষ্য করি ১৯৩৫ সালে। সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে পারিতে তখন চলছে লেখক সম্মেলন। গিয়ে পৌঁছেছি পারিতে। সম্মেলন তখনও শুরু হয়নি। বুল্‌ভারের মধ্যে দিয়ে আরাগ'র সঙ্গে হেঁটে বেড়িয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম প্রথম দিনের অনেকটা সময়। আগের বছরের ব্যর্থ প্রতিবিপ্লবের (ফ্যাসিস্ট ঘটনা) কথা, পারির বিপুলায়তন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকৃতির কথা বলছিলেন তিনি। বলছিলেন এই সম্মেলন পাল্টা আঘাত হানার রণনীতিরই একটা অঙ্গ। গণ-

তান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সময়মতো সংগঠিত করতে পারলে শত্রু হয়তো আ হানতে পারবে না। সম্মেলনে অনেক আশাবাদী মানুষ ছিলেন; কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন সব থেকে বেশি আশাবাদী। কিন্তু আরাগঁ জানতেন—কি ঘটতে চলেছে। ভবিষ্যৎ রক্তে রক্তে লাল। তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আর এই মনোভাব তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিলো। জীবনের প্রথম দিককার সেই স্যুররিয়্যালিস্ট দিনগুলিতে, প্রায় অসচেতনভাবেই, তিনি পুষ্ট হয়েছিলেন ফ্রান্সের মাটিতে, ফ্রান্সের ঐতিহ্যে। এখন, ধর্মবিশ্বেষী এক পার্টির বিশ্বস্ত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্য হিসাবে, প্রয়োজনকে স্বীকার করে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই স্বাধীনতা নিয়ে, যা যে-নামেই তিনি দিন না কেন, আসলে তা ধর্মীয় স্বাধীনতাই। গোটা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় তখন একটাই মাত্র সুদৃঢ় ফ্রন্ট—ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট! আমাদের ছড়ানো-ছিটানো শক্তিগুলি আক্রমণের মুখে পড়তে শুরু করেছে। এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়। ১৯৩৫ সালে রূপায়িত হয়েছিলেন পরবর্তী আরাগঁ, গেস্টাপোর হাতে পর্যুদস্ত জাতীয় লেখকসংঘের আরাগঁ।

এবং এখন, ১৯৩৮ সালে আমাদের শেষ সাক্ষাতের সময়, আরাগঁ এক সৈনিক। রাশিয়া সম্বন্ধে প্রাঞ্জলভাবে কথা বলছিলেন তিনি। ট্রট্স্কির মোকাবিলায় স্তালিনপন্থীদের অবিবেচক কাজের সমালোচনা করেছিলাম আমি, শান্ত কণ্ঠে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করছিলেন আরাগঁ। ১৯৩১ সালের পর থেকে আমি আর রাশিয়ায় যাইনি। রাশিয়া সম্বন্ধে এমন কিছু সুপ্রচুর তথ্য আমার জানা ছিলো না, যা দিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি বা বিরোধিতা করতে পারি। তবু, তাঁর সব কথার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কিন্তু, ওই কবির কথা আর কাজের পেছনে বেদনাময় প্রশান্তিটুকু অনুভব করতে পারছিলাম। তিনি বাস করতেন এক শত্রু-অধিকৃত ফ্রান্সে, এক শত্রু-অধিকৃত য়ুরোপে। এ সত্য তাঁর জানা ছিলো।

আমি প্রায়শঃই বলেছি—কবি হচ্ছেন বাস্তবের এক যথার্থ প্রতিবেদক, এক সুস্পষ্টবাদী। (তাঁর উপাত্ত বিজ্ঞানের সীমায়িত এলাকাটুকু ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে যায়।) আর এই অর্থে আরাগঁ একজন কবিই ছিলেন, এবং কবিই আছেন।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই এই মানুষটি কাজ করে গেছেন এক অখণ্ড নৈতিকতার ভিত্তিতে, একেবারে ভিন্ন অর্থে একই কথা বলা যায় মালরো সম্বন্ধেও - যার উৎস হচ্ছে সমগ্রের সঙ্গে এক সুগভীর ও পরিপূর্ণ সংযোগ। এই নৈতিকতা তাঁর কাছে অধিবিদ্যকভাবে বা বিমূর্তভাবে আসেনি, এসেছিলো ফ্রান্সের প্রয়োজনে, সমকালীন সমস্যার প্রয়োজনে, নর-নারীর প্রয়োজনে। ফরাসী সাহিত্যের এক তাৎপর্যময় স্রষ্টা হিসেবে তাঁর নন্দনতত্ত্ব এক একীভূত নৈতিকতা, যা সন্ধান দেয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের, তাঁর জন-

জীবনের। পোঁল হলে এটাকে আরাগঁর গদ্যশান্তি নামে অভিহিত করতেন। এই ধরনের প্রাক্-যাত্রি-জমিতেই মুকুলিত হতে পারে ভালো কাজ, ভালো কবিতা।

ওয়ালদো ফ্রাঙ্ক

অনুবাদ: অসীম চট্টোপাধ্যায় ও অজয় চট্টোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের কবি লুই আরাগঁ

লুই আরাগঁ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবি। পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধে পরাজয় ও জয়ের মধ্যেই তাঁর কবিকৃতির পুনর্জন্ম ও পূর্ণতা। তাঁরমাতৃভূমি ফ্র্যান্সের বিগত যুদ্ধে পরাজয়ের ভেতরেই মৃত ফরাসী কবিতা পুনর্জন্ম লাভ করে। কবি হিসেবে ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করা বোধ হয় তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যেরই কারণ হয়েছিলো। নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সে পশুশক্তি ও শয়তানী ধোকাবাজী এই উভয়ের শাসন ও উৎপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। পথ ছিলো দুটো —হয় ঘরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, নয়তো প্রতিরোধ-সংগ্রামে যোগ দেওয়া,, সৈন্য হিসেবে নয়, স্রেফ মানুষ হিসেবে। ফরাসী প্রতিরোধ-আন্দোলনের কবিদের একটা সুযোগ ছিলো, তা হচ্ছে নেহাৎ স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নিজের আনন্দ বেদনার কথা বলতে পাওয়ার সুযোগ। এ ছাড়াও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে মাৎস্যন্যায়ের যুগে কবিতা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম। নিজেদের তাঁবেদার সরকারের সমস্ত হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা স্পৃহাকে জাতীয় জীবনে সর্বদা জাগ্রত রাখা ছিলো তাঁদের সর্বপ্রধান কাজ। কবিরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা এমন একটা বিশেষ সুযোগের অধিকারী, যা থেকে অন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা বঞ্চিত ; এবং তা হচ্ছে কবিতার দ্ব্যর্থবোধের অন্তরালে রূপক এবং উপমাচ্ছলে প্রবল অনুভূতিকে মানুষের মনে জাগিয়ে দেবার ও পৌঁছে দেবার সুযোগ। স্মরণযোগ্য কবিতা মুখস্থ করে মুখ থেকে কানে ও কান থেকে মনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এবং সাঁতাই ফরাসী প্রতিরোধ-আন্দোলনের যুগে আরাগঁর কবিতা লক্ষ লক্ষ ফরাসীর মুখে আবৃত্ত ও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। মধ্যযুগের জনচেতনার পরিবর্তন সাধনে হোমারের কবিতা যে দায়িত্ব পালন করেছিলো, নাৎসী অধিকৃত ফরাসী দেশেও আরাগঁ অনুরূপ দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকার কবিরা যখন বলেন 'আমি,' তখন সে 'আমি' কবির একান্ত ব্যক্তিগত সত্তাকেই বোঝায়। এই 'আমি' হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের অন্য পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র কাব্যাভিমানী এক উত্তম পুরুষ। কিন্তু আরাগঁ যখন বলেন 'আমি,' তখন সে 'আমি'র মানে হচ্ছে আমরা, অর্থাৎ গোটা ফরাসী দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ। বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসে লড়াইয়ের ময়দানে কর্মহীন দিনগুলোতে ওই একই কথা বার বার তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে, 'আমি তো ওদের কেউ নই,' যেমন 'রূপকথার রাত' কবিতায় তিনি লিখছেন ঃ

'আমার এ দেহে রক্তমাংসে পরমায় তো নয়
ঝিরিঝিরি স্রোত সাগরের প্রেমে আজও হয় উন্মাদ
এ মরজীবন বোনের স্নেহের চেরাপুঞ্জীর মেঘ
আজও চায়, তাই ওদের খাতায় আমি লেখাইনি নাম।'

আরাগঁ 'ওদের' দলে নন, কারণ 'ওরা' নিজেদের অতিমানবিক মনে করে করে অমানবিক পর্যায়ে এনে ফেলেছিলো। এই ওরা হচ্ছে নাৎসী জার্মানী অথবা আত্মসুখান্বেষী ভাঁবেদার সরকার। অন্য সাধারণ সৈনিকের মতো আরাগঁ একজন সাধারণ মানুষ, পরাজিত ও নির্যাতীত ফরাসী জাতির হয়ে এই সাধারণ সৈনিকের কথাই তিনি বলেছেন। আরাগঁ তাঁর কবিতাগুলিতে 'প্রেম,' 'সাহস' এবং 'স্বদেশ' প্রভৃতি কথাগুলোর যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত পুরোনো অর্থই আবার নতুন করে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আর একটি কবিতায় আরাগঁ বলেছেন, 'সুখটা যে সুখই এ কথাটা আমায় বলতে দাও,' আর সেই একই আবেগ নিয়ে আরাগঁ বলতে চেয়েছেন মৃত্যু মানে মৃত্যু, প্রেম মানে প্রেম আর পরাজিত হলেও ফ্রান্স তাঁর নিজেরই মাতৃভূমি ; স্বাধীনতা শব্দ বক্তৃতাবাগীশের নিরর্থক বাগাড়ম্বরই নয়, স্বাধীনতার জন্যে জীবন বিপন্ন করাও প্রেমেরই নামান্তর। তাই তাঁর 'শীতের গোলাপ' কবিতায় প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রথম শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন :

'ভোর ভোর আলো রাত করে খান্ খান্
হে অবিশ্বাসী তোমাদের দিলো আশা
যে প্রেমে মানুষ মরণেও গায় গান
তোমাদের বুকে দিলো সেই ভালোবাসা।'

প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্পষ্ট আহ্বান হয়ে উঠলো এবং অবধারিত ভাবেই তাঁর রচনার ওপর তাঁবেদার ভিসি সরকারের নিষেধাজ্ঞার বজ্রাঘাত এসে পড়লো।

আরাগঁ তখন শুরু করলেন গাথা রচনা করতে আর তা গান হয়ে উঠলো দেশবাসীর মুখে এবং ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে ছাপা হতে লাগলো গোপন বেআইনী প্রেসে আর না হয় ফ্রান্সের বাইরে সুইজারল্যান্ডে।

ফরাসী সরকারের পতন এবং আত্মসমর্পনের পর মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিরোধ-আন্দোলনের সংগঠকরূপে আরাগঁর আর এক নবজীবন লাভ। রাইফেল ঘাড়ে করে অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্রেঞ্চে, মাঠে, জঙ্গলে, গোপন সভাসমিতির বিপজ্জনক পরিবেশে। একদিকে সংগঠিত করছেন মুক্তি-আন্দোলন, অন্যদিকে প্রাণোজ্জ্বল কবিতায় মাতিয়ে তুলছেন দেশবাসীকে। আরাগঁর কবিজীবনের শুরু স্যুররিয়ালিস্ট কবি হিসেবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি যে শুধু কবিতাই লিখতেন তাই নয়, রাজনৈতিক জীবনে

তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী এবং ফ্রান্সের শ্রমিক কৃষকের পার্টি 'কমিউনিস্ট পার্টি'র একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী'। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর তৎকালীন কবিতাবলী শুধু জনগণ নয়, বুদ্ধিজীবী সাহিত্য-রসিকদের কাছেও দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন বলে প্রতীত হতো। আরাগঁর এই নিষ্প্রাণ কাব্যকৃতি সজীব হয়ে উঠলো তাঁর যুদ্ধকালীন লেখায়। সংগ্রামের মাঠে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর নতুন করে এই পরিচয় হলো সত্যিকারের পরিচয়। তাদের বেদনা প্রবাহিত হলো প্রতিটি শিরায়, তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণা গুমরে উঠলো কবির হৃৎপিণ্ডে। কবি শিখলেন উদ্দাম হয়ে ভালোবাসতে, কবি শিখলেন সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করতে, কবি শিখলেন সহজ কথা সহজভাবে বলতে। এই শিক্ষাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর এই শিক্ষাই সার্থক হয়ে ওঠে তাঁর যুদ্ধকালীন কবিতায়। সেই কবিতা জাগিয়ে তুললো ফরাসীদেশকে, গান হয়ে গেলো লক্ষ লক্ষ ফরাসী সন্তানের মুখে।

তাঁর এই যুদ্ধকালীন কবিতাগুলোকে ক্রমানুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে পড়ে যুদ্ধের শুরু থেকে জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্সের সীমান্ত লঙ্ঘনের মধ্যবর্তী সময়ের লেখা কবিতাগুলো। এই সময়ে সমগ্র ফরাসী জাত সন্দেহের দোলায় দুলছিলো। লড়াইয়ের ময়দানে কোনো স্পন্দন নেই, দেশের কর্ণধাররা বেলেল্লা ফটকাবাজিতে মত্ত। সাধারণ মানুষের অসহনীয় দারিদ্র্য আর যুদ্ধের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তলায় তলায় তাঁবেদার সরকার গঠনের হীন-প্রচেষ্টাকারীদের নির্লজ্জ চিৎকার। 'বিশবছর পরে' কবিতায় তাঁর হৃদয়স্পর্শী আর্তি :

> 'কুড়িটা বছর কি করে কাটলো জীবন হলো না চেনা
> মাঝ-বয়সেই শুধে দিতে হবে জীবনের যতো দেনা
> সোদনের যতো কোলের খোকন যুদ্ধে চলেছে আজ
> আমাদের সাথে (আহা কচি মুখ!) মেলায় কুচকাওয়াজ।'

বিশ বছর আগে দেখা কিশোর স্বপ্নের সঙ্গে নির্মম বর্তমানের কি নিষ্ঠুর তফাৎ। কিন্তু কবি জানেন কেন এই যন্ত্রনা :

> 'প্রেয়সী আমার প্রেয়সী আমার বিষাদ ছড়ায় ঢেউ
> আমার জীবন গোধূলি বেলায় তুমি ছাড়া কেউ নেই।'

বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁর এই প্রেয়সী তাঁর দেশ, তাঁর ফ্রান্স, তাঁর বিস্মৃত দেশাত্মবোধ।

'চিঠির অপেক্ষায় সন্ধ্যায়', 'রূপকথার রাত,' 'লাউডস্পীকারের জন্য' 'শহীদ স্পেন,' 'ঋতুরাজ,' 'অসমাপ্ত কবিতা' এই সময়েই রচিত। 'লাউডস্পীকারের জন্য' কবিতায় আরাগঁর সুস্পষ্ট আকুতি :

'প্রেমের কথা বলো আমায় সাগরে দাও ঢেউ
ছায়াবীথির নিচেও আহা রোদন জাগে বুকে।'

আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, দেশকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে জাতীয় সরকারের কোনো তাগিদ নেই, নিষ্প্রাণ বেলেল্লাপনা আর হৈ-হুল্লোড়ের অন্তরালে অন্তরের আবেগশূন্যতাকে ঢেকে রাখার এক ব্যর্থ প্রয়াস নির্লজ্জভাবে তখন প্রকট হয়ে উঠেছিলো। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কি আশ্চর্য ভঙ্গি আরাগঁ'র। রেডিওর লাউডস্পীকারগুলোকে যেন তিনি বলছেন, 'থামাও, থামাও তোমাদের বেলেল্লা মাতলামোর গান; প্রেমের কথা শোনাও, প্রেমের গান গাও। কতদিন যে প্রেমের গান শুনিনি, কি যে বেদনায় বুক ভরে উঠেছে!' কোন্ প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে যে এই প্রেমের গান তা বুঝতে ফরাসীদের কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি।

যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান আক্রমণের মুখে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ এবং তাঁবেদার ভিসি সরকারের আবির্ভাব আরও অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করলো। এই যুগে লেখা আরাগঁ'র কবিতাগুলোর মধ্যে 'জবা-গোলাপ,' 'গাথা', 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ,' 'মে মাসের রাত,' 'ডানকার্কে রাত,' 'সি' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলোতে দ্ব্যর্থবোধক রূপক এবং উপমার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তাঁবেদার সরকারের রোষবহ্নি এড়াবার জন্যেই এই দ্বিত্বের আশ্রয় গ্রহণ। 'জবা-গোলাপ' কবিতাটিতে আরাগঁ যখন বলেন:

'এখানে তো রাত···কোলাহল নেই···শত্রু ঘুমায়···বন
প্যারীরে আমার···আমার প্যারীর পতন হয়েছে কাল
হাওয়ায় হাওয়ায় খবর এসেছে, কি করে ভুলবে মন
শ্বেত প্রেমের ব্যর্থতা আর গোলাপজবার লাল।'

তখন জবা-গোলাপ এই রূপকের অর্থ ফরাসীদের কাছে আর দুর্বোধ্য থাকে না। জবা আর গোলাপের লাল রং তাদের মনে পড়িয়ে দেয়, লক্ষ লক্ষ তরুণের নিষ্ফল আত্মবলিদান এবং তাঁদের রক্তে লাল হয়ে ওঠা ফরাসী মাটির বুকভাঙা বিলাপ।

জার্মান আক্রমনের তীব্রতার মুখে ডানকার্ক থেকে মিত্র-সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ডানকার্কে'র নরমেধযজ্ঞের কথা ফরাসীরা কোনদিন ভুলবে না। ডানকার্ক থেকে অপসারিত সৈন্য-বাহিনীতে আরাগঁ'ও ছিলেন। তাঁর ডানকার্ক হারানোর ব্যথা এবং লজ্জা গোটা ফরাসী জাতির তৎকালীন বেদনাকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছে 'ডানকার্কে'র রাত' কবিতায়।

তাঁর এই যুগে লেখা কবিতাগুলির চরম পরিণতি 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ' কবিতায়। চালুশে-পাওয়া রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড-এর ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেলে তাঁর বিলাসব্যসনের বন্ধুরা যখন তাঁকে ত্যাগ করেন, তখন জাঁদার্ক (জোয়ান-অব-আর্ক)-এর পৌরোহিত্যে তিনি নতুন করে দেশপ্রেমের দীক্ষা

নেন। তাঁর হৃতসত্ত্ব সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে জীন্দার্ক ফরাসীদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন। 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ' কবিতাটি ১৯৪০-এ লেখা। আরাগঁর বয়েসও তখন চল্লিশ। চাল্‌শে-পাওয়া আরাগঁর অবস্থা তখন অনেকটা চাল্‌শে-পাওয়া দ্বিতীয় রিচার্ডের মতো। চারদিকে হতাশার শূন্যতা, কিন্তু এই শূন্যতার মাঝেও তাঁর অন্তরের সম্পদে তিনি গরীয়ান। সেই সম্পদ তাঁর দেশকে হারানোর দুঃখ। এই দুঃখের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। এই নিদারুণ মর্মবেদনাই তাঁর মনে আবার আশার সঞ্চার করে। ভকুলার নগরে জীন্দার্কের উদ্যোগে দ্বিতীয় রিচার্ডের হতাশার দিনকে শেষ করে আশার দিনের প্রথম সূত্রপাত হলো—ইংরেজ বাহিনীর প্রথম পরাজয়ে। আরাগঁও বিশ্বাস রাখেন তাঁর অন্ধকারচ্ছন্ন আকাশে ফরাসী জনচেতনার উদ্যোগে স্বাধীনতার সূর্য উঠবে।

ফরাসীদেশে প্রতিরোধ-আন্দোলন দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে আরাগঁর যুদ্ধকালীন কবিজীবনের তৃতীয় পর্যায়ের শুরু। এই পর্বে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে 'মুক্ত অঞ্চল', 'এল্‌সা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'সব অশ্রুই সোনা', 'সিংহ-হৃদয় রিচার্ড', 'আয়নার সামনে এল্‌সা', 'ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গেয়েছে গান,' 'শীতের গোলাপ' এবং 'প্যারী' উল্লেখযোগ্য। 'মুক্ত অঞ্চল' কবিতাটির আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। অধিকৃত অঞ্চলে ফরাসী দেশপ্রেমের গান গাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু মুক্ত অঞ্চলে প্রাচীন ফরাসী সংগীতের মৃদু রেশ তাঁর হৃদয়ের ক্ষতস্থল স্পর্শ করে যায়। তিনি বোঝেন তাঁর বেদনা কত গভীর :

> 'ক্ষণেক বুঝিবা শুনলো আমার মন
> কচি ধান ক্ষেতে অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌
> ফল্গুর মতো রুদ্ধ একি এ তান!
> কে দিলো আমার হৃদয়ে হারানো সুর ?
> এত সৌরভ-টলোমলো অশ্রুর
> কনক চাঁপাও পায়নিকো সন্ধান।'

তাঁর রূপক ব্যবহারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায় 'এল্‌সা আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিতায়। আরাগঁর পত্নী এল্‌সা তখন আরাগঁরই মতো প্রৌঢ়ত্বের পথে পা বাড়িয়েছেন। চারদিকে যখন হতাশার শূন্যতা আরাগঁ তখনও নতুন করে এল্‌সাকে ভালোবাসতে চান, হারিয়ে যাওয়া প্রেমের গানগুলোকে মনের গুহা থেকে খুঁজে বের করে উদাত্ত স্বরে গাইতে চান :

> 'তাই তো আজ স্মৃতির গুহা থেকে সে গান তুলে নিলাম একি পাওয়া
> এল্‌সা, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমার রৌদ্র তুমি ছায়া।'

তাঁর এই ভালোবাসার ব্যাপ্তিতে এল্‌সা আর ফ্রান্স এক হয়ে গেছে। ফ্রান্স যে তাঁর এল্‌সা, তাঁর প্রেম, তাঁর আনন্দ, তাঁর বেদনা, তাঁর আহত হৃৎপিণ্ড। আর এই প্রেমের গান সার্থক হয়ে উঠতে চায় প্রতিরোধ-আন্দোলনের লক্ষ যোদ্ধার সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের ঐকতানের মধ্যে :

'লক্ষ গলা কাঁপিয়ে ওঠা সুরে প্লাবণ হয়ে ফিরুক চারিধার
জানালাগুলো বন্ধ করে দাও, বৃষ্টি হয়ে বাজুক ঝংকার।'

দখলকারী নাৎসী শক্তির প্রতি ঘৃণার তীব্রতা আরাগঁকে জাতবিদ্বেষী করে তোলেনি। নাৎসী অত্যাচারে জার্মান জনগণও যে পীড়িত তা তিনি জানেন। ফরাসী জনগণের নিগৃহীত অবস্থা দেখে লজ্জিত জার্মানবাসীদের উদ্দেশ্য করে 'সব অশ্রুই লোনা' কবিতায় তিনি বলেন:

'সুপ্তোত্থিত বালকের মতো চমকে উঠলে আজ
চমক হানলো বিজিতের চোখে ভাষাহীন যত কথা?
সান্ত্রী বদল চলছে, বুটের আওয়াজ উঠলো তার
সে আওয়াজ শুনে শিউরে উঠলো রাইনের স্তব্ধতা।'

'ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গাইলো গান,' কবিতাটি মুক্তি-আন্দোলনের শহীদ গাব্রিয়েল পেরীর উদ্দেশ্যে লেখা। 'শীতের গোলাপ' কবিতাটিও প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রথম শহীদের উদ্দেশ্যে রচিত।

বেদনার সমুদ্র মন্থন করে তোলা আরাগঁর হৃদয় নিঙড়ানো আবেদন উল্লাসে ঝলমল করে উঠলো পারী কবিতায়। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি ফরাসী প্রতিরোধ-আন্দোলনের যোদ্ধারা পারী শহরকে জার্মান কবল থেকে মুক্ত করেন। এই মুক্তির অব্যবহিত পরেই পারী কবিতাটি লেখা। শবাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে পারী যেন শীতল শবের মতো নিস্পন্দ ছিলো। মুক্তির ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেলো সেই শবাচ্ছাদন আর অবাক হয়ে কবি দেখলেন রৌদ্রোদ্ভাসিত তাঁর পারীকে, তাঁর প্রিয়াকে:

'আমার রক্ত এমনি করে তো নাচতে পারেনি কেউ
কেউ তো পারেনি মেলাতে আমার অশ্রুহাসির গান
জনতা আমার, বিজয় ভেরীতে রক্তে ছড়ালো ঢেউ
দিগন্ত-ছোঁয়া শবাচ্ছাদন ঝড়ে ঝড়ে খান্ খান্,
ঝড়-খাওয়া পারী, মুক্ত স্বাধীন রৌদ্রে করেছে স্নান।'

আরাগঁ এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উপনীত। এখনও তিনি লিখছেন—শান্তির জন্যে, স্বাধীন সুখী ভবিষ্যতের জন্যে, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে সেও আজ প্রায় দশ বছরের কথা। এতদিন পরে তাঁর যুদ্ধকালীন কবিতাবলীর হয়তো কোনো সামাজিক মূল্য অনেকের কাছে নেই, কিন্তু তার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্টই রয়েছে। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে একদা-দুর্বোধ্য আরাগঁ জনগণের কবি হয়ে উঠলেন, তারই কিছু পরিচয় যদি বাঙালী পাঠকের মনে দেশ কালের গণ্ডী পেরিয়ে সামান্যতম মাধুর্যও পৌঁছে দিতে পারে তাহলেই অনুবাদের শ্রম সার্থক হবে।

ম্যালকম কাউলের 'এই যুদ্ধের কবি' অনুসরণে
দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

জুন ১৯৫৫

কবিতাগুচ্ছ

বিশ বছর পরে

মহাকাল ফের জোয়াল চাপালো লাল বলদের ঘাড়ে
ঢিমে তেতালায় সময় চললো, তবু এলো নিঃসাড়ে
হলুদ পাতায় সোনা-রোদ ঢেলে হৈমন্তিক দিন
জেগে কেঁপে উঠে আবার ঘুমোলো শিউলির আশ্বিন।

কুঁড়ের বাদশা আমরা সবাই স্বপ্নে জড়ানো চোখ
নেই ক্রোধ, নেই ঘৃণার বালাই নেই সুখ নেই শোক
শহরতলীতে মানুষ মরলে খবর মাখি না গায়
সকালের স্মৃতি ধুয়ে মুছে যায় রক্তিম সন্ধ্যায়।

ফাঁকা ঘর ভাঙা ভিটিতে বেড়াই বাস্তুঘুঘুর মতো
চাপা কান্নায় চিৎকার করি বেদনা কোথায় অতো
দিনের বেলায় পিশাচ আমরা অতীতের সংকেত
দূর বিস্মৃত ভালোবাসাময় কোন জীবনের প্রেত।

বিস্মরণের পাতাল হাতড়ে বিশ বছরের পর
পুরোনো স্বভাব খুঁজে পেতে এনে বোঝাই করেছি ঘর
বন্দী বোঝে না কয়েদখানায় শীত গ্রীষ্মের ভেদ
তবুও পাঠায় বহু পুরাতন নিরর্থ সংকেত।

মুখে মুখে আজ বুলি আওড়াই যন্ত্রের মতো প্রাণ
ভুলে গেছি আজ ভাটিয়ালি সুর বাউলের মেঠো গান
মূর্খের মতো হো হো করে হাসি লজ্জা শরম নাই
রেডিওতে শোনা সস্তা গানের পচা সুর ভাঁজি তাই।

কুড়িটা বছর কি করে কাটলো জীবন হলো না চেনা
মাঝ বয়সেই শুধে দিতে হবে জীবনের যত দেনা
সেদিনের মতো কোলের খোকন যুদ্ধে চলেছে আজ
আমাদের সাথে (আহা কচি মুখ !) মেলায় কুচকাওয়াজ।

বুক জুড়ে তবু একটা আশার, একটা ব্যথার ভার,
পাপড়ির মতো কোমল প্রেমের স্বপ্নের সম্ভার,
হিমের ঘোমটা ছিঁড়ে দিলো কোন স্বর্ণতীরের ধার
চিঠি লিখবে যে প্রেয়সী আমায়, আমি দিন গুণি তাই ।

প্রৌঢ়ের প্রেম দিয়েছি তোমায় কিছুই দিইনি আর
দুর্দিন এসে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে স্বপ্নের সংসার
বন্ধুরা তবু বলেছে সেদিন, 'ছোট্টো ওদের নীড়
ওরা যেন দুটি কপোত-কপোতী নেই কূল নেই তীর ।'

বালু সৈকতে নাম মুছে দেয় লবণ ঢেউয়ের নাচ
সেদিনের সেই তরুণ তেমনি হারিয়ে গিয়েছে আজ
হারিয়ে গিয়েছে শ্রবণধারায় চরণ-রেখার প্রায়
তোমার কাছে সে তেমনিই আছে, তেমনিই গান গায় ।

মেঘ বদলায় আকাশে, মাটিতে মানুষও তো বদলায়
দুচোখে তোমার আঙুলের ছোঁয়া কি করে ভুলবো হায়
কোমল ছোঁয়ায় মুছেছো আমার ললাটে রেখার টান
সেদিন আমার রুপালী আলোকে কি করেছে সন্ধান ।

প্রেয়সী আমার, প্রেয়সী আমার, বিষাদ ছড়ায় ঢেউ
আমার জীবন-গোধূলি বেলায় তুমি ছাড়া কেউ নেই
কি করে জানাই কি যে লিখি ছাই লিখেই হারাই খেই
জীবনের খেই, কামনার খেই হারাই,—জানে না কেউ
জানাতে চেয়েছি, 'তোমারেই আমি ভালোবাসি অনিবার'
তুমি কাছে নেই, তাই সেই কথা বিষাদ-সাগরে ঢেউ ।

অনুবাদ / বীরিককল্যাণ চৌধুরী

চিঠির অপেক্ষায়, সন্ধ্যায়

রঙ ঝিলমিল ময়ূরপঙ্খী আকাশ
মুঠো মুঠো করে ছড়ায় একি এ মায়া
ছোটো ট্রাক এলো—এলো যেন পাল তুলে
প্রতিধ্বনিতে ভুললো দুললো মন
অক্ষৌহিনী স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন দেখছে বন
ভৌতিক বনে রুদ্ধ-কণ্ঠ একি গান একি গান
এই আশ্বিনে রক্তিম সন্ধ্যায়।

কেমন করে যে রাত ভোর হয়
কেমন করে যে প্রহর গড়ায় লড়াইয়ের ময়দানে
কুয়াশায় ঢাকা হে পত্রবাহী ট্রাক ;
মেঘদূত তুমি, তুমিই কুটিল বজ্রের হুঙ্কার
বেদনায় ম্লান তুমিই পক্ষবর,
চষা মাঠ ছেড়ে আকাশে ছড়াও ডানা
দূরে দূরান্ত পার হয়ে এসো বলো বলো ওগো বলো
বধূকে আমার দেখেছো ওখানে তুমি।
স্বপ্ন-নিরতা বধূকে আমার বিষাদে মলিন মুখ ?

এই যে সোনালী আশ্বিন
এই দিক দিগন্তে সোনা
নাকি সে আমার বধূর অঙ্গরাখা ?
সে যে কি বলছে আমায়, বাতাস
সে যে কি বলছে আমায় ? একটু থামো
লড়াইয়ের আগে যেমনি দাঁড়াতে তেমনি ক্ষণিক দাঁড়াও।
বাতাস দাঁড়াও।

'কোনো চিঠি নেই', হেঁকে গেলো সার্জেন্ট।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

রূপকথার রাত

হে সূর্য এ কি বিনিদ্র ঘোর রাত
পতিহীন গৃহে কি নীরব নিঃঝুম
ভয়ের দানব প্রোষিতভর্তৃকায়
দুই চোখ হতে ছিঁড়ে খুঁড়ে নেয় ঘুম।

ভয়ের দানোকে কে ছেড়ে দিয়েছে—কে ?
কে কেড়েছে ঘুম বিনিদ্র বনিতার
আলোক নিভিয়ে কে দিলো নিষ্প্রদীপ ?
রূপকথা আজ কেউ তো শোনে না আর।

কাঁটা-প্রান্তরে নাচো হে মায়াবী নাচো
চাইনে চাইনে তোমার প্রেমের দান
প্রণামের চেয়ে বিনত হয়েছে প্রেম
পুবের লড়াইয়ে প্রেমিক দিয়েছে প্রাণ।

তোমার পরশ অঙ্গে পাওয়ার আগে
এ স্বর্গ হতে বিদায় হয়েছে নারী
রুক্ষ হাওয়ায় ঝরে গেছে যার চুমো
হাওয়ায় কি আজ শোনো না রোদন তারই ?

কি যে অসহ্য এ দূরে থাকার জ্বালা
এ যুদ্ধ দিলো পেয়ালায় ভরা বিষ
তোমার তনুতে এ তনুর উত্তাপ
সেদিনও তো ছিলো—ছিলো যে অহর্নিশ।

তোমার দুচোখে ভয়ের কঠিন ছায়া
দেখিনি তো আমি, দিইনি কোনোই দাম
মিলনের ক্ষণে হৃদয় ভাঙানো গান,
হৃদয়কে ছুঁয়ে হয়নি তো উদ্দাম।

কন্দেশ্বরার এ-যেন আর এক রূপ
তোমারই মতোন চুপি চুপি দেখি আজ
প্রৌঢ় দিবস কালো মেঘে ঢাকে মুখ
মধ্যনিশীথে নাচ শুরু করে গাছ।

শোনো শোনো এই নিশায় হৃৎপিণ্ডের ডাক
শূন্য শয়নে অশান্তে খুঁজি, কোথায় কোথায় তুমি
আমি তো ওদের কেউ নই, আমি তোমাকেই চাই আজ
তুমি ছাড়া সব শূন্য আমার এ জীবন মরুভূমি।

আমার এ দেহে রক্তমাংস পরমায় তো নয়
ঝিরিঝিরি স্রোত সাগরের প্রেমে আজও হয় উদ্দাম
এ মরু-জীবন বোনের স্নেহের চেরাপুঞ্জীর মেঘ
আজও চায়, তাই ওদের খাতায় আমি লেখায়নি নাম।

প্রেমিক-যুগল আসবে তাইতো অশথ বিছায় ছায়া
পাতারা হাসবে খুশিতে, তাইতো রৌদ্র ছায়ার নাচ
শিমুলের তুলো উড়বে, তাইতো বাতাসের আনাগোনা
মেঘ থেকে মেঘে, তাইতো ওদের কেউ নই আমি আজ।

ওগো আমি শুধু তোমার, আমি যে ধ্যানে জাগরণে দেখি
উত্তরীয়ের ছিন্ন বসন, দূরে বনান্তগামী
তোমার চরণ-চিহ্ন, তোমার ভূমিশয়নের স্থান।
ঘুমাও ঘুমাও হে ভীরু আমার, এ রাত জাগবো আমি।

শপথ নিলাম, উষার আশায় এখানে জাগবো আজ
এ ভাঙা দুনিয়া কালোয় ঢেকেছে মধ্যযুগের রাত ;
হয়তো সেদিন থাকবো না, তবু ঝড় তো থামবে আর,
আবার আসবে মন্থর পায়ে রূপকাহিনীর রাত।

অনুবাদ ; দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

লাউডস্পীকারের জন্য

প্রেমের কথা বলো আমায়, সাগরে দাও ঢেউ
ছায়াবীথির নিচেও আহা রোদন জাগে বুকে
প্রেমের কথা বলো তোমায়, আমার কাটে কাল
চিঠি লিখেই, দুরাশা আশা দুহাতে দেয় তাল,
পারীর থেকে গহন বনে চিঠি আসুক, আর
বলো না ওগো প্রেমের কথা বলো না ততোকাল।

প্রেমের কথা বলবে তুমি, শ্বেত লঘু নাচ
হাওয়ার মুখে দেবেই ছুঁড়ে কঠিন বিদ্রূপ।
দেখিনি আমি দেখিনি সে-ও এ কি নতুন নাচ
বেহালাগুলো কি সুরে বাজে কবিও শুনে চুপ।
প্রেমের কথা বলবে তুমি কথায় গেঁথে কথা,
রাতের সুরে যখন হলো আকাশ অপরূপ।

প্রেমের কথা বোলো না আর, হৃদয়ে গেলো ডুবে
হৃদয় ভাঙানিয়া আমার গানের যত সুর
প্রেমের কথা বোলো না, বলো বন্ধু কোথায় আজ
কাছেই, নাকি অনেক দূরে, ওগো শহীদ মাস
প্রেমের কথা বোলো না, দেখ উনুনে গন্‌গন্‌
আগুন থেকে হাওয়ায় ওঠে চুমোর মৃদু বাস।

প্রেমের কথা বলবে চলো উপমা দাও তার
প্রাণের সাথে, পাখির সাথে যা খুশি দাও মিল
প্রেমের কথা বলো, এখন পাপ যা কিছু আর।
মানুষগুলো পাগল হয়ে হাওয়ায় হেনে ভয়
পাখি তাড়ায় রিক্ত শাখে, নীরব নীড়ে যার
ছেড়েছে মায়া গিয়েছে উড়ে সুখের গাংচিল।

প্রেমের কথা বলবে বলো, বলেছো বহুবার
প্রেম যে ওগো গানের মতো মেদুর করে মন

মীরজাফরী বিকোনো-মন ভুলেও হায় আর
ভালোবাসার নাম করে না ; আঁধার ঢাকা বন ।

আমরা তবু প্রেমের কথা বলবো যতকাল
সূর্য এসে বসবে পাটে গাইবে পাখি গান
প্রেমের কথা বলবো শুধু, স্বপ্ন উপাদান ;
আমরা হবো স্বর্ণচাঁপা হাওয়ায় দেবো তাল ।

বলবে তুমি আমায় এসে 'কলম রাখো আজ ।'

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

কুড়ি বছর বয়সের ওয়াল্‌সের সুর

বাতাসের জন্যে শুভ, রাত্রির জন্যে শুভ, হিমোগ্লিমার জন্যে শুভ
কুচকাওয়াজ, বুলেট আর কাদার জন্যে শুভ
শুভ লোকগাথার জন্যে, শুভ ক্রুশচিহ্নের অবস্থানের জন্যে
শুভ অনুপস্থিতি আর দীর্ঘ সন্ধ্যার জন্যে। অদ্ভুত মজার
সেই বলনাচের আসর, যেখানে আমি নেচেছিলাম, এবং তরুণেরা,
তোমরাও নাচবে সেই একই অমানবিক অর্কেস্ট্রার স্বরবিন্যাসে
জয়ের জন্যে শুভ, মৌশনগানের জন্যে শুভ, ইঁদুরদের জন্যে শুভ
টাটকা রুটির মতো শুভ, শুভ অত্যন্ত সাদামাঠা স্যালাডের মতো

কিন্তু এখানে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি হওয়া সূর্যটা ওঠে
প্যারির মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায় কুড়ি বছর বয়েসের ওয়াল্‌সের সুর

সকালে একটুখানি ব্রান্ডি আর আক্রমনের আগে
নিদারুণ যন্ত্রণার পক্ষে শুভ
প্রতীক্ষার জন্যে, ঝড়ের জন্যে আর টহলদারীর জন্যে শুভ
ক্যেপনাস্ত্রের লেলিহান অগ্নিশিখার নিচে
রাত্রির এই নিস্তব্ধতার জন্যে শুভ
এগিয়ে চলা যৌবন আর মরচে পড়া হৃদয়ের জন্যে শুভ
ভালোবাসা আর মৃত্যুর জন্যে শুভ, শুভ বিস্মৃত হওয়ার জন্যে
বৃষ্টি আর ছায়া আবৃত করে দিচ্ছে রণাঙ্গনগুলোকে
কিশোর সৈনিকেরা গড়াগড়ি খায় না অন্যকোনো শয্যায়
কিন্তু পরিখাগুলো ইতিমধ্যেই কাটা হয়ে গেছে ওদের পরিমাপে

কুড়ি বছরের পুরনো ওয়াল্‌সের সুর ভেসে আসছে সরাইখানা থেকে
কলোচ্ছ্বাসের মতো আছড়ে পড়ছে পাতালরেলে ঢোকার মুখে

গতকালের সৈনিক-শিক্ষা, উধাও হয়ে যাওয়া যত স্বপ্ন
চোদ্দো পনেরো ষোলো : কান পেতে শোনো। আমাদেরই মতো
ওরা গুন গুন করে গায় নীরস গানের সুর এবং আমাদেরই মতো
বিশ্বাস করে সেইসব পুরনো দিনে, ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন

নিজেদের জীবনের চাইতে বেশি গুরুত্ব দের ছোট্ট একটা মুহূর্তের
উন্মত্ততার, খামখেয়ালীপনা আর আনন্দের
এ পৃথিবীর কতটুকুই বা ওরা জানে ? অত্যন্ত তরুণ বয়েসে
নিতান্ত হেলাফেলায় মরাটাই কি জীবনের একমাত্র অর্থ ?

এটার জন্যে শুভ, ওটার জন্যে শুভ। প্রিয় সাথীরা আমার
রেখে যাচ্ছি জীবনের কুড়িটা বছর। সশস্ত্র বাহিনীর জন্যে।

আঃ, শুরু হলো ওয়াল্‌সের সুর এবং নাচিয়েরা কিনলো
আরবী ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে সেই একই তুচ্ছ স্মারকচিহ্ন
কিন্তু এবারের জন্যে ওরা গাইলো 'মেদিলেঁয়র কন্যা' গানটা
চল্লিশ বছরেই আমি ফুরিয়ে গেছি। ওদের কুড়িটা বছরের খুব কাছেই
এগিয়ে আসছে বুলভার স াঁ-জামেঁন আর রু সাঁ-অনর
কোটের কলারে নিশান-সুসজ্জিত চল্লিশের শ্রেণীর লোকেরা
শুভ শব্দটাকে বহুবার স্বনীল ইংরিজিতে পুনঃরাবৃত্ত হতে শুনেছে
ওদের সঙ্গে আমিও বিশ্বাস করতে চাই যে জীবন উদ্বেলিত

ভুলে যাবো, ভুলে যাবো আমি কুড়ি বছর বয়েসের ওয়াল্‌সের সুর
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ১৯৪০ সালে আমার চল্লিশ বছরের বয়েসটাকে।

অনুবাদ / অসিত সরকার

শহীদ স্পেন

মনে পড়ে যায় স্পেনের হাওয়ায় সেদিন কিসের গান
হৃৎপিন্ডের তালে তালে দিতো রুদ্ধ ঢেউয়ের মিল
সে গান ছড়াতো শিরায়-শিরায় অগ্নিস্রোতের বান
আর বলে যেতো কেন এ অপার আকাশ নীলিম নীল।

সে তো গান নয় ঊর্মিমুখর সাতসাগরের ডাক
মানসযাত্রী হংসকূজন-ছন্দিত সেই গান
শেষ কলি তার চাপা কান্নায় থরো থরো নির্বাক
গান্ধারে তার লবণ ঢেউয়ের প্রতিশোধ সন্ধান।

কি দুঃসময় সূর্য ছিলো না, জাগেনি নীলকমল
বোমার ক্ষুধায় কেঁদেছে বালক, মহামানবের মন
স্বপ্ন দেখেছে শেষ হবে এই অত্যাচারের কাল
তবু তো শুনেছি সে আঁধার রাতে এ গানের গুঞ্জন।

কুশবিদ্ধ সে প্রেমের ঠাকুর স্নিগ্ধ ললাট যাঁর
রক্তিম হলো যে কাঁটার ঘায় সেই সে কাঁটার গান
হাওয়ায় বেজেছে এ গানের সুর, উত্তাল বেদনার
নীরব সাগরে তুফান তুলেছে, শিউরে উঠেছে প্রাণ

গুন্ গুন্ করে ফিরতো সবাই, সাহস করেনি কেউ
মুক্ত গলায় হানতে হাওয়ায় নিষিদ্ধ সেই গান
বসুন্ধরায় আরাব তুলেছে মারী-মড়কের ঢেউ
তবু তো জ্বালালে হে সূর্য-দিন আশায় অসাড় প্রাণ।

আমি যে বৃথাই খুঁজে ফিরি হায় অলকানন্দা সুর
মারণ-প্রহার বসুন্ধরার দুচোখে ঝরায় জল
বাধির এ যুগ—ঊর্মির গান অনেক অনেক দূর
ঝরনার গান শোনে না তো আর উধাও নদীর জল।

কাঁটার কিরীট, রিক্ত শাখায় আবার জনালাও গান
কতদিন হলো সেই গান শনুনে তুফানে পেতেছি বন্ক
কেউ বাকি নেই কম্বনকণ্ঠে কে আর ধরবে তান
স্পেনে পড়ে আছে গায়কের শব শ্যামল বনানী চুপ।

কি যে সাধ হয় নিঃশ্বাস ভরে বিশ্বাস করি আজ
স্পেনের হৃদয়ে মাটির গর্ভে গন্প্ত রয়েছে গান
কোন্ সোনা ভোরে মন্ক্তের কণ্ঠে গর্জে উঠবে বাজ
জয়যাত্রায় পঙ্গন শনুনবে তন্র্যের আহনান।

স্বর্ণ-উষার চেল অঞ্চল মনুছে দিয়ে যাবে কাল
মানবশিশনর ললাট-লেখায় রক্ত-ব্যথার দাগ
মন্ক্ত গলায় জীবনদোলায় সঙ্গীত দেবে তাল
গান ছনুঁড়ে দেবে হাওয়ায় হাওয়ায় কৃষ্ণচন্ড়ার ফাগ।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

ঋতুরাজ

শেল্ট-এর বুকে বাঙ্কার থেকে সুদীর্ঘ চিৎকার
কবোষ্ণ-তনু তন্বী রাতের ঘুম হলো খান খান;
রেডিওতে বেজে উঠলো কি এক পুরনো প্রেমের গান
আহা সে কি সুর, ছুঁয়ে গেলো মন হৃদয়বীণার তার।

স্বপ্ননিরতা তরুণীর পাশে কে যেন কে ছিলো শুয়ে
বাঙ্কার ছাদে, আমার চোখেও স্বপ্নই ছিলো তবে?
কে যেন কোথায় ডাক দিয়ে যায়, 'আবার তো দেখা হবে,'
অস্ফুট স্বরে কে যেন জানায় 'মরে যায় নরওয়ে।'

সীমান্তবাসী মানুষের মনে এ কিসের অভিলাষ
ফল্গুর মতো ছুঁয়ে যেতে চায় বিদেশের কান্তার
এখানেই সুরু ফ্রান্সের সীমা, বিদেশ এখানে শেষ
ভিন্ন নিশান তবু তো আকাশ একটাই,...নেই আর।

আকাশ-নয়না বৈশাখ এলো এই তো সে বৈশাখ
এরই তো আশায় সারাটা বছর বসে কাটিয়েছি কাল
এই তো সে মাস মদের মতোন রক্তে ছড়ায় সুর
তন্বী দিনের ঘোমটা পরায় কৃষ্ণচূড়ার লাল।

তুমি তো এলে না অনঙ্গদেব নবজন্মের পর
কতোকাল ধরে দু'চোখ সয়েছে কারার অন্ধকার
মরণ তোমার মধুর করেছে কোন প্রেয়সীর প্রেম
বিশ্বাস করি সেকথা, এমন ইচ্ছাও নেই আর।

বধির আমরা শুনিনি শুনিনি বসুধার চিৎকার
সারা গায়ে মাটি মুখেও মুখোশ, মাথায় শিরস্ত্রাণ
স্বপ্নমিনার পাহারা দিয়েছি সারাটা শীতের কাল
পিঠ নুয়ে গেছে পিঠের বোঝায়, বর্মে ঢেকেছি প্রাণ।

ভেবে হাসি পায় কে কোথা ঘুমায় কবেক শয্যায়
শিশুদের হাতে খেলার পুতুল, সে যেন আর এক দেশ ;
কানা য়্যালার, দৃষ্টি ছাড়াই সেও তো দিয়েছে কাল
গ্রহে উপগ্রহে কক্ষপথের নির্ভুল নির্দেশ ।

আলো নেই, চোখে আশা নেই, বুকে প্রেম নেই, কিছু নেই
নিষ্প্রাণ প্রেত, বৃথা খুঁজে মরি দিন-বদলের দিন
ঘুরে ফিরে সেই বার বার ধরি পুরোনো কথার খেই
পুরোনো শপথ, পুরোনো বড়াই, নেই সুদ, নেই ঋণ ।

হে মৃত মানব ! কবে ফিরে পাবো জীবনের অধিকার
কোথায় দুয়ার, কোথায় হাওয়ায় গাণ্ডীব টঙ্কার
কোথাও কি নেই ফাগুন হাওয়ায় চুম্বন সৌরভ
কোথাও কি নেই শেকড় ছেঁড়ার ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কার ?

তুমি নেই তবু কেন ফোটে ফুল, প্রেয়সী প্রিয়া আমার
এই ফুল কার সাজাবে অলক, তুমি ছাড়া আর কার ?
তুমি নেই তাই চৈত্র-সন্ধ্যা বৃথাই ছড়ায় ফাগ
ফাল্গুন হাওয়া মনে হয় আজ নরকের চিৎকার ।

ফিরে দাও গান, স্বর্গ আমার, বঁধুকে ফিরিয়ে দাও
বঁধু নেই তাই শূন্য আকাশ, বাতাসেও নেই গান
ফাল্গুন, সে তো গোবি সাহারার ধুধু বালি প্রান্তর
ছায়া ব্যথাময়—এ সূর্যোদয়, অপমান অপমান ।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

সেন্ট—জার্মানী ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী নদী ।
য়্যালার—মধ্যযুগীয় গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ । যৌবনে ইনি অন্ধ হয়ে যান ।

অসমাপ্ত কবিতা

সঙ্গিনীহীন বিহঙ্গ গাইছে গান
কসাইখানায়, কূজন জাগলো তার
যুদ্ধের মাঠে আমরাও ডাকি হায়
ঊষায় উর্বসী প্রেয়সী তুমি কোথায় ?

এখানে আষাঢ় ওড়ায় সবুজ দিন
লাফ দিয়ে ছোটে মেঘশাবকের পাল
দিকদিগন্তে হরিত ধানের ক্ষেত
কোন্ মায়া আঁকে কোন্ দূর অলকায়
ময়ূর ময়ূরী প্রোষিতভর্তৃকায়
কোন্ ছবি আঁকে এ কিসের সঙ্কেত ?

রামধনু বন্ধু ! এ কোন্ ভবিষ্যৎ
সোনা রৌদ্রেও করে না তো ঝলমল
ক্ষত-বিক্ষত বেদনায় দুর্বল
এ কোন্ স্বপ্ন মেঘ হয়ে ছুঁতে চায়
কালরাত্রির আঁধার অতল-তল ।
প্রেয়সী তোমার কম্পিত তনুমন
আমাদের বুকে দ্বিধা বিদীর্ণ প্রাণ
চিমে তেতালার গান গায় গুন্ গুন্
সব ফাল্গুনে একই আগুন জ্বলে
আক্ষেপ চায় আমাদেরও ফাল্গুনে ।

যে অধরে কোনো চুম্বন লাগবে না,
যে অলাত হলো স্ফুলিঙ্গহীন ছাই
যে বাস্তুভিটা নিলামে উঠলো আজ
সূর্য মলিন তাদের এ লজ্জায় ;
অবগুন্ঠনে পূর্বাশা ঢাকে মুখ
ফ্ল্যান্ডার্স-হিম ঢেকে দিলো প্রান্তর
দূরে বহুদূরে আমাদের ফাল্গুনে
আকাশপথে ভোমরার গুন্ গুন্
তুমি পাশে নেই প্রিয়া গো প্রিয়া আমার

তবু কেন আজ হাওয়ায় এ ঝঙ্কার ?
কোন্ প্রেম বলো চির-আনন্দ প্রেম
কোন্ প্রেমে বলো আকণ্ঠ ডুবে কাল
ভেরোনার কোন নীলিমায় নীল শিব
পান করেছিলো কালকূট ভেরোনার
তোমার পায়ে আকাশের নীল মদ
হঠাৎ হাওয়ায় জাগালো আমার গান
ছাপিয়ে উঠলো অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্
আমার গানের স্বচ্ছ রঙিন সুর
পার হতে চায় মৃত্যু গহন বন।

জানি তুমি আছো ভোর ভোর রাতে ভ'য়রোর কাঁপা গান
প্রেয়সী আমার সাহারা আমার, আমার মরূদ্যান।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

ক্লাভাস — এইখানে জার্মানদের হাতে ফরাসীদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে।

লাইলাক আর গোলাপ

মুকুলিত হাওয়ার মাস, আহা, ঋতু বদলের মাস
মেঘেদের চিহ্নবিহীন যে আর জলের বুকে বেঁধানো ছুরি
আমি কোনোদিনও ভুলবো না লাইলাক অথবা সেই গোলাপের গন্ধ
কিংবা বসন্ত যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সেইসব মঞ্জরী

আমি কখনও ভুলবো না সেই করুণ মদির উচ্ছ্বাস
অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা, উল্লসিত জনস্রোত আর সেই সূর্য
ট্রাক বোঝাই অজস্র ভালোবাসা আর বেলজিয়ানদের উপহার
মৌমাছি গুঞ্জরিত সারাটা পথ আর কেঁপে কেঁপে ওঠা বাতাস
যুদ্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে নির্লজ্জ কিছু বিজয়-উল্লাস
রক্তিম চুম্বন জানিয়ে দেয় গাঢ় রক্তপাতের আসন্ন ইঙ্গিত
আর যারা প্রায় মরতে চলেছে ঋজু দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার-চূড়ায়
মাতাল হয়ে ওঠা জনতার পরিয়ে দেওয়া লাইলাক ফুলের মালায়

আমি কখনও ভুলবো না ফ্রান্সের সেইসব পুষ্পিত কানন
ওরা যেন যুগ যুগান্তরেরও অতীত যত আলোকিত পুঁথি
কেমন করে ভুলি সায়াহ্নের ব্যথা, ফিংক্সের কঠিন নীরবতা
আর আমাদের যাত্রার সারাটা পথই ছিলো গোলাপে গোলাপে ছাওয়া
যে ফুল ভুলিয়ে দেয় আগুয়ান সৈনিকদের গোপন ব্যথা
তার ভয়ের ডানায়, যে ভয় বাতাসেরই মতো করুণ আকুতিতে ভরা
এবং ভুলিয়ে দেয় উন্মাদগ্রস্ত সাঁজোয়া, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ
আগ্নেয়াস্ত্র আর উদ্বাস্তুদের করুণ সাজসজ্জা

কিন্তু আমি জানি না কেন স্মৃতির এই ঘূর্ণিঝড়
বার বার আমাকে এনে ফ্যালে এই একই কেন্দ্রে
এই সেন্ট মার্থায়···খুবই সাধারণ···ঘন পত্রপল্লবে ছাওয়া
নরম্যান্ডির নির্জন একটা গ্রাম যেখানে অরণ্য গেছে শেষ হয়ে
এখানে সবকিছুই নিস্তব্ধ, শত্রুরাও বিশ্রাম নেয় রাতে
এবং সদ্য খবর পেলাম পারির পতন ঘটেছে একটু আগে
আমি কখনও ভুলবো না লাইলাক অথবা সেই গোলাপের গন্ধ
কখনও ভুলতে পারি না সেই দ্বৈত প্রেম যা আজও বুকে বাজে

প্রথম দিনের তোড়ায় বাঁধা লাইলাক, ফ্লাণ্ডার্সের লাইলাক
মৃত্যুর ঠোঁট-রাঙানিয়ার অভিষিক্ত ছায়ায় কোমল চিবুক—আর তুমি
নয়নাভিরাম গোলাপগুচ্ছ, অপসরণের তোড়ায় বাঁধা আঁজুরে গোলাপ
বহু দূরে ঘটেযাওয়া তীব্র অগ্নিকাণ্ডের মতো আরক্তিম আভায় উদ্ভাসিত

অনুবাদ / অমিত সরকার

১৪ই জুন, ১৯৪০—প্যারির পতনের পটভূমিতে কবিতাটি রচিত। আরাগঁ তখন সৈন্যবাহিনীতে। যে মাসে ফরাসী সেনাবাহিনীতে জেগেছিলো জয়ের ক্ষীণ আশা। রৌদ্রোজ্জ্বল লাইলাক সেই আশারই দীপ্ত প্রতীক। ফরাসী-বাহিনী তখন চলেছে বেলজিয়াম থেকে লোইর নদীর দিকে, জার্মানদের প্রতি-রোধ-আক্রমণে। সেই উপলক্ষ্যে নাগরিকদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, রীতি অনুযায়ী সৈনিকদের বিদায় জানানোর জন্যে সুন্দরী তরুণীদের আলিঙ্গন-চুম্বন। সৈনিকদের চিবুকে তাদের সেই ঠোঁট-রাঙানিয়ার দাগ যেন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক। তারপর বুকে-ছুরি-বেঁধা ১৪ই জুনের ভয়ঙ্কর সেই দিনে প্যারির পতনের দুঃসংবাদ। প্রিয় ফ্রান্স এবং প্রিয়তমা এলসা—এই দ্বৈত প্রেমের স্মৃতি কবিকে রক্তাক্ত করে তুলেছে।

ভয়ের আতঙ্কের কারুকার্যকরা পরদা

আধুনিক আতঙ্কের অনন্য শিল্পকর্ম, এই দৃশ্যাবলীর
রয়েছে হাঙর আর মায়াবী জলপরী, উড়ুক্কু আর তরোয়াল-মাছ
এবং জেনারি সর্পদানবের মাথার মতো যত পাখি
আকাশের নীলে সাদায় কি কথা লিখে চলেছে ওরা ?
পৃথিবীর ওপর আলতো ভেসে চলা ইস্পাতের পাখিরা
বাতাসকে পাথুরে বাড়িগুলোর সঙ্গে সেলাই করে রাখে,
দীর্ঘ-পদক্ষেপে চলা ধূমকেতুপুচ্ছ পাখিরা
দড়ির খেলা দেখানো দেশলাই কাঠির মতো বিশাল বোলতার ঝাঁক
সুসজ্জিত করে তোলে কাঠগোলাপ সমেত জ্বলন্ত দেওয়ালগুলোকে
কিংবা সূর্যাভিসারী রক্তিম সারসের ঝাঁকটাকে
ক্রেন্ডাসে কারমেজ*, মধ্যরাত্রের গোপন সভায় বসেছে ডাইনিরা
ঝাড়ুর হাতলে মেসার্সমিট তপ্ত নিদাঘেই নামিয়ে আনে
গাঢ় অন্ধকার, নতুন ওয়ালপুরগিসের* রাতই
যাকিছু রহস্যোদ্ঘাটনের সময়। তার উদ্বিগ্নতা আর অশ্রুর
ভারবাহী ট্রেনটাকে নিয়ে আতঙ্ক যখন অতিক্রম করে যায় দিগন্ত
তুমি কি চিনতে পারো সেইসব প্রান্তর, শিকারী পাখিদের ?
গির্জার চূড়ার ঘন্টাগুলো আর কখনও বাজবে না
চাষীদের ঠেলাগাড়িগুলো বিছনার চাদর দিয়ে ঢাকা। শাল
একটা পোষা ভাল্লুক। মৃত মানুষটা জীর্ণ একটা জুতোর মতো
      আছাড়ে পড়লো মাটিতে
বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়িগুলোকে দুহাতে চেপে।
ঠাকুমার আমলের কোনো ঘড়ি
ঘুরে বেড়ানো পশুর পাল, স্তূপীকৃত লাশ, আর্তনাদ
পথের ধারে কারুকার্যকরা ক্রোজের মূর্তি। কোথায় ঘুমোবে তুমি ?
অচেনা মানুষের কাঁধে আঁকড়ে রয়েছে শিশুরা
কোথায় যেন চলেছে ওরা, গোলাবাড়ির সোনা
ঝিকমিক করছে ওদের চুলে। পরিখাগুলোয় গুঁড়িমেরে রয়েছে আতঙ্ক
ঠেলাগাড়ির মধ্যে থেকে একজন মুমূর্ষু মানুষ চাইছে
ঔষধি চা আর হিমেল ঝড়ের বিরুদ্ধে জানাচ্ছে অভিযোগ
বিয়ের পোশাকপরা একজন কুঁজো মহিলা

আগুনের শিখার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে গড়িয়ে আসা একটা পাখির খাঁচা
একটা সেলাইকল। একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমি আর এক পাও
হাঁটতে পারছি না। না, মেরি, আমাকে এখানেই মরতে দাও
নিঃশব্দ পাখার ঝাপটে নেমে আসছে সায়াহ্নকার
মখমলের ব্রিউগেলের• সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এই নরকের ব্রিউগেল।

অনুবাদ : অসিত সরকার

- কারমেস, কোক্কাস শ্রেণীভুক্ত স্ত্রী-পতঙ্গের মৃতদেহ, যা লাল রঞ্জনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- ওয়ালপুর্গিস, জনপ্রিয় জার্মান লোককথা অনুযায়ী ১লা মে সেন্ট ওয়ালপুরগা দিবস, যেদিন রাত্রে ডাইনিরা ঝাড়ুর হাতলে চড়ে তাদের প্রভু শয়তানের সঙ্গে পানভোজের আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আসে। ওয়ালপুরগার মৃত্যু আনুমানিক ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে।
- ব্রিউগেল, ছোট ভাই পিটার ব্রিউগেল নরকের অগ্নিশিখার ছবি আঁকা বেশি পছন্দ করতেন বলে 'নরকের ব্রিউগেল' নামেই পরিচিত ছিলেন আর বড় ভাই ঝাঁ ব্রিউগেল এ পৃথিবী আর স্বর্গের যাকিছু সুন্দর ফুটিয়ে তুলতেন বলে 'মখমলের ব্রিউগেল' নামেই পরিচিত ছিলেন।

পাখা

বোমারু বিমান ডানা মেলে দিলো, উদ্বাস্তুর দল
আবার যখন ফিরলো তখন দারুণ দ্বিপ্রহর
আহা কি ক্লান্তি কপাল চাপড়ে মাটিতে গুঁজলো মুখ
থমকে যখন ফিরলো তখন দারুণ দ্বিপ্রহর
নারীদেহগুলো নুইয়ে দিয়েছে পিঠের বোঝার ভার
মানুষগুলোকে পাগল করেছে বিপদ বাধার ঝড়।

নারীদেহগুলো নুইয়ে দিয়েছে পিঠের বোঝার ভার
শিশুরা কেঁদেছে হারিয়ে পুতুল খেলনা আর
অর্থ কিছুই বোঝেনি শুধুই দেখেছে দুচোখ ভরে
শিশুরা কেঁদেছে হারিয়ে পুতুল রঙিন খেলনা আর
জলে ভেজা ভারি চোখের পাতাকে টান টান করে মেলে
দেখেছে সেদিন ভাঙা দুনিয়াটা বালকের সংসার
আহা জলে ভেজা চোখের পাতাকে টান টান করে খুলে।
রাস্তার মোড়ে রুটিওয়ালার ঐ দোকানটা পুড়ে থাক
চৌরাস্তার মেশিনগানের আওয়াজ উঠলো দুলে।

রাস্তার মোড়ে রুটিওয়ালার ঐ দোকানটা পুড়ে থাক
সৈন্যরা সব ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি যেন গুনছে আর
কর্ণেলটার কিছুই হয়নি এমনিই ওর ভাব
সৈন্যরা সব ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি যেন গুণছে আর
হিসেব করছে কে মরলো আর আঘাত লাগলো কার
স্কুল ঘরটাকে ঘিরে ওঠে এক আর্তির চিৎকার
হিসেব করছে কে মরলো আর আঘাত লাগলো কার
ঘরে যে ওদের প্রণয়িণী আহা কি বলবে ওরা কাল
প্রেয়সী আমার যদি না যেতাম দূরে বিদেশের পার।

ঘরে যে ওদের প্রণয়িনী আহা কি বলবে ওরা কাল
ওদের ছবিই বুকে নিয়ে আজো ছেলেরা কাটায় রাত
মরাল পালায় তবু তো আকাশ থাকবেই চিরকাল
ওদের ছবিই বুকে নিয়ে আজো কতো রাত কাটে কার

কেউ না জানুক জানে সেই কথা স্টেচারের ক্যানভাস
সবার বুকেই আলোকচিত্র স্মিতমুখ বনিতার
কেউ না জানুক জানে সেই কথা স্টেচারের ক্যানভাস
এই ছেলেদের নিয়ে যাবো দূরে এই যে ছেলের দল
রক্তে ওদের লাল হয়ে গেছে দেহের বহির্বাস।

এই ছেলেদের নিয়ে যাবো দূরে এই যে ছেলের দল
কে জানে পুড়িয়ে এত কাঠ-খড় কে জানে কি হবে কাল
সার্জেন্ট, শোনো ততদিনে মরে যাবে এ ছেলের দল
কে জানে পুড়িয়ে এত কাঠ-খড় কে জানে কি হবে কাল
ওরা কি তাহলে তালীবনশ্যাম সেঁয়াতোমে যাবে ফিরে
পথে যেতে যেতে কি দেখবে ওরা কোন সুরে দেবে তাল ?
পারবে কি ওরা তালীবনশ্যাম সেঁয়াতোমে ফিরে যেতে
সাঁজোয়া-বাহিনী ছিন্ন করেছে সাগরে যাওয়ার পথ
দেখবে সেখানে শত্রুসেনানী শহর রয়েছে ঘিরে।

সাঁজোয়া-বাহিনী ছিন্ন করেছে সাগরে যাওয়ার পথ
শুনেছি আমরা এরই মাঝে ওরা আবেভিয়ে নিলো কেড়ে
দূরগত হোক তোমার আমার সকলের যত পাপ
'শুনেছি আমরা এরই মাঝে ওরা আবেভিয়ে নিলো কেড়ে'
পথে যেতে যেতে খবর ছড়ালো কামানবাহীর দল
পেছনে জমাট নাগরিক ভিড়ে খবরটা দিলো ছুঁড়ে
পথে যেতে যেতে খবর ছড়ালো কামানবাহীর দল
আহা কি মলিন চেহারা ওদের ছাইমাখা কঙ্কাল।
এলোমেলো রুখু পিঙ্গল চুল চোখগুলো চঞ্চল।

আহা কি মলিন চেহারা ওদের ছাইমাখা কঙ্কাল
ভিড় ঠেলে ঠুলে সামনে এগোলো কে যেন কে এক লোক
সে খবর শুনে হা হা করে হেসে তুড়ি দিয়ে দিলো তাল
ভিড় ঠেলে ঠুলে সামনে এগোলো কে যেন কে এক লোক
কয়লাখনির খাদের মতোন আঁধার বরণ যার
সে যেন জীবন রামধনুরঙে আঁধারের মতো শোক ;
কয়লাখনির খাদের মতোই আঁধার বরণ তার
জোয়ান আবার ঘরে ফিরে যায় ঘরে ফিরে যায় ফের
হয়তো সেখানে মৌমাছি, নয় ঝিল্লীর ঝঙ্কার।

জোয়ান আবার ঘরে ফিরে যায় ঘরে ফিরে যায় তার
চেঁচিয়ে জানায় 'আসছি আবার কিছুতে মানি না ভয়
বোমার বৃষ্টি হোক সে, হোক সে বজ্রের হুঙ্কার'
চেঁচিয়ে জানায় 'আসছি আবার কিছুতে মেনো না ভয়
বুকে পিঁধে যাক গোটা দুই গুলি একটা না যদি হয়
ঢের ঢের ভালো যেখানে রয়েছো সেখানেই মরে যাওয়া
অজানা অচেনা বিদেশে বিভুঁয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে
ঢের ঢের ভালো শত সংগ্রামে রক্তের স্রোতে নাওয়া।'

বিদেশে বিভুঁয়ে পালানোর চেয়ে ঢের ভালো মরে যাওয়া
আবার ধরেছি ঘরমুখো পথ আবার চলেছি ফিরে
ফাঁকা পেট তবু পূর্ণ হৃদয়ে কি তান হয়েছে গাওয়া
ধরেছি আবার ঘরমুখো পথ চলেছি আবার ফিরে
হাতিয়ার নেই, চোখে জল নেই, নেই নেই কোনো আশা
শুধু ঘুরে হই অধিকার নেই, শাসন রেখেছে ঘিরে
হাতিয়ার নেই, চোখে জল নেই, নেই নেই কোনো আশা
নিরাপদ ঐ প্রাসাদের ওরা—ওরা কি বুঝবে জ্বালা
ওরাই সেদিন পুলিস লেলিয়ে ভেঙেছে সুখের বাসা।

নিরাপদে আছে প্রাসাদের ওরা—ওরা কি বুঝবে জ্বালা
বোমার আগুনে আমাদের ওরা দুহাতে দিয়েছে ঠেলে
বলেছে সেদিন 'এই তো নিয়তি চালারে লড়াই চালা
বোমার নিচেই ফিরে যা কি করে নিয়তি ফেলবি ঠেলে'
'কেন যে খুঁড়বো নিজের কবর রাত্রে মশাল জ্বেলে
চলেছি আমরা তবু বেঁচে আছি বেঁচে আছে আহ্লাদ
আমাদের বৌ ছেলেমেয়ে হয়ে, আবার আসছি ফিরে
ধন্যবাদ তো দেবো না আমরা দিই না ধন্যবাদ।'

রুক্ষ পথের গৌতম ওরা কত না দীর্ঘ রাত
বৌয়ের ছেলের হাত ধরে নিয়ে কখন ধরেছে পথ
রুক্ষ পথের কাঁটায় কাঁকরে রক্তিম পদপাত
দগ্ধ গৃহের তপ্ত উঠানে থামায় চরণ রথ
রুক্ষ পথের গৌতম ওরা কখন ধরেছে পথ
ওরা চলে গেছে আকাশে ফুটেছে দৈত্যের মতো ছায়া
ভয় সইবার ছড়িও ছিলো না বোকায় খ্রিস্টপথ
ওরা চলে গেছে আকাশে ফুটেছে দৈত্যের মতো কায়া
(অগ্নি আলোকে রুদ্ধ আকাশ) আহা কি বিশাল ছায়া !

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

দ্বিতীয় রিচার্ড—চল্লিশ

এ দেশ আমার হালভাঙা এক নাও
বহু পুরোতন নাবিক গিয়েছে ছেড়ে
আমি যেন আজ সেই রাজা অসহায়
বন্ধুরা গেছে ভেঙেছে সুখের হাট
তবু তো সে তার দুঃখের সম্রাট।

ধূর্তামি ছাড়া বেঁচে থাকা আজ দায়
বাতাসও মোছে না আমার অশ্রুপাত
প্রেম; কি আজকে ঘৃণায় ঢাকবো হায়
হারানো মাণিক ফিরে দিতে হবে তাও
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

শীতল শিরায় রক্ত বইবে তবু
হৃদয়ে যদি বা মরণও ফোটায় দাঁত
দুয়ে আর দুয়ে এখন হয় না চার
অশ্বের সাথে ডাকাতরা খেলে পাশা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সকাল সন্ধ্যা দগ্ধ দিন দুপুর
আকাশটা কি যে বিবর্ণ পাণ্ডুর
ফুলের দোকানে ফাল্গুন মরে যায়
উজ্জ্বল দিনের পাখী গো দাও বিদায়
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

বনঝরনার সঙ্গীত ভুলে যাও
লুকাও লুকাও কাকলিমুখর মাঠ
বন্দীশিবিরে বন্দী তোমার গান
কিরাত ব্যাধেরা এখন এদেশে রাজা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সইতেই হয় জীবনে দুঃখ তাপ
ফ্রান্সকে তোদের খান্ খান্ করে কাট
জোন্দার্ক গেছে যেই দিন ভকুলার
সেইদিনও ছিলো পাণ্ডুর ঊষাকাল
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

অনুবাদ / শীর্ষকল্যাণ চৌধুরী

মুক্ত অঞ্চল

হাওয়ায় ছিঁড়লো ব্যথার ঊর্ণজাল
স্তব্ধ হয়ে আসে ভাঙা হৃদয়ের তাল
গনগনে আঁচ ধীরে হয়ে এলো ছাই
মদির গ্রীষ্ম পান করে নিঃশেষ
পোড়ো বাড়িটার দাওয়াটায় দিয়ে ঠেস
এ মাহ ভাদর স্বপ্নেই ভরি তাই।

চাপা কান্নায় একি এ অকস্মাৎ
কুঞ্জছায়ায় চমকে উঠলো রাত
ফিস্ ফিস্ করে ও কার তিরস্কার ?
জাগিও না এ তো জাগার সময় নয়
বিষাদসাগর বুঝি পার হয় হয়
গানের তরীতে আমার ব্যথার ভার।

ক্ষণেক বুঝি বা শুনলো আমার মন
কাঁচ ধানক্ষেতে অশ্বের ঝন্ ঝন্
ফল্গুর মতো রুদ্ধ একি এ তান।
কে দিলো আমার হৃদয়ে হারানো সুর ?
এত সৌরভ-টলোমলো অন্তর
কনকচাঁপাও পায়নিকো সন্ধান।

বেঁধে রেখেছিলো গোপন ব্যথার কান্না
বলে কৌশলে এবার পেয়েছি ছাড়া
আলোক ছায়ায় কাটলো দ্বিধার ঘোর
দেখেছি শুধুই ভাবলেশহীন মন
কোন্ পথ বেয়ে গিয়েছে, আর কখন
জানিনি সোনার আশ্বিন হলো ভোর।

তোমার বাহুতে সুপ্ত ছিলাম মেয়ে
পথের ওপারে কে যেন কে গেলো গেয়ে
গুন্ গুন্ করে প্রাচীন ফরাসী গান
এতদিন পরে পেলাম ব্যথার তল
নগ্ন পায়ের স্পর্শে নিথর জল
টলমল্ করে তুললো গানের তান।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

এল্সা, আমি তোমায় ভালোবাসি

মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়

আহা সে কোন্ বকুল-ঝরা মাস সুরোর মতো জীবন মধুময়
ফাগুন হাওয়া ছড়িয়েছিলো তার ছবির মতো রঙের সঞ্চয়
তোমার চোখে তখন বুঝি ছিলো কৈলাসের তুষার-চূড় ছায়া
সাগরিকার ইশারা হয়তো বা অস্ত আলো আবির রঙে নাওয়া
মূর্খ আমি ভেবেছিলাম মনে তোমায় খুশি করেছি গানে গানে
হঠাৎ খুশি জেগেই মিশে গেলো অন্ধকারে ছায়ার লঘু টানে।

মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

বর্ষ ওগো, বিদায় ওগো বিদায়, গেয়েছিলাম ঝরা পাতার গানে
দ্বীপান্তরে বন্দী তবু ভাবে আসবে ফিরে আবার গৃহপানে
কি বিশ্বাস মুমূর্ষুর বুকে ; জন্ম নেবে নতুন এক দেশ
নৃত্য থামে, পুরাতনের তাল স্মৃতির বুকে নিমেষে নিঃশেষ
আমার চোখে তাকিয়ে দেখ মেয়ে, আমার চোখে তোমার রূপছায়া
আমার বুকে অধীর কলতান শুনবে না কি বধির হলে প্রিয়া ?

মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

একই পথে সূর্য ওঠে আর, একই পথে সূর্য নামে পাটে
এ যেন সেই ভোলা বাউল তার বাঁশের বাঁশি বাজায় একই নাটে
শঙ্কাহীন রোদের দিনগুলো মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে মেয়ে
কেমন করে শহরতলী-দিন উদাস হয়ে প্রহর যেতো বেয়ে ?
কাঁপশবুলো উড়িয়ে কোন পথে জীবন গেলো জানলো না তো কেউ
হঠাৎ একি সন্ধ্যা আসে ঘিরে হৃদয় ভাঙে ব্যথার কালো ঢেউ।

মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

কবে কোথায় মনে কি পড়ে মেয়ে তোমায় লিখে দিয়েছিলাম গান
কি ভালো-লাগা তোমার ধমনীতে বাজিয়েছিলো ইমন-কল্যাণ
সে গান তুমি কোথায় রেখেছিলে, সে গান মৃত স্মৃতির বনে আজ
সে গান তবু ভালো তো লেগেছিলো, সেগান তবু ভুলিয়েছিলো কাজ
তাইতো আজ স্মৃতির গুহা থেকে সে গান তুলে নিলাম, একি গাওয়া
এল্‌সা, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমার রৌদ্র তুমি ছায়া।

মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

একই কড়ি কোমল ছন্দে আজ, একই কলি একই সুরে গায়
বৃথা তো নয় এ গান গাওয়া তাই বাউল পথে গুনগুনিয়ে যায়
মর্মরিত গানের গুঞ্জন মন্ত্র দিলো হাওয়ার কানে তাই
সকল কথা অশ্রু হবে কাল সেদিন আসে সেদিন দূরে নাই
লক্ষ গলা কাঁপিয়ে ওঠা সুর শ্রাবণ হয়ে ঘিরুক চারিধার
জানালাদুটো বন্ধ করে দাও বৃষ্টি হয়ে বাজুক ঝঙ্কার।

অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়
মুঠোয় ভরে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর বয়ে যায়।

অনুবাদ / ঈপ্সিতকল্যাণ চৌধুরী

মে মাসের রাত

পিশাচও যায়নি সে পথে ভুলেও যে পথে গিয়েছি আমি
প্রান্তরে তবু কঠিন কুয়াশা আমাকে ছেড়েছে পথ
মাটির শিয়রে জেগেছিলো শুধু কুমারী তন্বী রাত।
আমরা যখন পেরিয়ে এলাম লা বাসের পর্বত।

ধু ধু মরুভূমি দাউ দাউ করে খামার জ্বলছে বুকে
খানায় গর্তে আগাছাও করে মৌনতা অনুভব
মাথার ওপরে বোমারু বিমান জপের মন্ত্র বলে
মাটিতে ছড়ালো ফুল টুপ্ টুপ্ বোমার মহোৎসব।

ভয়ে সংশয়ে এলোমেলো ছোটে ভ্রষ্ট প্রেতের দল
বহুবার চেনা জনারের ক্ষেতে পাক খেয়ে খেয়ে ঘোরে
আয়াসে চলেছে গৃহদাহ লাল লেলিহান শিখা জ্বলে
দিগন্ত জানে শিখা নয়—ও যে ভয়ের নিশান ওড়ে।

আমি দেখি আজ দু দুটো কঠিন যুদ্ধের সম্ঘাত
এখানে কবর, সমাধি, শ্মশান ; ওখানে পাহাড়, মাঠ
তরুণী রাত্রি অনাথা বোনের হাত ধরে চলে যায়
আমাদের ছায়া বিগত যুগের ছায়ায় মেলালো হাত।

যেখানে পতাকা ওড়ে না, যেখানে ক্রুশে লেখা নেই নাম
সেখানেই ওরা স্বপ্নে ঘুমায়, ঘুমায় মাটির বুকে
কড়ে আঙুলেও দেখায় না কেউ ওদের সমাধি আর
ওরা কি রইবে কাহিনীতে শুধু—সব ঋণ গেছে চুকে ?

ভয়ে আধমরা পিশাচ এসেছে বিশ বছরের পর
আমি আঁকাবাঁকা ভোরের সরণি, আমি যে অনেক' ঘুরে
বহু ঘুরপথে বন্ধুর পথে জেনেছি কোথায় যায়
নামহীন যত সমাধির শব কোথায় কতটা দূরে।

এইতো ক্যাপসা স্মৃতির মূল্য ! অনেক সয়েছে প্রাণ
সব শেষ হলো, বিশ্রাম আজ, কে বলেছো 'আর নয়,'
অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে ? ব্যর্থ শান্তিদূত !
সাদা ক্রস, ঘাস, এইতো মুক্তি অব্যয় অক্ষয়।

মৃতদের দেহে একটু যদিবা স্পন্দন লাগে আজ
মনে হবে তবে মৃত নয় ওরা ঘুমোয় স্বপ্ন সুখে
এ নিশীথে আজ মনে হয় যেন মৃতরা জীবিত আর,
জীবিতরা মৃত, তফাৎ শুধুই শোয়নি মাটির বুকে।

রাত্রি কখনও ছিলো কি এমন অসীম রাত্রিময়
আঁধার মানস কোথায় স্বপ্ন-আলোকের সম্পাত ?
তবুতো কোথাও ফুটেছে বকুল হাওয়ায় গন্ধ বয়
চল্লিশ সাল, আঁধার এ রাত—মে মাসের এক রাত।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

ডানকার্কের রাত

আমরা চলি আজ সকাল হতে সাঁঝ বিরামহীন পা'র অনর্গল
চলার ঘায়ে ছিন্ন হয়ে যায় তন্বী ফ্রান্সের চেলাঞ্চল

সাগর সৈকতে এসেছি কোনোমতে হাজারে লাখে লাখে বাঁধি শিবির
ওপরে শুধু আজ অসীম নীলাকাশ সাগর বাতাসের প্রেম নিবিড়

সাগরে শৈবাল যেমনি ভেসে যায় তেমনি ভেসে যায় মৃতের দল
জটায়ু দেহ যায় পানসী ডিঙা আর ছিন্নপাল কেউ ভগ্নহাল

দিন ও রাতভোর যেখানে মন্থর বাতাসে রি রি করে মড়ার বাস
সেখানে ওঠে আজ একি এ কি আওয়াজ বনে কি দাবানল এনেছে ত্রাস

জীবন মরণের ভগ্ন তোরণ এই আকাশে তোলে তার ছিন্ন হাত
বুকের নিচে সব করি যে অনুভব ছিন্ন হৃদয়ের রক্তপাত

লক্ষ ঘরছাড়া লক্ষ সবহারা লক্ষ মানুষের লাখ হৃদয়
কবে যে আরবার গাইবে বার বার প্রেমের গান বলো কোন সময় ?

প্রেমের ঠাকুর ওগো নীলিমানীল শিব তোমারমতো আমি ব্যথায় নীল
ব্যথার বেদনায় এ তনু মন ছায় তোমার সাথে আজ একি এ মিল

আমার বেদনায় অসহ এই ভার বুঝবে শুধু সেই হতভাগাই
প্রাণের চেয়ে যার প্রাণের বেদনার অধিক দাম দিতে দুঃখ নাই

রাতের কালো পটে যেমন ফুটে ওঠে বীহ কুসুমের লোলিহ প্রাণ
রাগিনী পঞ্চমে তেমনি গেয়ে যাবো এ ব্যথা কামনার দৃপ্ত গান

নিশির ডাক হয়ে রাতের পথ বয়ে হাওয়ায় হেঁকে যাবো তীব্র ডাক
দগ্ধ ছাদ হতে পড়বে রাজপথে নিশিতে পাওয়া লোক রুদ্ধবাক

'ছুরিতে শান দেবে ছুরিতেশান দেবে' কে যেন যেত হেঁকে ভোরবেলায়
তেমনি করে আজ আমিও দেব ডাক—প্রেয়সী প্রিয়া তুমি আজ কোথায়

ডাকবো অবিরাম, 'নয়ন-অভিরাম সে দুটো কালো চোখ কই কোথায়
কপোতী হে আমার কপোতী বেদনার কোথায় গেছ উড়ে কোন বাথায় ?

মরণ যাত্রীর তীব্র আর্তির বিপুল হাহাকার বোমার রুদ্র
মাতাল বেহেডের প্রলাপ জমে ঢের, ছাপিয়ে যাবে সব আমার স্বর

বলবো বার বার, 'সুধায় সুধায় তোমার ও অধর প্রিয়া আমার
আমারে ঢেলে দিতো প্রেমের অমৃত প্রেমকে ফিরে দিতো জীবন তার

আমারে রেখেছো যে তোমার বাহুমাঝে অজেয় দুর্গ যে বাহু তোমার
আমি তো মরবো না মরণ-যন্ত্রণা স্মৃতিকে মুছে নেওয়া অন্ধকার'

এখানে নামে এসে সেনানী সৈনিক, ওদের চোখে চেয়ে ভুলবে কেউ
হারানো ডানকার্ক ওদের বুকে কাল সে কোন্ কামনার তুলেছে ঢেউ ?

জাগর চোখ মেলে মাটিতে দেহ ঢেলে আকাশে শুনেছিলো বোমার গান
কে পারে ভুলে যেতে সেদিন সেই রাতে সে কোন্ বিষ ও করেছে পান ?

প্রতিটি সৈনিক দেহের প্রমাণ এক সমাধি খুঁড়ে নিয়ে গুহার প্রায়
ঘুমায় অচেতন সমাধি ছায়ে যেন ঘুমায় অচেতন ঐ গুহায়

প্রাণের নেই ঋণ ভাবের লেশহীন পাথরে গড়া মুখ অচঞ্চল
ওদের চোখে ঘুম রাত্রি নিঃঝুম শিয়রে জাগে শুধু অমঙ্গল

ভুলেও ফাল্গুনে আসে না এই দেশে এদেশে আসেনাকো ফুলের বাস
এখানে শুয়ে হায় বালুকা-শয্যায় মরণ উন্মুখ এই যে মাস ।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

জঘন্য আবহাওয়া

জঘন্য আবহাওয়া যা খুশি তাই করছে
নিসে থেকে ভাবছে বুঝি প্যারিতে রয়েছে
প্রমিনাদ দ্য আঁগলাকে পরিণত করছে একটা মজার ফাঁদে
সেখানে তুমি দেখতে পাবে ভারি অদ্ভুত একটা দৃশ্য
কালোবাজারীরা ঠান্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে
সম্পূর্ণ নগ্ন মানুষেরা খুঁজছে কোনো রাজা, সমকামী পুরুষ কিংবা
দেহপন্যাদের

পাখির মতো মাথাগুলো ঘুরছে প্রতিটা বাতাসের অনুকূলে
সবকিছুর জন্যেই প্রস্তুত। হৃদয়গুলো তরুপের তাস
বিকিয়ে দেবে বলে পাগলের মতো বাজি রেখে চলেছে
ইচ্ছে করলে তুমি অনায়সেই মেয়েদের কোনো মঠে
কিংবা রঙ্গমঞ্চে যেতে পারো
প্রতিটা মন্তব্যই উচ্চারিত হয় প্রতিধ্বনির মতো
সমুদ্রের রঙ হালকা সবুজ
নেগরেস্কোতে এখন আবার বৃষ্টি ঝরছে
পলেস্তারার চাইতেও বিবর্ণ

জঘন্য আবহাওয়া জানে না সে কি চায়
শ্লেষ্মা-নাক মার্চ ব্যবহার করছে তার রুমাল
বৃষ্টি থামতে না থামতেই আকাশ আবার সেই আগের মতো নীল
যেন হাজার-ফ্রাঁর ঝকঝকে একটা নোট
সদ্যজাত এই ছায়াটা জড়িয়ে থাকে তোমার পায়ে পায়ে
ওটাকে বিদেয় করার জন্যে যাই করো না কেন
তার জন্যে তুমি কোনো মূল্যই পাবে না
বেচারি পিটার সলেমি!

ধার করবে বলে সবখানেই খোঁজো একটা ছায়া
দেশের মাটি আর ঘরের দেওয়ালগুলো থেকে নির্বাসিত
১৯৪১-এর চলমান প্রতীক
তোমার পকেট খালি
জঘন্য আবহাওয়া তার ঘড়িটা বেঁধে দিয়েছে পশুর পেছনের পায়ে
আদৌ হিংসে করে না যখন তার স্ত্রী অন্য কোথাও থাকে
বরং বিশ্বাস করে নেকড়েদের ভয় করার কোনো কারণ নেই
কেননা নেকড়েরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন

জঘন্য আবহাওয়া কুপন নেই বলে রীতিমতো বিষণ্ণ
মেয়েরা মাথায় বনবনের মতো দেখতে টুপি পরে
পুরুষেরা ফুলের পরিবর্তে মেয়েদের শুয়োরের গয়নার হাড় পাঠায়
ফেটে পড়ে আট্টহাসিতে
জঘন্য আবহাওয়া শ্বাস নেওয়ার আগেই
তোমরা প্রিয় বন্ধুরা হয়ে যায় শত্রু কালো হয়ে যায় সাদা
নিষিদ্ধকে করা হয় বৈধ আর সুন্দরকে কুৎসিত।

অনুবাদ / অমিত সরকার

সব অশ্রুই লোনা

ধূসর আকাশে কাচের পরীরা বেঁধেছে ঘর
চাপা কান্নায় ধূসর আকাশ চেপেছে বুক
মনে পড়ে যায় মাইনৎসে কাটানো সে কটা দিন
কালো রাইন আর বিয়োগ-বিধুরা নারীর মুখ।

কখনো দেখবে আঁকাবাঁকা চোরাগলির শেষ
পিঠে ছুরিবেঁধা কোনো ফরাসীর শীতল শব
কখনও ভাববে শান্তিও ছিলো কি নিষ্ঠুর
তছনছ করে ভেঙেছে সুরার মহোৎসব।

আমি যে ওদের স্বচ্ছ আসব করেছি পান
আকণ্ঠ ভরে গিয়েছে ওদের প্রতিজ্ঞায়
নয়নাভিরাম প্রাসাদ গির্জা ভোলাতো মন
বয়স তখন গোটা বিশ কিছু বুঝিনি তাই।

হারানো আশাকে জীবন ফিরিয়ে দিতে
আজ নিতে হয় ভণ্ড মুনির নাম
তোমার এ দেশ নিষিদ্ধ এক প্রেম
পরাজয় আছে সেদিন কি জানতাম ?

আজো মনে পড়ে হৃদয়-দোলানো গান
আজো মনে পড়ে কেটে গেলে আঁধিয়ার
প্রাচীরে দেখেছি লাল অক্ষরে লেখা
অর্থ সেদিন কিছুই বুঝিনি তার।

স্মৃতির উৎস কোথায় কেই বা জানে
বর্তমান যে কোথায় কুটবে মাথা
অতীত কোথায় সঙ্গীত হয়ে যায়
ব্যথা হয়ে যায় পুরোনো হলদে পাতা ?

সুপ্তোত্থিত বালকের মতো চমকে উঠলে আজ
চমক হানলো বিজিতের চোখে ভাষাহীন যত কথা ?
সান্ত্রী বদল চলছে, বুটের আওয়াজ উঠলো তার
সে আওয়াজ শুনে শিউরে উঠলো রাইনের জলধারা।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

মাইনৎস—জার্মান শহর
রাইন—জার্মান নদী

সি

সি-র সেতু আজ পেরিয়ে এলাম যে
সব বেদনার উৎস তো সেখানেই

কি গান শোনায় বহু পুরাতন গাথা
আহত কুমার,—ধুলোয় শুয়েছে সে

শানবাঁধা পথে গোলাপের কথা বলে
ছিন্ন কাঁচুলি,—সে গান কে গায় কে

পাগলা রাজার কেল্লার গান গায়
পরিখায় রাজহংসের কথা বলে

প্রতিটি দিবস সে কোন্ কাননতল
চিরপ্রেমিকার নূপুরেই টলোমল

বৃথা গৌরবগাথার সে কোন্ গান
অন্যের মতো আমি যে করেছি পান

ভাবনা আমার নিয়ে গেলো নিঃশেষ
লোয়ার নদীর ঘূর্ণির ঘোলা টান

আর নিয়ে গেলো গুলিভরা বন্দুক
আঁখিলোর ওগো আঁখিলোর নিলো আর

ফ্রান্স গো আমার দুরবিস্মৃতা ফ্রান্স
সি-র সেতু আজ পেরিয়ে এলাম যে।

অনুবাদ : দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

রোমান যুগ থেকেই ফ্রান্সের আঁজের নগরের নিকটবর্তী লে পঁ-দা সির চারটি 'সিজারসেতু' বহু সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এখানেই খ্রীষ্টপূর্ব ৫১ অব্দে গলবীর দুম্নোকুস্ রোমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হন। আর ঠিক এখানেই প্রায় দুহাজার বছর পরে ১৯৪০ সালে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা ফরাসী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে।

সিংহ-হৃদয় রিচার্ড

ফরাসী দেশেই বন্দীর মতো বাঁচি
বিশাল দুনিয়া সে-ও যেন কারাগার
বিদেশীর পায়ে যদি বা ফুলের হাসি
গুঁড়ায়,—যদি এ ব্যথায় না পাই পার।

প্রতিটি প্রহর তবে কি সকাল সাঁঝ
ঘৃণায় ঢাকবো, কোথায় ইচ্ছা তার
ঘর নেই, কারো হৃদয়েও নেই আজ;
স্বদেশ আমার, আজো কি তুমি আমার।

অধিকার নেই দেখি শালিকের ঝাঁক
ওরাও যে আজ নির্বিঘ্ন গান গায়
স্বপ্নবাবিক লঘু মেঘ দিলো ডাক
অধিকার নেই সেই মেঘ দেখি হায়।

অধিকার নেই হৃদয়ের কথা ঢালি,
বুকভাঙা গান অস্ফুটে গাইবার
অধিকার নেই, সূর্যও আজ কালি
সইতে পারি না এই স্তব্ধতা আর।

আমরা সেনানী, ওরা তো পশুর দল
দুঃখীই জানে কোথায় তাদের ঠাঁই
রাত্রিকে আর কালো কোরে কিবা ফল
বন্দী এখনো সঙ্গীত লিখে যায়।

তটিনীর মতো স্বচ্ছ গানের তান
যুদ্ধের আগে অস্ত্রের মতো তাজা
জেগে উঠবার ডাক দিলো সেই গান
চোখে চোখে দেবে দুঃখরাতের রাজা।

রাখাল, নাবিক, জ্ঞানী বিজ্ঞের দল
কামার-কুমোর, ভবঘুরে লক্ষ্মার
কলমবাজীর সুনিপুণ যাদুকর
হাটে ও বাজারে পণ্য নারীর সার।

যারা গড়ে রোজ কাপড় ও ইস্পাত
টেলিগ্রাফের থামে ওঠা যার কাজ
যে যেখানে আছে বাণিজ্যে ব্যবসায়
খনির শ্রমিক সবাই শুনেবে আজ।

সকল ফরাসী ব্লঁদেল, তারা যে গায়
যে নামেই তাকে করে থাকি আহ্বান
'মুক্তি মুক্তি' জানায় মৃদু আওয়াজ
সিংহ-হৃদয় রিচার্ড পাঠালো গান।

অনুবাদ / দীপিকল্যাণ চৌধুরী

ব্লঁদেল সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের সঙ্গী চারণ কবি। ধর্মযুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রিচার্ডকে গোপনে বন্দী করে এক দুর্গম দুর্গে রাখা হয়। এক প্রাচীন ফরাসী কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে জার্মানীতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ব্লঁদেল সেই দুর্গে রিচার্ডের অস্তিত্ব জানতে পারেন। রিচার্ডের সহায়সৈন্য অবিলম্বেই এসে পৌঁছবে, তা ঘোষণা করার জন্যে দুর্গের জানলার বাইরে থেকে ব্লঁদেল তাঁর এবং রিচার্ড রচিত এক গাথা রিচার্ডকে গেয়ে শোনান।

আমি তোমাদের শুনতে পাচ্ছি

আমি তোমাদের শুনতে পাচ্ছি যারা শিকার হয়েছো তাদের
তোমাদের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল
না তোমাকে ভুলিনি লোহার কারিগর [ত্যাঁবো]
যে যার একটা কথা বললে সারা রাস্তা ফিরে তাকাত
ভুলিনি তোমাকেও যার নামে কুৎসা রটানো হত
চাকাগুলো কাছে এলে যে তার রেললাইন বদলের পরিচ্ছন্ন
দৃষ্টি জীবনের ওপর ফেলত [পিয়ের সেমার]
আমি তোমাকেও ভুলিনি কটাচুল দার্শনিক [পোলিৎজের]
তোমাকেও না যার স্মৃতি বয়েস হওয়ার আগেই সাদা হয়ে গিয়েছিল
বিশ্রামকে অবজ্ঞা করতে বলে [লুসিয়্যাঁ সাঁপে]
তাকেও না যে গেয়েছিল হংস-গীতি
যাকে মনে হয়েছিল এক রাজন্য যে ফিনিসিয়ার মাটি দিয়ে তৈরি
যার চারুতার রহস্য আদিকাল থেকে এ যাবৎ কেউ আর
ধরতে পারেনি [গাব্রিয়েল পেরি]
একদিন কি আমি তোমাদের মতো মরতে পারব
কিন্তু এ সবের মূল্য
শুধু তোমার জন্যে আর আমার জন্যে আমার যুদ্ধের সাথীরা
মাঝপথে লুটিয়ে পড়া আমার সঙ্গীরা

অনুবাদ / অরুণ মিত্র

আয়নার সামনে এলসা

আহা সে আমাদের বেদনামথিত দিনের দ্বিপ্রহর
সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
ও তার সোনালী চুল আঁচড়িয়েছিলো, আর আমার মনে হলো
যেন শান্ত হাতে এক পাবকশিখাকে ও শান্ত করলো
তখন আমাদের ব্যথার যুগের মধ্যদিন।

সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
ও তার উজ্জ্বল সোনালী চুল আঁচড়েছিলো, মনে হলো যেন
ভরসাহীন মনে, আমাদের ব্যথার যুগের মাঝখানে
দীর্ঘ প্রহরগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য ও সোনার বীণা বাজাচ্ছে
আয়নার সামনে বসে সারাটা দিন।

ও তার উজ্জ্বল সোনালী চুল আঁচড়েছিলো, মনে হলো,
যেন তার স্মৃতিকে শহীদ করে দিলো স্বেচ্ছায় ;
সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে বসে
দাহনশেষের অবশিষ্ট ফুল কটিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য
ও মৌন হয়েছিলো, ও ছাড়া অন্য কেউ নীরব থাকতো না।

ও স্বেচ্ছায় শহীদ করে দিলো ওর স্মৃতিকে
তখন আমাদের বিয়োগান্ত সময়ের মধ্যকাল
ওর আঁধার আয়নাটা যেন পৃথিবীর মুখ
ওর চিরুনিটা বহ্নিশিখার মতো রেশমী চুলগুলোকে ভাগ করে দিলো
আর আলোকিত করে দিলো আমার স্মৃতির অন্ধকার গুহা।

সপ্তাহের মাঝে বৃহস্পতিবারের মতো
আমাদের বেদনার মধ্যদিনে
ও তার স্মৃতির মুখোমুখি বসে
কি দেখেছিলো আয়নাতে (কিন্তু বলেনি কিছুই)।

এক এক করে আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের যে অভিনেতারা
মরলো, তাদের আমরা প্রশংসা করি এই অন্ধকার দুনিয়ায়

তাদের নাম আমার বলার প্রয়োজন নেই, তুমি তো জানো
কোন্ স্মৃতি দাউ দাউ করে জ্বলছে, এই মিলিয়ে আসা দিনের চিতায়

আর ওর সোনালী চুলের গুচ্ছে, ও যখন ওইখানে বসে
প্রতিফলিত পাবকশিখাকে নীরবে শান্ত করে চলেছে।

অনুবাদ / বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রাণঘাতী নির্যাতনের মধ্যে গাওয়া কোনো বীরের গাথা

আগামীদিনের গান যে গেয়েছিলো
লৌহশৃঙ্খলে শোনা গেলো তার কণ্ঠস্বর :
'আবারও যদি সইতে হয় এ নির্যাতন
তবু আমি অনুসরণ করবো এই একই পথ।'

রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি দুজন সান্ত্রী
এলো তার কারাকুঠরিতে, ওরা বললো :
'আলো আর জীবন থেকে বঞ্চিত তুমি
কি হবে আর মিছি মিছি প্রতিরোধ করে ?

কেবল একটাই কথা, তার বিনিময়ে তুমি
মুক্তি পাবে, ফিরে পাবে জীবন,
নতজানু হয়ে কেবল উচ্চারণ করবে একটা মাত্র শব্দ
তার বিনিময়ে তুমি আমাদেরই মতো বাঁচতে পারবে।'

আগামীদিনের গান যে গেয়েছিলো
লৌহশৃঙ্খলে শোনা গেলো তার কণ্ঠস্বর :
'আবারও যদি সইতে হয় এ নির্যাতন
তবু আমি অনুসরণ করবো এই একই পথ।'

'কেবল একটা কথা ! তারপরেই তোমার যন্ত্রণার অবসান
সিসেমের গুপ্ত দ্বারের মতো
খুলে যাবে লৌহকপাট, মুক্তি পাবে তুমি
সইতে হবে না আর নির্যাতন।

ছোট্ট একটা কথা, শুধু একটা মিথ্যে
তাহলেই বদলে যাবে তোমার ভাগ্য।
ভাবো, শুধু একবার স্মরণ করে দ্যাখো
তখন কি আশ্চর্য মিষ্টিই না মনে হবে নিশান্তিকা !'

শৃঙ্খলিত যে মানুষটা গান গেয়েছিলো
আগামীদিনের মানুষদের জন্যে বললো :
'আবারও যদি সইতে হয় এ নির্যাতন
তবু আমি অনুসরণ করবো এই একই পথ।'

'কাহিনীটা আমার জানা—মৃত সিংহের চাইতে
জ্যান্তো একটা গাধা অনেক বেশি মূল্যবান।
আমার মনে আছে দরদী রাজা হেনরি বলেছিলেন
প্যারির মূল্য খৃস্টীয় উৎসবেরই মতো দামী—

কিন্তু আমার তা মনে হয় না।' চুলোয় যাক সব।
বন্দীর তখন খুন চেপেছে মাথায়।
বেঁচে থাকার একমাত্র সুযোগ সে দিয়েছে ছুঁড়ে।
মূর্খেরা মৃতের মতোই সমান।

দুঃসহ সেই নির্যাতন যদি সইতে হয় তাকে
আবার কি সে অনুসরণ করবে সেই পথ?
শৃঙ্খলিত মানুষটা গেয়ে উঠলো ফের
'আগামীকালই অনুসরণ করবো সেই পথ।

কেবল ভালোবাসারই জন্যে আমি মরি আর বাঁচি
কিন্তু আমার ফ্রান্স মরবে না কোনোদিনই।
এই যে মরতে চলেছি আমি, সাথীরা আমার
জেনো মরার কারণ সেটাই।'

ধূসর এক নিশান্তিকায় কারারক্ষীরা এসে
জার্মান ভাষায় কি সব যেন বললো।
কেউ একজন তর্জমা করে শোনালো, 'তুমি কি রাজি?'
প্রত্যুত্তরে শোনা গেলো তার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর:

'আবারও যদি সইতে হয় এ নির্যাতন
তবু আমি অনুসরণ করবো এই একই পথ
তোমাদের ভারি বুলেটের বৃষ্টিকেও ছাপিয়ে
শোনা যাবে আমার সেই আগামীদিনের গান।'

খুঁটিতে বাঁধা অবস্থাতেই সে গেয়ে চলেছে মার্সেইএজ
'রক্তরাঙা নিশানগুলো উড়ছে বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।'
তার সেই গানের সুরকে থামিয়ে দেবার জন্যে
চকিতে ছুটে এলো একঝাঁক সীসের গুলি।

তবু তার ঠোঁট থেকে ভেসে এলো
তামাম এ দুনিয়ার মানুষের জন্যে
ফরাসী ভাষায় গাওয়া
মার্সেইএজের সেই অনন্য সুর।

অনুবাদ / অমিত সরকার

শীতের গোলাপ

আমরা যেদিন শূন্য মদের পাত্রের মতো শূন্য
রিক্ততা নিয়ে কারাফুল চেরীশাখায় কি যেন খুঁজলাম
ফাটধরা মাটি বোমাচষা ক্ষেত খামারের মতো চূর্ণ
স্বপ্ন নিভিয়ে, দুই চোখ মরা মানুষের মতো বুজলাম ।

লুঠ-হওয়া গোলা ভাঙা জানলার অপমান সয়ে কাঁদলাম
পদলাঞ্ছিত শস্যের মতো যৌবন হলো শীর্ণ
খাদে পড়ে-যাওয়া ঘোড়ার মতোন যন্ত্রণা বুকে চাপলাম
টুঁটি টেপা গান জনতার চাপা ক্রন্দনে হলো দীর্ণ ।

স্বদেশে যখন সয়েছি নির্বাসন
ভিক্ষা চেয়েছি দরজায় দরজায়
কি করুণ কি যে নিদারুণ লজ্জায়
পিশাচের কাছে আত্মসমর্পণ ।

ক্ষণিক মৃত্যু জয় করে জেগে উঠে
তখনই তো ওরা জেগেছিলো অম্লান
পোষে উঠেছে গোলাপের মতো ফুটে
ওদের ভ্রূকুটি তরোয়াল খরশান ।

ভোর-ভোর আলো রাত করে খান্ খান্
হে অবিশ্বাসী তোমাদের দিলো আশা
যে প্রেমে মানুষ মরণের গায় গান
তোমাদের বুকে দিলো সেই ভালোবাসা ।

যাবে কি সে পথে যে পথে গিয়েছে মাঘ
ভয়ের রাজ্য পার হয়ে ফাল্গুনে
শুনতে কি পাও শুকতারা দেয় ডাক
গোলাপ গন্ধে স্বপ্নের জাল বুনে ?

পূর্বাশাপারে স্বাতীকে যাবে কি ভুলে
গোধূলি-লগ্নে ভুলো না পূর্বাশায়
ভুলো না মরণ মুক্তির বেদীমূলে
হাওয়া দেয় যদি মন-পবনের না'য় ।

ফাল্গুনে যদি পলাশকুঁড়ির ঘুমের ঘোমটা খুলে
লজ্জার রঙে লাল করে দেয় পাংশু কপোল তার
ঘাতকের হাতে কুঠারের কথা তখন কি যাবে ভুলে ?
সময় পাবে কি অতীতের পানে পিছু ফিরে চাইবার ?

ঝরানো রক্ত শান্তি জানে না—অশান্ত সন্তাপ।
ধানের শীষকে সোনা করে দিলো কোন্ রক্তের দান
রক্তিম ঠোঁটে মাটিতে রঙিন আঙুরের চুমার ছাপ
ভুলে যাবে তুমি দ্রাক্ষার বনে তিক্ত স্বাদের ঘ্রাণ ?

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

পারী

যেখানে ঝড়ের রুক্ষ বক্ষে কোমলের রক্তিমা
রাত্রির বুকে যেখানে জমাট ভালোবাসা ওঠে ভরে
বাতাস মদির, সাহসে মেলায় দুর্ভাগ্যের সীমা
ভাঙা শার্সিতে যেখানে এখনো আশা চিক্‌মিক্‌ করে
সেখানেই ভাঙা দেওয়ালের গান হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে ।

আমাদের চির মাতৃভূমির চির উজ্জ্বল আভা
নেভে না কখনো লেলিহ শিখায় জ্বলে ওঠে দাবানলে
পারীর রক্ত জনতার প্রাণ শ্রাবণ মাতানো শোভা
দিকে দিগন্তে ফোটো-ফোটো লাল গোলাপের কুঁড়ি খোলে
চুনির আভায় জনতার প্রাণ গোলাপ উঠেছে জ্বলে ।

এই ধূলিকণা পারী যে আমার ধূলিধূসরিতা প্রিয়া
কি পবিত্রতা পরাজয়জয়ী বঙ্কিম ভুরু ছেয়ে
বজ্রের চেয়ে কঠিন সে মেয়ে আগুন রাঙানো হিয়া
মরণের মুখে পারী যে আমার কি গান গিয়েছে গেয়ে
কি আছে এমন নয়ন ভোলানো আমার পারীর চেয়ে ।

আমার রক্ত এমনি করে তো নাচাতে পারেনি কেউ
কেউ তো পারেনি মেলাতে আমার অশ্রু হাসির গান
জনতা আমার, বিজয় ভেরিতে রক্তে ছড়ালো ঢেউ
দিগন্ত ছোঁয়া শবাচ্ছাদন ঝড়ে ঝড়ে খান্‌ খান্‌
ঝড় খাওয়া পারী মুক্ত স্বাধীন রৌদ্রে করেছে স্নান ।

অনুবাদ / দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

প্যারী

ঝড়ের বুকেও কী যেন ভালো
রাতের আকাশে কী যে অপরূপ ঝলমলালো
বাতাস মাতাল উন্মত্ত হলো দুঃসময়
ভাঙা শার্সিতে ঝিলিকিয়ে ওঠে আশার আলো
চূর্ণ প্রাচীর হতে ওঠে গান আকাশময়।

নেভে না আগুন নবজন্মে এ বহ্নিমান
পোঁয়া দ্যুজুরের সীমান্ত হতে পেঅর লাসেস
জন্মভূমির শাশ্বত জ্যোতি অনির্বাণ
গ্রীষ্মের রাঙা গোলাপবনের সুরভি মাঝে
প্যারীর রক্ত এখানে ওখানে জড়িয়ে আছে।

প্যারীর গর্ভে যেন অনন্ত বিস্ফোরণ
কপালে তাহার পবিত্র ঢেউ চিরোন্নত
বহ্নির চেয়ে বজ্রের চেয়ে কী কম্পন
আমার প্যারী যে তুচ্ছ করেছে বিঘ্ন শত
পারিজাতও নয় সুন্দরী এতো প্যারীর মতো।

হৃদয় আমার কখনো এমন নাচেনি আগে
হাসি অশ্রুতে মেশেনি কখনো এ অনুরাগে
জয়ধ্বনি যে দেশের হাজার কণ্ঠে জাগে
কী বিরাট এক শবাচ্ছাদন গিয়েছে উড়ে
স্বাধীন প্যারী সে মুক্ত প্যারী সে আকাশ জুড়ে।

অনুবাদ / দিনেশ দাস

স্বাধীন হওয়ার দিন

এ কি শোলমাছ নাকি ও কৈ
জেলে দাঁড়ি বাঁধে আইনে নিজে
কবে থেকে বলো তালচড়ুই
তাড়া করে ধরে শিকারী বাজে

কর্তা বইছে ধামাভরা খৈ
কলতলে বৌ বাসন মাজে
কোটরে হুতোম জানাচ্ছে ঐ
সবই যে রে তোর স্বপ্ন, বাজে।

অনুবাদ / বিষ্ণু দে

নিঃসঙ্গ মানুষ

নিঃসঙ্গ মানুষ যেন একসারি সিঁড়ি
যা কোথাও পেঁৗছে দেয় না
আর প্রাসাদের দরজাগুলো
অমানবিক এবং সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত

নিঃসঙ্গ মানুষ যেন বিকৃত বাহু
অসম স্পন্দন আর ক্ষীণ চোখের দৃষ্টি
যার মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই
সে ঘুমোয় বারাঙ্গনাদের সাথে

নিঃসঙ্গ মানুষের আঙুল যেন বাতাসের
যা কেবল ওড়ায় ভস্মরাশি
ধুলো ছাড়া সে আর কোথাও
খুঁজে পায় না কোনো আনন্দ

নিঃসঙ্গ মানুষের কোনো মুখ নেই
বৃষ্টিতে সে আয়নার মতো
তার চোখের জল কেবল
টুপটাপ মাটিতে ঝরে পড়ে

নিঃসঙ্গ মানুষ যেন ভুল ঠিকানা লেখা
বেওয়ারিস কোনো চিঠি
ভালোবাসা ছাড়া কোনো হাতই
যাকে ছিঁড়তে পারে না কখনও

অনুবাদ / অসিত সরকার

হেমন্ত সুর

সুর এক যেন অনন্ত বিস্তার
সুর এক যার কোথাও নেই বিরাম
হেমন্ত সুর রোমান্স একটি যার
কাছে ফাল্গুনে হার মানে অভিরাম
সুর এক সদা অনাদি অন্তরার

তোমার নয়নে দিগন্ত হাহাকার
মূর্খ কে নভোনীলে খোঁজে নীলশেষ
আকাশের সীমা কে না ভাবে কারাগার
প্রেম তো অমিত জানে না মাত্রালেশ
ন্যায়-সঙ্গত—সেই তার স্বাধিকার.

হেমন্তরূপে মখমল হাত তার
সে যে এক গান অক্লান্ত সে গাওয়া
সে গান দেয় যে দোঁহার প্রেমে দোহার
সে যে এক গান গোলাপে গোলাপে ছাওয়া
হৃদয়ে যে তার দিনের রঙের ধার

এ কি যথেষ্ট কাতর-কম্প্র ঠোঁটে
দেহপ্রান্তরে জাগানো ফোটানো সাড়া
জলে তরঙ্গ বৃন্তে যেমন ওঠে
কথায় কি পাবে এই সঙ্গীত ছাড়া
রুদ্ধ হিয়ার দীর্ঘ আশায় ফোটে

সুর এক এ যে এলসো এ মত্ততার
সুর এক যার কোথাও নেই বিরাম
হেমন্ত সুর রোমান্স একটি যার
কাছে ফাল্গুনে হার মানে অভিরাম
সুর এক যার অনন্ত বিস্তার।

অনুবাদ / বিষ্ণু দে

স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনো ভবঘুরে

পরতে পরতে আনন্দ
একটা বীণা এলোপাথাড়ি বাজিয়ে চলেছে সুরটাকে
আনন্দ গুনগুনিয়ে ওঠে সেই সুরে
কেমন করে বলতে পারবো না
ঝিমধরা মাথাগুলো উৎচকিত হাসিতে ফেটে পড়ে
ভালোবাসা আসে তারপরে
ভালোবাসা কার জন্যে
ভালোবাসা আমার জন্যে

ভালোবাসা আমারই জন্যে

অনুবাদ / অমিত্র সরকার

ছিন্ন চারটি প্রেমের কবিতা

১

তোমার দু-বাহুর মাঝে
আমি কাটিয়ে দিয়েছি বাকি অর্ধেকটা জীবন

সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর যখন প্রতিটা জিনিসের নাম
বসিয়ে দিয়েছিলেন আদমের দাঁতের ফাঁকে
তখন থেকেই তোমার নাম প্রতীক্ষা করছিলো আমার জিভে
ঠিক যেমন শীত প্রতীক্ষা করে থাকে গোলাপের

৩

আহা, ঠোঁটদুটো যেন তৃষিত চাতক

৪

সমুদ্রের কথা আমাকে বোলো না
আমার কাছে সারাটা জীবনই
সে তোমার গান গেয়ে শুনিয়েছে
আমার মার কথা আমাকে বোলো না
আমার কাছে সারাটা জীবনই
সে তোমাকে আঁকড়ে রেখেছে

অনুবাদ : অসিত সরকার

তুমি আমাকে রেখে গ্যাছো

তুমি আমাকে রেখে গ্যাছো সবকটা দরজায়
তুমি আমাকে রেখে গ্যাছো প্রতিটা মরুভূমিতে
নিশান্তিকায় আমি তোমাকে খুঁজি   দুপুরে আমি তোমাকে হারাই
আমি যখন আসি তুমি কোথাও নেই
আমি জানি তুমি ছাড়া আমার ঘর হয়ে উঠবে সাহারা
রোববারের ভিড়ে যেখানে তোমার মতো কেউ নেই
দিনটা সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত জাহাজ-ঘাটায় চাইতে আরও নির্জন
সবকিছুই নিশ্চুপ আর তোমার কোনো সাড়াশব্দ নেই

তুমি আমাকে এখানে রেখে গ্যাছো নিথর
তুমি আমাকে রেখে গ্যাছো সবখানে   নিয়ে গ্যাছো
স্বপ্নের হৃদয় থেকে আমার চোখদুটো
তুমি আমাকে রেখে গ্যাছো অসমাপ্ত একটা বাক্যের মতো
দৈবাৎ খুঁজে পাওয়া কোনো বস্তু   একটা চেয়ার
গ্রীষ্মের শেষে কোনো আগন্তুক
কিংবা টানার মধ্যে পাওয়া একটা পোস্টকার্ডের মতো
আমার সারাটা জীবন বিচ্ছিন্ন তোমার থেকে এবং সেদিকে তোমার আদৌ
খেয়াল নেই

তুমি দেখতে পাও না আমার কান্না গভীর দুঃখেও
মুখ ফিরিয়ে নাও
করুণ দীর্ঘশ্বাসেও আমার কোথাও কোনো জায়গা নেই

তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া ছায়াটার জন্যেও
তুমি কখনও এতটুকুও মমতা বোধ করো না

অনুবাদ / অমিত সরকার

নববর্ষের গোলাপ

তুমি কি জানো চাঁদের গোলাপ
তুমি কি জানো সময়ের গোলাপ
একটা ঠিক অন্যটারই মতো
যেন হ্রদের আয়নায় পরস্পরকে দেখা

তুমি কি জানো প্রত্যাখ্যান
আর লবণ দিয়ে গড়া তিক্ততার গোলাপ
যা বৃষ্টির শেষে রামধনুর মতো ফুটে ওঠে
জোয়ারের জলে উত্তাল হয়ে ওঠা সমুদ্রে

স্বপ্নের গোলাপ আর হৃদয়ের গোলাপ
প্রতিযোগিতার গোলাপ আর স্বরলহরীর গোলাপ
নিঃশব্দ ভালোবাসা আর নষ্ট পদচিহ্নের গোলাপ
একই তোড়ায় বাঁধা বাজারে বিকোয়

তুমি কি জানো ভয়ের গোলাপ
তুমি কি জানো রাত্রির গোলাপ
উত্তরই মনে হয় যেন রক্তকরা
যেমন কোনো শব্দ চিত্রিত থাকে ঠোঁটের ফাঁকে
যেমন কোনো ফল বেড়ে ওঠে গাছের শাখায়

প্রতিটা গোলাপ যাদের আমি গান গাই
প্রতিটা গোলাপ যারা আমার পছন্দের
প্রতিটা গোলাপ যারা আমার কল্পনার
বৃথাই আমি তাদের প্রশংসা করি
কেননা এই গোলাপটা যে রয়েছে আমার চোখের সামনে

অনুবাদ / অসিত সরকার

আমার স্বদেশ থেকে একটি কবিতা যা সবুজ নয়

আমার স্বদেশ

যেখানে সিন্দাবাদের পাল কখনও বাতাসে দোলেনি

কেবল স্বপ্নাতুর আবেগে বহন করে চলেছে

তার যত কাল্পনিক নাবিকী কাহিনীর সম্পুট

বীরদের রূপকথা আর গিরিসঙ্কটের ওপারে সেই সূর্যের

যেখানে শেহেরাজাদার রাতগুলোর কোনো একটা নির্দিষ্ট রাতের মধ্যে দিয়ে

সে ঘুরে বেড়ায় না

যেখানে তার ওপর

ভেঙে পড়ে না কোনো নিশান্তিকা

না তার দিকে প্রসারিত শুভ্র সুন্দর বাহুগুলো

আমার স্বদেশ

আলো আর উজ্জ্বল পুষ্পের সারি সারি কবরভূমি

অনুবাদ / অসিত সরকার

আমি তোমাকে কল্পনা করে নেবো একটা গোলাপ

আমার কাছে তুমি বর্ণনারও অতীত কোনো গোলাপ
অন্তত প্রচলিত প্রকাশভঙ্গির আনুষ্ঠানিক কোনো ভাষায়
এমন কি কান্নাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তার যন্ত্রণাটাকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়
আনন্দের নক্ষত্রলোক থেকে ভালোবাসার অতল গহ্বরে
তবু গোলাপকে শুধু শব্দ দিয়ে জাগিয়ে তুললে
গোলাপের কাছে তা অপরিচিতই থেকে যাবে

আমি তোমাকে কল্পনা করে নেবো একটা গোলাপ শ্রদ্ধাবনত আঙুলের
যা রচনা করেছে চক্রনাভি আর পরস্পরে সুসংবদ্ধ
এবং ঝরিয়ে দিয়েছে তাদের পাতাগুলো
আমি তোমাকে কল্পনা করে নেবো বাহু ছাড়া যাদের আর কোনো
শয্যা নেই সেইসব প্রেমিকদের গাড়িবারান্দার নিচের একটা গোলাপ
স্বীকারোক্তি ছাড়া মৃত পাথরের প্রতিমূর্তির হৃদয়ে কোনো গোলাপ
বোমায় বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া কিষাণের ক্ষেতের কোনো গোলাপ
না আলিঙ্গন না অপমান—আমার কাছে এখন যার আর কোনো অর্থ নেই
এমনই হঠাৎ খুঁজে পাওয়া একটা চিঠির
রাঙা নির্বাসের কোনো গোলাপ

যেখান থেকে কেউ ফিরে আসেনি সেই প্রমোদ-ভ্রমণ
ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের দিনে পলাতক কোনো সৈন্যবাহিনী
রুদ্ধকারার সামনে এসে থামা কোনো মায়ের পদশব্দ
জলপাইয়ের ছায়ায় বিশ্রামরত কোনো পুরুষের গানের সুর
কুয়াশাচ্ছন্ন কোনো দেশে বনমোরগের লড়াই
নিজের স্বদেশভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৈনিকের গোলাপ

আমি তোমাকে কল্পনা করে নেবো আমার গোলাপ
ঠিক তত গোলাপ যত ঘুমো রয়েছে সমুদ্রের জলে
শতাব্দীর পর শতাব্দী যত গোলাপ ফুটেছে আকাশের ধুলোয়
যত স্বপন আনাগোনা করেছে একটা শিশুর কল্পনায়

ঠিক তত বেদনাহত একটা আঁতের মধ্যে যতটা আলো ধরা সম্ভব

অনুবাদ / অমিত সরকার

পার্টি আমার স্বদেশকে দিল আমাকে

পার্টি আমার দৃষ্টি, আমার স্মৃতির উন্মোচন
শিশু কোনদিন ভুলবেও না যা, আমি কী রইব ভুলে
এ দেহ তপ্ত ফরাসী, কী লাল জোয়ার রক্তে দোলে,
সে এক সময়, ঘোর কালো রাত ঢেকে নিত স্নায়ুমন
পার্টি আমার দৃষ্টি, আমার স্মৃতির উন্মোচন

পার্টি আমার মহাকাব্যের যুগকে বুঝি ফিরায়
দেখছি যোয়ান চরকায় বসে, রোঁলা ফুঁ দেয় ভেরী
ভেরকর আজ দেখছে বীরের উত্থানে নেই দেরী
স্পষ্ট কথার আওয়াজ যেন বা তরবারি ঠিকরায়
পার্টি আমার মহাকাব্যের যুগকে বুঝি ফিরায়

পার্টি আমার স্বদেশকে দিল আমাকে পুনর্বার
চেতনার ভিত গেঁথে তুলি আমি পাহারায় থাকি জেগে
আজ সবকিছু গান হয়ে বাঁচে আমার গলায় লেগে
ক্রোধ-ভালোবাসা সুখ-যন্ত্রণা এক সুরে বাঁধা তার
পার্টি আমার স্বদেশকে দিল আমাকে পুনর্বার।

অনুবাদ / সিদ্ধেশ্বর সেন

ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না

ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না   বৃথাই
আমি লিখে যাই আমার রক্ত দিয়ে বেহালা দিয়ে ছন্দ দিয়ে
এবং যেহেতু আমরা জানি না রাত্রে কেমন করে কথা কইতে হয়
জলের ওপর আলতো ছুঁয়ে থাকা দাঁড়ের প্রাচীন ভাষায়
কথা কইতে হয় নারী পুরুষের গাঢ় স্বরে
একে অপরের সঙ্গে কথা কইতে হয় পরস্পরে জড়ানো দুটো হাতের মতো
আনন্দের স্খলিত প্রলাপের মতো
চুমু দিতে গিয়ে যে মুখ হারিয়ে ফ্যালে অসংলগ্ন কথাগুলো তার মতো
অবিশ্বাসের গভীর আর্তনাদের মতো
খেঁটিয়ে বিদেয় করা প্রত্যাখ্যানের মতো
আহা সমস্ত শব্দের বাইরে সেই নিখুঁত শব্দ
গানের উত্তুঙ্গতা আর্তনাদের বৃত্তসীমা
এমন একটা সময় আসে যখন সুর পৌঁছোয় অশ্রুত মৃত অঞ্চলে
কানে শোনা যায় না সেই ধ্বনিমাধুরিমা এমন উত্তুঙ্গ যে
ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না   কিছুতেই করবে না   বৃথাই
আমি যত বলি না কেন বসন্ত আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষায়
যতই বলি না কেন আকাশের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দে
সাধারণ জিনিসের একক অর্কেস্ট্রায়
আর জটিল যান্ত্রিক কবিতাপঙক্তির তুচ্ছ গতানুগতিকতায়
বৃথাই আমি বলি নৃশংস অস্ত্রশস্ত্রের কথা
বৃথাই আমি বলি মধ্যবর্তী দেওয়ালগুলোকে ভেঙে ফেলার কথা
যেন বৃথাই আমি বলি জাতীয় অরণ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কথা
বৃথাই আমি বলি যুদ্ধ-ঘোষণার মতো
কার্পাসের আগ্রাসী দীপ্তি থেকে বিচ্ছুরিত নরকের মতো
ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না   ওরা নিজে থেকেই তৈরি করে নিয়েছে
আমার একটা চিত্রকল্প হয়তো ওদের নিজেদেরই কল্পনায়
ওদের অতিরিক্ত পোশাকে ওরা আমাকে সুসজ্জিত করে
ওরা আমাকে নিজেদেরই লোক বলে ধরে নেয় এবং এত দূর পর্যন্ত এগোয়
যে আমার কবিতাও উদ্ধৃত করে
যাতে উদ্দেশ্য সফল হয়

নয়তো তাকে পরিণত করে সন্দের সব গানে
যেন আমি ওদের মূল্যবান কোনো সম্পদ
যখন আমি প্রতীক্ষা করছি একটা সরণী হয়ে উঠবো বলে
আমার নাম থাকবে অভিধানে
আমার নাম থাকবে পাঠ্যবইয়ে
আমার জন্যে কুৎসা-প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

বৃথাই আমি চিৎকার করি আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি
এবং আমি তোমাদের প্রেমিক ছাড়া আর কিছুই নই

অনুবাদ / অমিত সরকার

ব্যাপারটা ঠিক ছায়াছবির মতো ঘটে গেলো। ওরা সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। চার তলায় আমাদের এই ছোট্ট বাসাটার কোনো দোল-দরজা নেই এবং আটজন যদি একসঙ্গে এ রকম গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়, দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের এই সময়টাতে।

আমরা তখন সবে খেতে বসবো। বিজলির খরচ কমানোর জন্যে রাতের খাওয়া-দাওয়াটা একটু আগেভাগেই সেরে নিই। রান্নাঘর থেকে পোলিন চেঁচিয়ে বললো লোকগুলোকে ভাগিয়ে দিতে। নইলে খাবার সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওর কথা শুনে লোকগুলো হো হো করে হেসে উঠলো। সুরুয়া নিয়ে পোলিন ভেতরে প্রবেশ করতেই এমন অবাক হয়ে গেলো যে আর একটু হলে পাত্রটা ওর হাত থেকে পড়ে যেতো। আমাদের ঘরটা খুব বড় বা তেমন সাজানো গোছানো কিছু নয়, তবু তা আমাদের একান্তই আপন। দীর্ঘদিনের পুরনো হলে জিনিসপত্রের ওপর যেমন মায়া পড়ে যায়, এও অনেকটা সেই রকম। আসলে আসবাবের চাইতে আমাদের স্মৃতির সংখ্যাই বেশি।

আটজনের মধ্যে মোটাসোটা লোকটাই দলের পান্ডা। পেল্লাই টুপিটাকে প্রায়ই পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে টাক চুলকাচ্ছে। অন্যজন রোগা লিকলিকে চেহারার, গলদা-চিংড়ির দাঁড়ার মতো লম্বা হাত বাড়িয়ে সবকিছুকে যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে। অন্যরা কাগজে ছাপা ছবির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চোখের নিমেষে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেলো। প্রথমে আমি মোটা লোকটার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাকে নিরস্ত হতে হলো, কেননা মনে হলো ওদের কাছে পরোয়ানা বা ওই ধরনের কোনো কাগজপত্র নিশ্চয়ই আছে। আমার অবস্থা দেখে ওরা পুলকিত হয়ে উঠলো। মনে হলো এখনকার দিনে ওই ধরনের কাগজপত্র বুঝি কিছু লাগে না।

প্রথমেই যে জিনিসটা পোলিনকে ক্ষুব্ধ করে তুললো, তা হলো ওর বিছানার চাদরটা। এক হেঁচকা টানে ওটাকে বিছানা থেকে তুলে দলে-মুচড়ে এমন ভাবে ফেলে দিলো যেন ওটা একটা নোংরা রুমাল।

ইতিমধ্যে একজন খাবারদাবার রাখার নিচু আলমারিটা হাটকাতে শুরু করেছে, অন্যজন পড়েছে জামাকাপড় রাখার আলমারিটাকে নিয়ে। কাগজপত্র চার-দিকে উড়ছে। ভর্তি এক বাকস্ আলপিন ছড়িয়ে ফেলেছে ঘরের মেঝেতে। কুর্সিগুলো ওরা উলটে-পালটে দেখছে, গদির মধ্যে লম্বা-লম্বা ছুঁচ ফুটিয়ে পরীক্ষা করছে। দু-তিনজন বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে শুধু ভিড় বাড়াচ্ছে।

আর কি যে সব অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছে। হাড়-জিরজিরে চেহারার লোকটা যখন পোলিনকে 'দিদিমা' বলে ডাকলো, আমি রাগে ফেটে পড়লাম। 'এই যে, শুনুনে,' বললাম বটে, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দিলো না। নিজেদের কাজে ওরা এমনই মত্ত, যেন সবকিছুর মধ্যেই একটা দারুণ মজা পাচ্ছে।

যে লোকটা আমার জিনিসপত্তর তল্লাস করছিলো, সে আমার টাকাপয়সা রাখার ছোট ব্যাগটা নাড়তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো একগাদা বাজে কাগজের টুকরো, যেগুলো আমার কুঁড়েমির জন্যেই এতদিন ফেলা হয়নি। সেগুলো সম্পর্কে সে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলো এবং চাবির গোছাটা কি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তা জানার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলো। চিঠিপত্র রাখার জন্যে ক্লিনুক-বসানো যে পাত্রটা আমরা গ্রেপর থেকে এনেছিলাম, মোটা লোকটা সেটা তুবে নিয়ে গ্যাসের বিল থেকে শুরু করে আলফেডের চিঠি পর্যন্ত সব চোখ বোলাতে লাগলো। তারপর আলোকচিত্রে যারা যারা রয়েছে তাদের সব পরিচয় জানতে চাইলো।

যুদ্ধের তিন বছর আগে মেঁদতে তোলা ছবিটায় খুড়তুতো ভাই মরিসের পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে আমি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। বেশ লম্বা-চাওড়া চেহারা, চিবুকে একটা আঁচিল। আমার ধারণা ও পিশরেলদের কোনো বন্ধু। ব্যাস, এর বেশি আর কিছু জানি না। সন্দিহান হয়ে মোটকাটা এবার পোলিনকে নিয়ে পড়লো, যাতে আমাদের পরস্পরের কথার মধ্যে কোনো গরমিল খুঁজে বার করতে পারে। যথারীতি, আমার কথার প্রতিবাদে পোলিন বললো, 'পিশরেলদের বন্ধু! এ রকম উদ্ভট ধারণা তোমরা মাথায় এলো কোত্থেকে? ও তো মাদাম কানোর ভালোবাসার লোক। মাদাম কানোকে তোমার মনে আছে, যার মেয়েদের পোশাক তৈরির একটা দোকান ছিলো?'

বোকার মতোই আমি বলে ফেললাম যে মাদাম কানোর বন্ধুর চুল তো সোনালী, আর এর চুল কালো। মাথার চুলের রং নিয়ে তর্কাতর্কি ব্যাপারটায় দেখলাম মোটকাটা রীতিমতো উৎসুক হয়ে উঠেছে।

'এই সামান্য একটা ব্যাপারে আপনারা দুজনে একমত হতে পারছেন না?'

তার টিপ্পনিতে আমি সত্যিই চটে উঠলাম। লোকটা মাদাম কানোর বন্ধু হোক বা না হোক, তাতে ওর কি এসে যায়?

মোটকাটা বললো, 'ঠিক আছে, আপনারা কিছু ভাববেন না, ওটা আমাদের ব্যাপার।' এবং টুপিটা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকার ভান করলো।

ঘরের মধ্যে যারা ভিড় বাড়িয়ে ছিলো, কিছু না করে তারা সঙের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর অসহ্য গরম!

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'লোকে যখন কারুর বাড়িতে ঢোকে তখন সাধারণত মাথা থেকে টুপিটা খুলে নেয়। তাছাড়া ইতিমধ্যেই ঘরটা যেভাবে লণ্ডভণ্ড করেছেন সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

পোলিন চেচাতে শুরু করেছে। ওরা ওর বালিশের পরিষ্কার ওয়াড়গুলো সব খুলে ফেলেছে। যে ভাবে নোংরা হাত লাগিয়েছে, নির্ঘাত ওগুলোকে আবার কাচতে দিতে হবে।
হাড়-জিরজিরেটা বিশ্রীভাবে তাকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললো, 'বুঝলেন মুটকি দিদিমা, চুপচাপ শুধু দেখে যান।'
'ভদ্রভাবে কথা বলুন!' পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে আমি প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দিলো না।
ওদের মধ্যে ছিলো লালচে গোঁফ, বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারার একজন লোক। সে লেগে পড়েছিলো সেলাই কলটাকে পরীক্ষা করার কাজে। কোনো কিছুই বাদ দিচ্ছিলো না। টানাটা খুলে যা কিছু ছিলো মেঝের ওপর সব উপুড় করে দিয়েছে, মাকুটা টেনে বার করেছে, কাটিমগুলো থেকে রেশমী সুতো সব খুলে ফেলেছে। নানান টুকিটাকি জিনিস এতদিন যেগুলো পোলিন সযত্নে জমিয়ে রেখেছিলো, বেঁটে লোকটা সেগুলোর প্রত্যেকটা পরম আগ্রহে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে সেগুলোকে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। একবার এক সঙ্গীর গায়ে লাগায় কিছুটা একাতর্কিও বেঁধে গেলো।
আমি বাধা দিলাম, 'এইযে মশাইরা, শুনছেন ...'
এবার ওরা আর হেসে উঠলো না। বরং দুজনেই আমার দিকে ফিরে সরকার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করলো।
পোলিনের চেঁচামেচির চোটে আমি কোনো জবাবই দিতে পারছিলাম না। ও তখন রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো আমাদের বিয়ের ছবিটা ষণ্ডামার্কা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছিলো। তারপর যখন ঢাকা আলমারির টানা থেকে ছোট ছোট চামচগুলো সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়লো, আমার মুখ দিয়ে তখন আর একটা কথাও সরলো না।
অবশেষে আমি ওদের তাকের ওপর সসম্মানে রাখা মার্শাল পেতাঁর ছবিটা দেখালাম, যেখানে উনি একটা কুকুরকে আদর করছেন (আলফ্রেদের ভাষায় যেটা একটা পারিবারিক ছবি)। কিন্তু এতেও ওরা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হলো না।
বিশ্রী মুখভঙ্গি করে মোটকাটা রূঢ় স্বরে বললো, 'থাক থাক, আমরা জানি কায়দাটা খুবই সহজ। ও রকম ছবি একটা করে সবার বাড়িতেই টাঙানো আছে।'
অন্যেরা সায় দিলো। বোঝা গেলো এ রকম অভিজ্ঞতা ওদের আগেই হয়েছে। পোলিন হাঁফাতে হাঁফাতে জিগেস করলো, 'কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা কি?'
হাড় হিম করে দেওয়ার ভঙ্গিতে মোটকাটা ওর দিকে কটমট করে তাকালো।'

'অভিযোগ করা হচ্ছে না, আপনাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, মাদাম। এবং সেটা আরও খারাপ।'

খারাপ তো বটেই। আমার শালী মিশা অন্ধ হয়ে যাবার সময় ছুঁচের কাজ-করা যে সুন্দর বালিশটা বানিয়ে দিয়েছিলো, হাড়জিরজিরেটা সেটাকে চটকাতে চটকাতে হঠাৎ সউল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি বলেছিলাম আমি ?' সে কি বলে-ছিলো আমি জানি না, শুধু জানি যে সূক্ষ্ম কাজকরা বালিশটাকে ফাল ফাল করে ছিঁড়ে পালকগুলোকে ভেতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগলো। পরে ঘোষণা করলো ভেতরে সে শক্ত মতন কি যেন একটা অনুভব করেছিলো। হয়তো সে অনুভব করেছিলো, কিন্তু সেটাকে সে পায়নি।

পোলিন পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে। হাড় জিরজিরেটার এমনই স্পর্ধা যে গলদা-চিংড়ির দাঁড়া দিয়ে সে পোলিনের মুখটা চেপে ধরেছে। বাধা দেবার চেষ্টা করলে যে কি হতো কে জানে! হাজার হোক, আমি বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ এবং নিজেকে কি ভাবে সংযত রাখতে হয় জানি। আমার দেশের আইন-কানুনও মেনে চলি। তবু মেয়েদের সঙ্গে কেউ যখন অশোভন আচরণ শুরু করে…

'দেখবেন, আবার ঘেমে নেয়ে উঠবেন না যেন।'

লালচে চুল লোকটা ফুট কাটলো। আসলে ঘরের মধ্যে আমার তখন সত্যিই দম বন্ধ হয়ে আসছিলো।

ওদের দুজন টেবিলে বসে সুরুয়া সাঁটাতে শুরু করেছে। গেলাসে আবার মদ ঢেলে নিয়ে মাঝে মাঝে তাতে চুমুকও দিচ্ছে। মোটকাটার সেদিকে দৃষ্টি আক-র্ষণ করায় সে বললো, 'প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করবেন না।'

চেষ্টা করলেও তা পারতাম না, কেননা প্রসঙ্গটা কি আমি তাই-ই জানি না। মনে মনে গবেষণা করার চেষ্টা করলাম ওদের এই হঠাৎ হানার কারণটা কি? হয়তো কোনো বেনামী চিঠি···সত্যি, এখনকার দিনের মানুষগুলো এমন যাচ্ছেতাই···কিন্তু ওই চিঠিটাতেই বা কি এমন থাকা সম্ভব, যার জন্যে···

পোলিন সবে একটা মোড়ায় বসতে যাচ্ছিলো। হাড়-জিরজিরেটার কি যেন সন্দেহ হলো। ওকে ঠেলে সরিয়ে মোড়ার নিচের কাপড়টা ছিঁড়ে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে পরীক্ষা করলো। পোলিন একটা জানলা খুলতে চাইলো, কিন্তু প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও ওরা ওকে জানলাটা খুলতে দিলো না। আমার ধারণা ওরা ভেবেছিলো পোলিন বোধহয় চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতে পারে।

'এবার মশাইরা কি অনুগ্রহ করে বলবেন', শান্ত স্বরেই আমি বললাম, 'কিসের জন্যে আমাদের প্রতি এই সম্মান ?'

'সম্মান! কি বললেন, সম্মান? আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন?'

মেনে নিচ্ছি আমার একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। এই ভদ্রলোকদের আগমন-টাকে ঠিক সম্মান বলা যায় না! 'কিন্তু···'

'কিন্তু কি?' জিজ্ঞেস করে মোটকাটা এমন ভাবে আমার প্রিয় গাঢ় বাদামী

স্তের আরাম-কুসিটায় গা এলিয়ে দিলো, যেন সমস্ত ব্যাপারটায় সে খুবই ক্লান্ত। 'আপনাদের এই সব 'কিন্তু', 'যদি'-র মতো ছেঁদো প্রশ্নে আমার গা জবালা করে। মনে হচ্ছে এবার আপনিই আমাকে জেরা করতে শুরু করবেন! ওহে পুফেফের, দিনে দিনে দুনিয়াটার কি হাল হচ্ছে দেখেছো একবার!'
হাড়-জিরজিরেটা ঘুরে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সে আমার টেবিলঘড়িটা খোলার কাজে ব্যস্ত ছিলো। আমার অমন সুন্দর কারুকর্মা কাঁচের ঘড়িটা, একবার দম দিলেই সেটা টানা তিনমাস চলে। এখন দেখছি এটাকে আবার নতুন করে সারাতে দিতে হবে।
ঘাড় ঘুরিয়ে সে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, বস?'
মোটকাটা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'ভাবছি আমি ভদ্রলোককে জেরা করবো, না ভদ্রলোক আমাকে জেরা করবেন? তোমার কি মনে হয়, হে পুফেফের?'
পুফেফের এমন ভাবে ভ্রু ওঁচালো, যেন সে খুবই বিভ্রান্ত। 'হুঁ, তাই তো ভাবছি...'
'থাক, অনেক দূর গড়িয়েছে, আর না!' স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথাটা বলে মোটকাটা হঠাৎ আমাকেই প্রশ্ন করলো, 'এবার তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো, মালটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'
'কোন্ মাল?' অবাক হয়েই আমি জিগেস করলাম।
শপথ করে বলতে পারি কোন্ মালের কথা সে জানতে চাইছে তার সম্পর্কে আমার সামান্যতমও কোনো ধারণা নেই। সে ধরেই নিয়েছে আমি তার কাছে গোপন করছি এবং সে-কথা সে খোলাখুলিই বললো। তারপর প্রসঙ্গ পালটে সে হঠাৎই প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী লাভালের রাজনীতি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'
আমার ধারণা কি, মনে হয় সে সম্পর্কে চটপট জবাব দেওয়াই উচিত, চিন্তা করার জন্যে সময় নেওয়া মানেই প্রমাণিত হয়ে যাওয়া যে ওঁর রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা তেমন সুবিধের নয়। 'ক্ষমা করবেন,' বিনীত ভাবেই বললাম, 'আপনিই কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গটা তুলেছেন...
লোকটা কাঁধ ঝাঁকালো। 'তার মানে নিজের মত প্রকাশের সাহসটুকু পর্যন্ত আপনার নেই।'
ব্যাখ্যা করে বোঝবার চেষ্টা করলাম যে প্রশ্নের আকস্মিকতায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, কেননা কেউ আমাকে কখনও এ ধরনের প্রশ্ন করেনি।
'এর থেকেই বোঝা যায় কি ধরনের লোকের সঙ্গে আপনি মেলামেশা করেন।'
মোটকাটা এমনভাবে কথাটা বললো, যেন বাজিমাত করে ফেলেছে। হাড়-জিরজিরেটাও মুখে এমন একটা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলো, যা থেকে বোঝা গেলো সেও বসের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

এখানে নিজের সততা প্রমাণ করতে যাওয়াটা নিতান্তই অর্থহীন। তবু আমি বলতে চাইছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী লাভালের রাজনীতি সম্পর্কে কখনও কিছু ভাবিনি, ঠিক যেমন ভাবিনি অন্যকোনো প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি সম্পর্কে। তার জন্যে অন্যলোক আছে, আমি নয়। যদি কোনো লোককে সরকারের প্রধান হিসেবে বসানো হয়, তাহলে তার স্বপক্ষে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে। যেহেতু সেই যুক্তিটা কি আমি জানি না, তখন কেমন করে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা থাকা সম্ভব, আপনিই বলুন? তাছাড়া উনি যে রাজনীতিই করুণ না কেন, ওঁকে তো ওখানে বসানোই হয়েছে ওঁর রাজনীতি ঠিক মতো পালন করা হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে। সুতরাং ...অবশ্য, এসব কথা আমি মোটকাটাকে আদৌ বলিনি। বললে সে শুনতো না। আমার তো মনে হয় শুধুমাত্র নিজের কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দ পাবার জন্যেই সে আমাকে প্রশ্ন করেছিলো।

ইতিমধ্যে পোলিস আর আমার জামাকাপড় সব মেঝেতে লোটাতে শুরু করেছে। পালকে গোঁফ, বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার লোকটা একটা কুর্সির ওপর ওঠে আলমারির মাথায় রাখা বাকসগুলো হাঁটকাচ্ছে, সেখান থেকে টেনে টেনে বার করছে পুরনো কৃত্রিম ফুল, একটা কালো বহির্বাস, যেটা পরে আলফেদ ছোটবেলায় স্কুলে যেতো, এবং নানা ধরনের আজে বাজে জিনিস। আহা, ঘরটার যা চেহারা হয়েছে! টেবিলের লোকদুটো সুরুয়ার পাত্র শেষ করার পর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'মন্দ হলো না, কিন্তু দ্বিতীয় বারের খাবারটা কখন শুরু হচ্ছে?'

এবং অট্টহাসির ধুম পড়ে গেলো। হাসির দমক থিতিয়ে আসার পর মোটকাটা তার টুপিটাকে চোখের কোল পর্যন্ত নামিয়ে আনলো, তারপর গম্ভীর গলায় বললো, 'তাহলে মনে হচ্ছে আপনারা বিদেশী বেতারকেন্দ্র শোনেন?'

এই তো, আগেই বলছিলাম না - কোনো বেনামী চিঠি; এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না!

'কিন্তু আমি তো জাতীয় বেতারই শুনি না', সরল বিশ্বাসেই বললাম।

'ওঃ আপনি তাহলে জাতীয় বেতারকেন্দ্রও শোনেন না? শুনলে তো হে পুফেফের! আমাদের বন্ধুর এমনই ঔদ্ধত্য যে সদম্ভেই ঘোষণা করছেন উনি জাতীয় বেতারকেন্দ্রও শোনেন না।'

'কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু নেই। এবার দয়া করে বলবেন কি, কেন আপনি আমাদের জাতীয় বেতারকেন্দ্র না শুনে বিদেশী বেতারকেন্দ্র শোনেন? আপনার কি মনে হয় বিদেশী প্রচারতরঙ্গ অনেক বেশি আগ্রহব্যাঞ্জক? হয়তো প্রচুর তথ্য থাকে, আর তার পরিবেশনাও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক? সত্যিই, আপনার বুকের পাটা আছে বটে!'

'কিন্তু কি দিয়ে শুনবো বলে আপনি আশা করেন ?' অবশেষে কোনো রকমে বলার সুযোগ পেলাম।

'কি দিয়ে শুনবেন ? ভাঁড়ামি করার চেষ্টা করবেন না ! উনি আমাকে জিগেস করছেন কি দিয়ে শুনবেন ? গবেট আর কাকে বলে। আশা করি নিশ্চয়ই আমার পাছা দিয়ে নয়, শুনবেন আপনার বেতারযন্ত্র দিয়ে।'

'কিন্তু আমার তো পাছা নেই।'

হঠাৎই আমার মুখ ফসকে কথাগুলো বেরিয়ে গেলো। আসলে বলতে চেয়েছিলাম আমার তো বেতারযন্ত্র নেই। এতে ওরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

'বাঃ, বুড়ো ভামের রসিকতা হচ্ছে ? যদি কথাটা সত্যি বলে ধরেই নিই এবং পরীক্ষা করে দেখি আপনার পাছা আছে কিনা, তখন কেমন লাগবে ?'

লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠলাম এবং যথাসাধ্য অনুতাপ জানালাম। কিন্তু ওরা আমাকে এমন বিহ্বল করে দিলো যে কি বলছি আমি নিজেই জানি না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম যে আমার যখন বেতারযন্ত্র নেই, তখন আমি জাতীয় প্রচারতরঙ্গ শুনবো কেমন করে।

'অবশ্যই, আপনার যদি কোনো বেতারযন্ত্র না থাকে…সেইটিই তো দেখতে হবে। কিন্তু আপনার যদি কোনো বেতারযন্ত্র নাই থাকে তাহলে বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনেন কেমন করে ?'

'ঠিক এই কথাটাই তো আমি আপনাকে জিগেস করছি।'

'আপনি আমাকে জিগেস করছেন ! শোনো হে প্রফেসর, উনি আমাকে জিগেস করছেন ! দিনে দিনে পৃথিবীর হাল হোলোটা কি ! কে কাকে জিগেস করছে ? শুনুন, ঠিকভাবে জবাব দেবার চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে জিগেস করছি বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনেন কি ভাবে ?'

'কিন্তু আমি তো শুনি না।'

মোটকাটা হঠাৎ শিস দিয়ে উঠলো। 'আপনি কি জোর করে সে কথা বলতে পারেন ? একেই তো অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে ফন্দিটা মাথা থেকে বার করলেন। এখন শুনি না বললে চলবে ? ও কথা সবাই বলে। আপনি বরং আর একটু কল্পনা শক্তি খাটাতে পারতেন।'

'আমার কল্পনার কোনো দরকার নেই।'

'সব সময়েই থাকে ! বিশেষ করে আপনি নিজেকে যে অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছেন।'

'কোন্ অবস্থার মধ্যে ?'

'এই কথাটা আপনার মাথার কিছুতেই ঢুকছে কেন যে জেরা আমিই আপনাকে করছি ? এই যে মাদাম, আপনি আসুন।'

প্রফেসর পোলিনকে আমার পাশে ঠেলে দিলো। বাবা কিছু করছিলো না, ঝাড়বাতির মতো সারা ঘর জুড়ে কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। আমি

পোলিনকে বলতে চাইলাম উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, এমনটা ঘটেছে শুধু বেনামী একটা চিঠির জন্যেই। কিন্তু পুফেফের তার চিংড়ির দাঁড়ার মতো লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলো এবং দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললো, 'উঁহু, নিজেদের মধ্যে ওসব সলাপরামর্শ করা চলবে না।'

এমন সময় লাল চুলওয়ালাটা, এতক্ষণ যে পরদাগুলোকে নিয়ে টানাটানি করছিলো, একটাকে আলগা করে ফেলতেই সেটা দলামোচড়া হয়ে পড়লো মাটিতে। সত্যি, খুবই করুণ অবস্থা।

জাতীয় প্রচারতরঙ্গ, বিদেশী প্রচারতরঙ্গ সম্পর্কে মোটকাটা এখন আবার পোলিনকে জ্বালাতে শুরু করেছে। পোলিন যখন দাবি করে বললো যে আমাদের কোনো বেতারযন্ত্র নেই, মোটকাটা তখন খেঁকিয়ে উঠলো, 'আপনিও এখন ওই কথা বলছেন, যেহেতু আপনি আপনার স্বামীকে ওই কথাটা বলতে শুনেছেন।'

আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের পঁয়ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এই রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটলো, কেননা ও আমার কথা কোনোদিনই কানে নেয় না।

চড়া গলায় পোলিন বললো, 'আপনারা তো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কোনো বেতারযন্ত্র নেই।'

লালচে ঘাড়ের ওপর টুপিটা পিছলে আসতেই সামনের টাকটা বেরিয়ে পড়লো। ডান হাতের তর্জনী নেড়ে মোটকাটা বললো, 'একটু যুক্তি দিয়ে কথা বলুন, মাদাম। যে জিনিসটা এখানে নেই, তা আমি কেমন করে দেখবো বলে আপনি আশা করেন? মহিলাদের নিয়ে এই হয়েছে এক ঝামেলা। বুঝলে হে পুফেফের মেয়েদের কাছ থেকে দুটো জিনিস কখনও আশা কোরো না—যুক্তি আর সময়।'

'বিশেষ করে ঘড়িটা যখন আপনারা ভেঙে রেখেছেন।'

কথাটা সত্যি কিন্তু পোলিনের দুঃসাহসে আমি শিউরে উঠলাম, মনে মনে প্রশংসাও করলাম। পঁয়ত্রিশটা বছর ধরে আমি ওর প্রশংসাই করে এসেছি আর পঁয়ত্রিশটা বছর ধরে ও-ও আমাকে সমানে খুঁচিয়ে এসেছে।

'সাবধানে কথা বলুন, মাদাম। ঘড়িটা ভেঙে রেখেছি! দুম করে বলে ফেললেই হলো...'

'দুম করে তো করেও ফেলেছেন!'

'কিন্তু আপনাকে তো সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমরা কেমন করে জানবো ঘড়িটা চলছিলো কি চলছিলো না? আপনারা হয়তো ওটার মধ্যে প্রচারপত্রও লুকিয়ে রাখতে পারেন।'।

'কেমন করে ওটার মধ্যে লুকিয়ে রাখবো যখন কাঁচের ওপর থেকেই ভেতরের

সবকিছু দেখা যায় ?'

'চতুর, সত্যি আপনি খুবই চতুর, মাদাম। এমন সঙ্গত মন্তব্য আমরা ঠিক আপনার কাছ থেকে আশা করিনি।'

পোলিন দপ করে জ্বলে উঠলো, কেননা ও ভেবেছিলো মোটকাটা বোধহয় বলেছে ওর মন্তব্য 'অসঙ্গত'। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে আমি পোলিনকে বোঝা-নোর চেষ্টা করলাম যে দোষটা ওরই হয়েছে, যদিও দোষারোপ করার মতো কোনো অন্যায় আমরা করিনি। তখন পোলিনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো আমার ওপর। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হলো না।

'যাক, এবার তাহলে আবার বিদেশী প্রচারতরঙ্গ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।' মোটকাটা বেশ খুশির সুরেই বললো। 'আপনারা দাবী করছেন যে বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনেন না, যেহেতু আপনাদের কোনো বেতারযন্ত্রই নেই।'

কথাটা আমার কাছে জলের মতো স্বচ্ছ মনে হলো, কিন্তু মোটকাটার কাছে নয়। 'কেউ বললো, আমার রেডিও নেই এবং ভাবলো তাতেই তার সব বলা হয়ে গেলো, তা তো আর হয় না···'

আরাম-কেদারাটাকে টেনে এনে দু উরুর ওপর হাত রেখে সে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। এখন লক্ষ্য করলাম তার বাঁ কব্জিতে বাঁধা রয়েছে একটা সোনার শিকলি।

'আপনারা কি আমার কাছে প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনাদের কোনো বেতারযন্ত্র নেই ?'

'আপনি নিজেই দেখুন না।'

'প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার নয়, আপনাদের।' প্রথমে আমার দিকে, পরে পোলিনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সে গম্ভীর গলায় বললো। 'আপনাদের যে বেতারযন্ত্র নেই, তা যদি আমাকে প্রমাণ করতে হয়, বাঃ, তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা! আপনাদের বেতারযন্ত্র আছে কি না তা আমি কেমন করে জানবো ? আপনারা বলছেন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা কি কোনো যুক্তি হলো ? প্রথমত, আমি এখানের সব কিছু এখনও দেখিইনি···'

লন্ডভন্ড হয়ে থাকা ঘরটার ওপর সে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর মৃদু হেসে বললো, 'আমার লোকজন শুধু ওপর-ওপর খুঁজে দেখেছে। রান্নাঘরে কি কিছু পেয়েছো, প্যাতিপোয়'া ?'

প্যাতিপোয়'া আর অন্যজন, একটু আগেই যারা সুরুয়াটা সাবাড় করেছে, এতক্ষণ তারা রান্নাঘরের দেরাজগুলো সব হাঁটকাচ্ছিলো, এবার দুজনেই এক-সঙ্গে জবাব দিলো, 'না, বস।' তখনও তাদের মুখ ভর্তি। কি এমন খাবার জিনিস থাকতে পারে, যা তারা মুখে পুরেছে, আমি তো ভেবেই পেলাম না। তবে পোলিন সব সময় খাবার জিনিস আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে এবং কি ভাবে যে ও ওইসব জিনিস জোগাড় করে, তা ও-ই জানে।

'কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হলো ?' সউৎসাহেই মোটকাটা বলে চললো, 'আপনাদের রেডিওটা হয়তো অন্য কোথাও আছে, সারাতে দিয়েছেন। আগে থেকেই টের পেয়ে হয়তো কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া আমরা যখন এলাম, আমাদের দেখে আপনারা কিন্তু একটুও অবাক হননি। আপনাদের জবাব আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন।'

'দিব্যি করে বলছি···'

'দিব্যি করবেন না। ওটা ভালো নয়। পরে এর জন্যে সব সময়েই অনুতাপ করতে হয়। বাপু, এখন স্বীকার করে ফেলুন যে আপনারা বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনেন। তাতে আমাদের সময় নষ্ট হবে না, আপনাদেরও না।'

হঠাৎ সে যেন অন্তরঙ্গ আর দিল-দরিয়া মেজাজের মানুষ হয়ে উঠলো।

'ঘরোয়া ভাবে বলতে পারি, বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনাটা এমন একটা কিছু মারাত্মক অপরাধ নয়। সবাই শোনে। আমরাও তা ভালো করে জানি। এবং কারণটাও যুক্তিসংগত। আমাদের চাইতে বিদেশী প্রচারতরঙ্গ অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক, সুপরিবেশিত এবং উৎসাহব্যঞ্জক।

আমি কিন্তু একই গোঁ ধরে রইলাম। 'এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, যেহেতু আমি আমাদের জাতীয় বেতারই শুনি না।'

থামিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে সে বললো, 'নিজেদের মধ্যে অহেতুক কথা কাটাকাটি করে কি লাভ ? দীর্ঘ স্থায়ী এই যুদ্ধে সবাই যে হাঁফিয়ে উঠেছে, সেটা আমি বুঝতে পারি। হয়তো কোনো দিন, হঠাৎই, রেডিও চালাতে গিয়ে আপনি···'

'কিন্তু আমার তো কোনো রেডিওই নেই !'

'সারাক্ষণ আমাকে এভাবে বাধা দেবেন না। তাছাড়া এটা শোভনও নয়। হাঁ, যে কথা বলছিলাম, কোনো একদিন, হঠাৎই, রেডিওর সামনে বসে চালাতে গিয়ে দেখলেন ভালো শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু আপনি আরো ভালো, আরো পরিষ্কার শুনতে চান। আজেবাজে কোনো মতলব নিয়ে নয়, এমনিই খেলাচ্ছলে। শুধু মাত্র বিদেশী প্রচারতরঙ্গ শোনার জন্যে কেউ ষড়যন্ত্রকারী হয়ে যেতে পারে না। আর তাই যদি হয়, তাহলে তো বলতে হবে সারা ফ্রান্সই ষড়যন্ত্রকারীতে ভরা। অবশ্য একদিক থেকে কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেটা এমন মারাত্মক কোনো ব্যাপারও নয়। বিদেশী প্রচারতরঙ্গ সবাই একটু-আধটু শোনে। বাজে কোনো মতলব নিয়ে যে শোনে তাও নয়। তাহলে আপনি স্বীকার করছেন ?'

আমি মাথা নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মোটকাটার সুর গেলো বদলে। শাসানির ভঙ্গিতে বললো, 'সত্যকে আপনি অস্বীকার করতে চাইছেন ? বেশ। আমরা যে কদ্দুর যেতে পারি সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই। প্রধানমন্ত্রী লাভাল সম্পর্কে আপনি সন্দিগ্ধ ভাষায় যেসব মন্তব্য করেছেন···'

'শুনুন…'

'আমি কিছু শুনবো না। যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মতো লোকের জন্যেই আজ দেশটার এই হাল হয়েছে। বহু লোকই দেখছি প্রধান-মন্ত্রী লাভালের বিরুদ্ধে বলছে। এটা একটা টেস্ট। টেস্ট কি আপনি হয়তো ঠিক জানেন না। পুফেফের, টেস্ট কি উনি জানেন না!'

ক্লান্ত এবং আশাহত ভঙ্গিতে সে কাঁধ ঝাঁকালো। টেস্ট কি জানা থাকলেও তাকে বোঝানোর অবকাশ আমি পেতাম না। এখন সে পুফেফেরের উদ্দেশ্যেই বলে চলেছে, 'বুঝলে হে পুফেফের, আমার মতো সুদীর্ঘকাল এই পেশায় থাকলে, নানান ধরনের লোক ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক সময়ে দেখবে তুমিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছো। বুদ্ধিমান থেকে শুরু করে মাথামোটা—কত ধরনের যে লোক সব রয়েছে। তোমাকে সবসময় তাদের স্তরেই নিজেকে নামিয়ে আনতে হবে, তাদের বোধগম্য সব শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তাদের শব্দ ভাণ্ডারের দৈন্যতা যে কি ভীষণ, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, পুফেফের! প্রাঞ্জলতা এবং সরলতার আদর্শস্বরূপ যে ভাষা, সেই ফরাসী ভাষারই যখন এই দৈন্যদশা, তখন তাদের কাছে এর চাইতে বেশি তুমি আর কিই বা আশা করতে পারো? অথচ জার্মান ভাষাটার কথা একবার ভেবে দ্যাখো! এই তো সেদিন সেনাবাহিনীর এক অফিসার আমাকে বলছিলেন ওদের জার্মান ভাষায় সত্তর অক্ষরেরও এক একটা শব্দ আছে। কল্পনা করে দ্যাখো একবার! অথচ এই নির্বোধগুলো চার অক্ষরের অতি সাধারণ ছোট্ট একটা ফরাসী শব্দ নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ সে এমনভাবে থমকে গেলো যেন কোনো দ্বিধার মধ্যে পড়েছে।

'চারটে অক্ষরই তো, পুফেফের? নাঃ, আমার কোনো ভুল হয়নি! কিন্তু আশা করেছিলাম তুমি অন্ততঃ কোনো মন্তব্য করবে। চার অক্ষরের এই ছোট্ট ফরাসী শব্দটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, পুফেফের?'

পুফেফেরকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হলো। চার অক্ষরের শব্দটা সম্পর্কে বস কি বলতে চাইছে? এমন একটা পরিস্থিতিতে তার হাসা উচিত কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না। সে অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে তাকালো। তারা কিন্তু কোনো সাহায্য করতে পারলো না।

'ছোট্ট একটা ফরাসী শব্দ পুফেফের। নাঃ, সত্যিই তুমি একটা মূর্খ। ফরাসী নয়, ওটা একটা ইংরিজি শব্দ। থাক, এর জন্যে এত অনুতপ্ত হবার কোনো দরকার নেই। আজকের দিনে ইংরেজ ভক্ত না হয়েও অনেকে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে। যেমন ধরো ট্রাস্ট…এটাও একটা ইংরিজি শব্দ। তা সত্ত্বেও শব্দটা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যথাযথ ভাবে মোকাবিলা করতে গেলে প্রতিটা শব্দকেই আলাদা আলাদাভাবে চিনতে হবে। অবশ্য মোকাবিলাটা টেস্টের বিরুদ্ধে নয়, ট্রাস্টের বিরুদ্ধে।

নাঃ, তুমি সত্যিই একটা নিরেট, প্ফেফের।'
হঠাৎ মোটকাটাকে বাধা দিয়ে পোলিন বিশ্রী একটা ভুল করে বসলো। বরাবর ওর স্বভাবটাই ওই রকম, আমার কথা কানেই নেয় না।
দম্ভ করে ও বলে বসলো, 'প্রটেস্টের দোহাই, আপনারা কি এবার ভালোয় ভালোয় কেটে পড়বেন?'
অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ওর এই আচরণ রূঢ় এবং অবিবেচনাপ্রসূত। মোটকাটা এবং প্ফেফের দুজনেই রুষ্ট হয়ে উঠলো। আমি ওদের শান্ত করার চেষ্টা করলাম। 'বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টর, পোলিনটা বরাবরই এই রকম। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি…'
মোটকাটা খেঁকিয়ে উঠলো, 'আপনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ওঁকে সহ্য করলেও, আমি পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড সহ্য করবো না।'
এমন সময় রান্নাঘর থেকে দুজন বেরিয়ে এলো, হাতে তেলের একটা বোতল। প্যাঁতপোয়াঁ আহ্লাদে একেবারে আটখানা।
'দেখুন বস, কালো বাজারের মাল। এতে প্রায় দশ ছটাক তেল রয়েছে।'
পোলিন বললো, 'ওটা একটা ছোট বোতল। আমার জুলাই মাসের র‍্যাশন।'
মোটকাটা সে কথা কানেই নিলো না। 'কালো বাজার! বুঝলে হে প্ফেফের, এঁরা বিদেশী বেতার শোনেন, আবার কালো বাজারে তেলও কেনেন!'
ঠিক সেই মুহূর্তে আমিও বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম। যদিও নিতান্তই অর্থ-হীন। কেননা আমি যেভাবেই বলি না কেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম তাতে কোনো লাভ হতো না। মোটকাটা হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠলো, 'বাজেয়াপ্ত করবো! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সারা দেশ যখন তেলের জন্যে হাহাকার করছে, আপ-নারা তখন ভুরিভোজের আয়োজন করবেন, তা তো আর হয় না।'
পোলিন ভেঙে পড়েছে। ওর অত কষ্টের তেল…
'সব কিছুর একটা সীমা আছে!' মোটকাটা আবার গর্জে উঠলো। 'ষড়যন্ত্র করতে চান করুন, তা বলে গরীবদের উপসী রাখবেন না। আপনাদের মতো মানুষেরা যতদিন থাকবে ততদিন ফ্রান্স আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!'
পরক্ষণেই আবার তার গলার স্বর অদ্ভুত ভাবে বদলে গেলো।
'যাকগে, এবার বলবেন কি তেলটা কে আপনাদের বিক্রি করেছে?'
'নিশ্চয়ই', পোলিন বললো! 'মাদাম দালাভিয়েঁর।'
'শুনলে তো হে, প্ফেফের? দালাভিয়েঁর। দালা…'
'হ্যাঁ, মাদাম দালাভিয়েঁরই আমাদের মুদি।'
'এই রাস্তাতেই?'
'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই। ওখান থেকেই আমরা জিনিসপত্তর সব কিনি।'

'কত করে দাম নিয়েছে ?'

'এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়েছে না। দাঁড়ান, ভেবে দেখি…'

'নিশ্চয়ই আট শো কী ?'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন !'

এতে ওদের মেজাজ গেলো চড়ে। আবার সেই বিশৃংখল অবস্থা। লেখার টেবিলটার ওপর ওরা স্তূপাকার করেছে একগাদা জিনিস—আমার পুরনো ডাইরি, গ্যাসের রসিদ, তেলের বোতল, একটা গোয়েন্দা বই। বইটা তাদের কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হলো, যেহেতু ওটার নাম 'ভিশির হত্যাকান্ড'। এ ছাড়াও ছিলো নানান টুকিটাকি জিনিস। যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদেরই একজন গলদঘর্ম হয়ে বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের একটা তালিকা প্রস্তুত করছিলো, এবার সেটা আমাকে সই করতে দিলো। সই করার আগে তালিকাটা পড়ে দেখতে চাইলাম। কিন্তু মনে হলো সে রকম কোনো নিয়ম নেই। তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যে আমি তাড়াতাড়ি সই করে দিলাম। মোট-কাটা কাগজটা নিয়ে স্বাক্ষরটার ওপর ফুঁ দিলো, তারপর ভালো করে পড়ার জন্যে কাগজটাকে একটু দূরে মেলে ধরলো। তার ভ্রূ দুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। কাগজটাকে আবার কাছে সরিয়ে আনলো। তারপর হঠাৎ প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো, 'এইসব রসিকতার অর্থ কি ? কি সই করেছেন এখানে ?'

'কেন, আমার নাম !' কাগজটার ওপর আমি ঝুঁকে পড়লাম। 'দুর্ভাগ্যবশত এটাই আমার নাম।'

'দুর্ভাগ্যবশত বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ? আপনি কি বলতে চান আপনার নাম…'

'হ্যাঁ, পেঁত্যা। রবের পেঁত্যা। এর জন্যে অবশ্য পাড়ায় আমার কিছুটা বদনাম আছে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। কেননা ওটাই আমার নাম। তবে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা বা অন্য কোনো সম্পর্ক নেই।'

ইনেসপেক্টর রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আমাকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি তখন তাকে আমার পরিচয় পত্র দেখালাম। বললাম রসিকতা করছি না বা তাকে বোকা বানাতেও চাইছি না, ওটাই আমার প্রকৃত পদবী, আমার বাবার পদবীও তাই। উনি অবশ্য মারা গেছেন। আগে জানলে হয়তো পদবীটা পালটাতেন। কিন্তু উনি যখন ছোট ছিলেন, তখন ওটা আর পাঁচটা নামেরই মতো ছিলো।

'থাক, থাক, খুব হয়েছে।' চোখের কোল পর্যন্ত টুপিটা টেনে দিয়ে সে খেঁকিয়ে উঠলো। 'আপনি যে বেশ ঘোড়েল লোক সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু যা বললেন আপনার নাম যদি তাই হয়, তাহলে সেলিয়ের, সিমঁ সেলিয়ের কার নাম ? আপনি বলছেন ওটা আপনার নাম নয় ? আচ্ছা ঝামেলায়

পড়া গেলো তো ! আপনি ঠিক বলছেন ? আমাদের তো সির্ম' সেলিয়েরের বাড়ি তল্লাসী করার কথা। আচ্ছা, এই বাড়িটার নম্বর কত ?'

'আঠেরো।'

'বাঃ বাব্বা ! এই সেলিয়েররা তো থাকে ষোলোয় !'

যথারীতি, পোলিন তখন যেন এবার ওদের বাগে পেয়েছে, এমন একটা ভঙ্গিতে চেঁচাতে শুরু করলো। 'বাঃ, চমৎকার ! আপনারা আঠেরো পর্যন্ত গুনতে পারেন না, অথচ লোকের বাড়িতে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করতেও ছাড়েন না।'

পোলিনের মন্তব্যে আদৌ কোনো যুক্তি নেই। কেননা এখানকার বাড়িগুলো এক থেকে আঠেরো পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যানুসারে সাজানো নয়, এলোমেলো। তাছাড়া এক থেকে আঠেরো পর্যন্ত গুণতে জানলেই কারুর বাড়িতে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করার অধিকার জন্মায় না।

'ভুলে যাবেন না,মাদাম', গম্ভীর গলায় মোটকাটা বললো, 'বিবৃতিটাতে আপনারা সই করেছেন, এবং আইন অনুসারেই তদন্তের কাজ চলতে থাকবে।'

আমি জানি,প্রতিবাদ করলে কিংবা আগে জানা থাকলে সই করতাম না বললে কোনো লাভ হতো না। সই যখন একবার করেই ফেলেছি করেই তখন আর কোনো উপায় নেই।

'এবার বোঝো ঠেলা !' পোলিন আমাকেই মুখ ঝামটা দিলো। 'তুমি বরাবরই ওই রকম।'

তাড়াতাড়ি করে মোটকাটা তার সাঙ্গপাঙ্গদের একত্রিত করলো। তারপর যেমন অচম্বিতে ঢুকেছিলো, ঠিক তেমনিভাবেই ওরা আবার দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে নিয়ে গেলো গ্যাসের রসিদ, তেলের বোতল আর কিছু পনীর যা ওরা শেষ মুহূর্তে খুঁজে পেয়েছিলো। হাড়-জিরজিরেটা বেরুলো সবার শেষে। গলদা-চিংড়ির দাঁড়ার মতো হাতে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে সে আমাদের দিকে ফিরে তাকালো, তারপর মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারণ করলো 'ওঁয়ায়াক্ !' আমাদের প্রতি সেটাই ওদের শেষ শব্দ।

আহা, ঘরখানার যা বলিহারি চেহারা হয়েছে, ঠিক যেন ডাইনির বাসা ! সব চাইতে মর্মান্তিক অবস্থা বালিসের ছড়ানো পালক আর পর্দাগুলোর। করুণ দৃষ্টিতে আমি মদের শূন্য বোতল (মঙ্গলবারের আগে আর মদ পাওয়া যাবে না) আর সুরুয়ার খালি পাত্রগুলোর দিকে তাকালাম।

পোলিন তো রেগেই টং। সব দোষ নাকি আমার। এ সম্পর্কে যা মুখে এলো ও আমাকে তাই বললো। ওর সব চাইতে বড় অভিযোগ মাদাম কানোর সেই ভালোবাসার লোকটার প্রসঙ্গে। ও সমানে গজ গজ করে চললো. 'লোকটা যে পিশরেলদের বন্ধু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কি দরকার পিশরেলদের মিছিমিছি এই ঝামেলায় জড়াবার ? তুমি কোন আক্কেলে পুলিসের সামনে ওদের নাম উল্লেখ করতে গ্যালে ?' কিন্তু কেন ওদের নাম উল্লেখ

করা উচিত হয়নি আমি সেটাই বুঝতে পারলাম না।

'কেন তা তুমি ভালো করেই জানো', পোলিন চটে উঠলো। 'নিজে যতটা বোকা তার চাইতে বেশি বোকা সাজার ভান কোরো না। ওদের ছেলেটা যে দা গলের দলে রয়েছে।'

'বেশ, কিন্তু ওই রকম একটা পুরনো ছবি দেখে ওরা তো আর সেটা বুঝতে পারছে না। তাছাড়া ছেলেটা ওদের একজন বন্ধু মাত্র এবং আমার যদ্দুর মনে পড়ছে, গাড়ি চাপা পড়ে না নিউমোনিয়ায় কিসে যেন সে মারা গ্যাছে।'

হঠাৎ পিশরেলদের সম্পর্কে পোলিনের সমস্ত উৎসাহ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলো। বাইরের বাতাস ঢোকার জন্যে আমি সবে জানলাটা খুলতে যাবো, ও আমাকে বাধা দিলো।

'জানলা থাক, শিগগির এসো!' কথাটা বলেই পোলিন দৌড়ে রান্নাঘরে গেলো। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। সর্বনাশ, তাই তো! দুজনে গ্যাস স্টোভের পাশে বসে দেওয়ালে কান চেপে রাখলাম। পাশের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে এলো একটা গমগমে কণ্ঠস্বর :

'আজ ফরাসী জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ৭৫৩-তম দিন...'

হাতের মুঠো পাকিয়ে পোলিন রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো, 'শুয়োরগুলো আর একটু হলে আমাদের খবর শোনাটাই মাটি করে দিচ্ছিলো!'

অনুবাদ / অসিত সরকার

অতিথি

'পাদরী মশাই আজ ফিরতে বেশি দেরি করবেন না তো? বেং-এর তরকারির জন্যেই বলছি।'

'না, মারী, আজ রাত্তিরে আমার জন্যে গুরুপাক কিছু কোরো না, যা গরম পড়েছে! না, আমার বেশি দেরি হবে না। স্বীকারোক্তিগুলো শেষ হলেই ফিরে আসবো।'

ম'সিয়ে ল্যারোয়া বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর পরিচারিকা গজগজ করতে লাগলো, একটা তরকারি এমন কিছু দামী খবার হতো না, অথচ ঐটাই তিনি এড়াতে চান। এই অঞ্চলের সমস্ত লোকের মতো মারীও বলে বেং, এটা তাঁর খারাপ লাগে। তিনি নিজে বলেন ব্রেং। সেইটাই তো ঠিক। জিনিসটা তাঁর বিশেষ ভালো লাগে না। ভিকার বাগানের মধ্যে দিয়ে গির্জায় পৌঁছনো যায়। অ্যাকাশিয়া গাছে ফুল ফুটেছে। চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু পাদরীর ইচ্ছে হলো রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাবেন। গির্জায় গিয়ে যথারীতি বিভিন্ন লোকের পাপ-স্বীকৃতি শোনবার কর্তব্যে আটকে পড়তে হবে, তার আগে বাইরে একটু ঘুরে যাবার ইচ্ছা হলো তাঁর।

জায়গাটা যে তাঁর ভালো লাগে তা নয়। দশ বছর আগে এখানে যখন তিনি প্রথম আসেন তখন তাঁর মনে হয়েছিলো এ যেন ঠিক তাঁর স্থান নয়। প্রথম দিনের সেই মনোভাব তাঁর আজও টিঁকে আছে। খাঁটি গ্রাম বা খাঁটি শহর হলে তাঁর পছন্দ হতো। কিন্তু এই শহরতলির বাসিন্দারা হলো ছোটখাট মহাজন, ব্যবসাদার, কিংবা এরা কাজ করে অন্যত্র। এদের বাড়ির পেছনে একটু ঝোপঝাড় থাকলেই এরা সন্তুষ্ট। তিনি যদি ভে-র পাদরী হতেন! সে জায়গাটা এখান থেকে মাত্র মাইল আধেক দূরে, মজুর এলাকা, প্রতিদিন সংগ্রাম, নানান সমস্যা সেখানে। তবু এর চেয়ে ভালো! পার্কের রাস্তায় এখনও পীচ তেতে রয়েছে। নিমেঘ সন্ধ্যায় একটা বেঞ্চির ওপর বসে দুজন স্ত্রীলোক অনর্গল বকবক করছে। ওরা তাঁকে দেখে নমস্কার করলো। আর একটু দূরে ফুটপাথের ধারে দুটি তরুণ-তরুণী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে। ম'সিয়ে ল্যারোয়া ছেলেটিকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু মেয়েটিকে চিনলেন। ছোটখাট দেখতে, বছর পনেরো বয়েস। ভালো করে কাচা সাদা ব্লাউজের ওপর থেকে অস্ফুট দুটি স্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েটির চুল আর চোখ কালো, পরনে খাটো স্কার্ট, পায়ে মোজা নেই। বেশি দিনের কথা নয়, এই মেয়েটি নিয়মিতভাবে গির্জার ছোটদের ধর্মোপদেশের বৈঠকে আসতো। পাছে ওরা বিরত হয় সেজন্যে ম'সিয়ে ল্যারোয়া মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

পার্কের ছোট গাছগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। মঁসিয়ে ল্যারোয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন গির্জাটা, আর বিরক্ত মনে ভাবলেন যেসব পাপ-স্বীকারোক্তি তাঁকে এখন শুনতে হবে তার কথা। বারবার সেই একই জিনিস। তাঁর এলাকার লোকগুলো বড়ো পাপও কখনও করে না, অন্তত যারা আসে তারা। আসলে লোকগুলো এই গির্জাটারই মতো। মঁসিয়ে ল্যারোয়া তাদের পছন্দ করেন না। আর এই গির্জাটাতেও তিনি কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারলেন না। এটার অসাধারণত্বই বা কি আছে? ১৯১০ সালে গথিক ধাঁচে গড়া গির্জা। যতদিন পাথরগুলো সাদা আর জোড়া-গুলো পরিষ্কার ছিলো ততদিন নির্মাণ শিল্পের একটা আভাস পাওয়া যেতো, তারপরে পাথর ময়লা হয়ে গেছে, ছোপ লেগেছে। ভেং-র ধোঁয়া হাওয়ায় উড়ে এসে এখানে লাগে।

বাইরে থেকে গির্জাটা মনে হয় বেশ বড়, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে হতাশ হতে হয়। সঙ্গীত মঞ্চটা আয়তনে ছোট, পাশের পথগুলো চওড়া নয়। সবকিছুই কেমন যেন স্থূল। মঁসিয়ে ল্যারোয়ার মতে যার একটু শিল্পরুচি আছে তার কাছে এ খুব নৈরাশ্যজনক। মঁসিয়ে ল্যারোয়া যৌবনে নানা জিনিস অধ্যয়ন করেছেন, মিউজিয়ামে ঘোরা-ঘুরি করেছেন। না, অল্পেই সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। তাছাড়া ঈশ্বরের ভবনে অভিপ্রায়টাই তো আসল জিনিস। সব যদি খুব সুন্দর নাই হয়, তবু সেখানে এসে যারা হাঁটু গেড়ে বসবে, তারা সঙ্গে নিয়ে আসবে মনের ঊর্ধ্বাধিকার, তাই কি যথেষ্ট নয়? তার দ্বারাই তো স্থাপত্যের যে অভাব রয়েছে তা পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু কই, যারা আসে তারা তো তা সঙ্গে নিয়ে আসে না?

কোনো রোমান বাসিলিকের অথবা নিখুঁত গথিক গির্জার পাদরী হবার জন্যে মঁসিয়ে ল্যারোয়ার এত আগ্রহ হতো না। ফ্রান্সের পল্লী অঞ্চলে যে ধরনের গির্জা অনেক আছে সেই রকম একটা গেঁয়ো গির্জা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন। ও গির্জাগুলো দেখতে একটু অদ্ভুত, তবু ওদের মধ্যে একটা অনিপুণ আন্তরিকতার পরিচয় থাকে। কিন্তু ঈশ্বর আর বিশপের বিধান অন্য রকম। মঁসিয়ে ল্যারোয়ার জীবনের কঠোর কর্তব্য হলো এই আত্মাবিহীন দেবালয়ে পৌরহিত্য করা। তবে এক সময় আসে যখন এইসব বাহ্য উপকরণ এড়িয়ে চলা যায়, যেমন যায় ব্রেং-এর বেলায়।

এই অঞ্চলটা বিশ্রী রকম শান্ত! মাথার ওপর খুব নিচুতে ঐ গরগর আওয়াজ যদি না থাকতো, মনেই হতো না যে যুদ্ধের মধ্যে আছে। যদিও ঐ আওয়াজে কেউ বিশেষ কর্ণপাত করে না। বিমান ঘাঁটিটা খুব কাছে। বাস্তবিক মাথার ওপর আওয়াজটা না থাকলে মনেই হতো না যুদ্ধ চলছে। বিশেষ করে এ জায়গায় বিজ্ঞাপন বড় একটা দেখা যায় না, যেগুলো দেখলে মঁসিয়ে ল্যারোয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তাঁর শরীরের মধ্যে কেমন যেন করে। শুধু

যার স্তম্ভটার গায়ে যেখানে আগে সিনেমা বা কনসার্টের বিজ্ঞপ্তি থাকতো, আজকাল সেখানে থাকে সৈন্যবাহিনী বা মিলিশিয়ায় যোগ দেওয়া বা টুকরো লোহা সংগ্রহের আহ্বান। এখানে বিজেতাদের সবুজ উর্দি কদাচিৎ দেখা যায়।

গির্জার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মঁসিয়ে ল্যারোয়া ভাবলেন এবার মনস্থির করা দরকার। মানসচক্ষে তিনি যেন দেখছিলেন, কারা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। পরিহাসচ্ছলে তিনি বলেন, আমার মক্কেলরা। সম্ভবত মাদাম গীয়বর্তে, বুড়ী বুরজোয়া, সিগন্যালার বোকা বুদার, সাঁ্যংওলাদি, বিদ্যালয়ের দু একজন ছাত্র। কি অসীম এদের ধৈর্য ! মঁসিয়ে ল্যারোয়া তাঁর মনের বিতৃষ্ণা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মন আগে থেকেই বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিলো, বিশেষ করে এই ভেবে যে যত কম লোকই থাকুক না কেন—তাদের জন্যে তাঁর বেতারের খবর শোনা হবে না, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার খবর। এও তিনি সমর্পণ করলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, তবে একটু অনিচ্ছার সঙ্গে। পকেটের মধ্যে জপমালায় তিনি হাত দিলেন। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলো সাতজন, এদের মধ্যে দুজন মহিলা। মেরী মাতার সামনে যে বাতিগুলো জ্বলছিলো তার আলোয় তিনি এক নজরেই সবাইকে চিনতে পারলেন।

আগে থেকে অতিরঞ্জিত করে তিনি কিছু ভাবেননি। এই কঠিন ঈশ্বর ভক্তেরা তাঁর কাছে কি বলবে তা তিনি আদ্যোপান্ত জানেন, তিনি জানেন এক ঘণ্টাকাল তাঁকে কি ক্ষুদ্র, কুৎসাময় জগতে আবদ্ধ থাকতে হবে। প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ! ধর্মোপাসনার পরিচ্ছদ পরার জন্যে মঁসিয়ে ল্যারোয়া গির্জার পোশাক-ঘরে ঢুকলেন। আজকাল কি বিশ্রী কাপড়ই না হয়েছে। আগেকার চোগাগুলোর সৌন্দর্য, সেই চমৎকার মিহি কাপড়ের কথা যখন মনে পড়ে তখন তার অনুশোচনা হয়। আবার নিজের মধ্যে শূন্যগর্ভ সামাজিক অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তিনি নিজেকে ভর্ৎসনাও করেন।

স্বীকারোক্তি শোনার আসনে বসে তিনি সবুজ পর্দার নিচে ঘুলঘুলির ওধার থেকে যে গুঞ্জন আসছিলো তা অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগলেন : 'হে পিতা, আমাকে ক্ষমা করো, কারণ আমি পাপ করেছি...' এমন কিছু স্ত্রীলোক আছে যারা তুচ্ছ খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়ে আনন্দ পায়। যেন তারা পাপ-স্বীকার করতে আসেনি, এসেছে পুণ্য জাহির করতে। নিশ্চয়ই পুণ্য খুব বড় জিনিস··· মঁসিয়ে ল্যারোয়া বাগানে অ্যাকাশিয়ার দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবলেন, আর ভাবলেন ভের্না পাদরীর সঙ্গে দাবা খেললে কি আনন্দটাই না পেতেন···যদি লোকটার রাজনীতি আলাপের ঐ ভয়ঙ্কর ঝোঁকটা না থাকতো ! হঠাৎ মঁসিয়ে ল্যারোয়া আবিষ্কার করলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। যে মেয়েটি স্বীকারোক্তি করছিলো তাকে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে লজ্জিত হলেন। বিবে-

দর পরিচালক যিনি তাঁকে নিজের ওপর আরও কড়া নজর রাখতে হয়!
'বাছা, তুমি দশবার বলবে 'পাতের' আর দশবার 'আভে' জোড়…'
এবার ডান দিকের ঘুলঘুলি থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর উঠলো। পাশে প্রার্থ-
নার বেদীর ওপর কেউ অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে পড়েছে কিনা দেখার জন্যে
মঁসিয়ে ল্যারোয়া সামনের পরদাটা একটু সরালেন। উঃ, এই কর্তব্যের শেষ
সীমা পর্যন্ত তাঁকে যেতে হবে। ঈষৎ সরানো পরদার পেছনে তিনি দেখতে
পেলেন মোমবাতির মৃদু আলো, এবং এ কথাও তিনি কিছুতেই না ভেবে
পারলেন না যে আজকাল মোম জ্বালানো কত বড় বিলাসিতা। লোক আজ-
কাল সাবান পায় না যা মানুষের কাজে লাগতে পারতো, তা অনর্থক
পুড়ছে দেখে মাতা মেরী খুব খুশি, এ কথা কি নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই
সব বিপজ্জনক চিন্তা তিনি মন থেকে দূর করে দিলেন। 'শোনো বাছা, যা
অতি স্বাভাবিক তার জন্যে নিজেকে আর দুষো না…'
এইভাবে ঘনায়মান অন্ধকারে চললো স্বীকারোক্তির পালা। দুবার মঁসিয়ে
ল্যারোয়ার মনে হলো আজকের মতো কাজ শেষ হলো, কিন্তু দুবারেই তিনি
দেখলেন অনুতাপীদের সংখ্যা গুনতে ভুল করেছেন। এইবার নিশ্চয়ই শেষ।
ইনি সেই মহীয়সী নারী যিনি মুদিকে ঠকিয়ে টিনভর্তি টমাটো হস্তগত করে-
ছিলেন, তিনি দোষ স্বীকার করে বললেন তাঁর মূর্খতার অবধি নেই, কারণ
পনেরো দিন বাদেই টিনের টমাটো অল্প দামে অবাধে বিক্রি হতে লাগলো।
হঠাৎ পাদরী মশাই-এর মনে হলো, গির্জার মধ্যে কি যেন একটা চাঞ্চল্যের
সৃষ্টি হয়েছে। 'বাছা, বেশ বুঝতে পারলে তো প্রবঞ্চনায় কোনো লাভ নেই।
এই ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর তোমাকে…' তিনি পরদাটা তুলে ধরলেন, কেউ বাকি
নেই। 'ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সন্তানের নামে ' বুড়ির কাজটা তিনি তাড়া-
তাড়ি সারলেন, কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন।
স্বীকারোক্তি শোনার আসন থেকে নেমে আসার পর তিনি লক্ষ্য করলেন ডান
দিকের কামরায় পরদার নিচে একজন পুরুষের পা বেরিয়ে রয়েছে। তাহলে
আবার তাঁর গুনতে ভুল হয়েছে? এখনও একজন অনুতাপী বাকি রয়েছে।
কিন্তু গির্জার সঙ্গীত মঞ্চে কারা যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। তিনি ভ্রূ
কুঞ্চিত করলেন। এর অর্থ কি? তিনি এগিয়ে গেলেন।
ওদের তিনজন পুলিসের লোক, আর দুজন সাধারণ পোশাকে, যাদের তিনি
অবিলম্বেই চিনলেন। স্বীকারোক্তির জায়গা থেকে ঐ বুড়ি বেরিয়ে আসার
পর ওরা ওঁর মুখ ভালো করে দেখলো, তারপর যেতে দিলো। 'কি ব্যাপার
মশাইরা?' মঁসিয়ে ল্যারোয়া খুব শান্ত গম্ভীরভাবে বললেন। তিনি প্রশ্ন
করলেন এমন এক কন্ঠস্বরে যা চড়াও নয়, খাদেও নয়। এ কায়দাটা শুধু
তাঁরই জানা, যা মৃদুস্বরে বলা হলেও গির্জার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত
পর্যন্ত শোনা যায়। পুলিসগুলো ভয় পেয়ে থেমে গেলো। সাধারণ পোশাক

পরা লোক দুটির একজন বললো, 'ভে-তে আবার আততায়ীর আক্রমণ হয়েছে, একটা বোমা মেরেছে। যে লোকটাকে আমরা পালাতে দেখেছি সে আপনার গির্জার মধ্যে পালিয়েছে ··'

বোঝা যায় লোকটা চমৎকার ফরাসী বলছে, অথচ ওর কথার ঝোঁকগুলো কেমন যেন রূঢ়! ম'সিয়ে ল্যারোয়া শান্তস্বরে বললেন, 'খুঁজুন আপনারা, দেখুন যদি ·· কিন্তু কেউ নেই, বুঝলেন...' একটু থেমে বললেন 'আমার যজমানদের মধ্যে শেষ লোকটি ছাড়া আর কেউ নেই। বেচারা আমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে প'য়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করে আছে, আপনারা যদি অনুমতি করেন তো আমি ওর স্বীকারোক্তি শুনতে থাকি···'

অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি ইতস্তত করলেন। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠলো। ঐখানে, ঐখানে লোকটার কাতর নিশ্বাস তিনি শুনতে পেলেন। ফিরে আসার সময়ে তিনি ওর জুতো দেখেছেন, গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ একজোড়া জুতো। এখনি যে কথা তিনি বুড়িকে বলেছেন, ভাবলেন সেই কথাটা 'প্রবঞ্চনায় কোনো লাভ নেই ·' কিন্তু ওর সম্বন্ধে তিনি খুব নিশ্চিন্ত নন, হয়তো কিছু কৌতূহল জেগেছে। তিনি মনস্থির করলেন। ডান দিকের ঘুলঘুলি খুলে আরও ভালো করে দেখার জন্যে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'বলো পুত্র, তোমার কথা বলো, আমি শুনছি।'

গির্জার মধ্যে আসা যাওয়ার শব্দ শোনা গেলো। ম'সিয়ে ল্যারোয়ার মনে হলো কে যেন পোশাক-ঘরের দরজা খুললো। নিশ্চয়ই গির্জার পাহারাদার। কিন্তু এই যে খুব কাছে লোকটার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—গভীর চাপা কণ্ঠস্বর, সে বললো: 'পাদরী মশাই ··হে পিতঃ · !' পাদরীর কাছে কথা বলার অভ্যাস নিশ্চয়ই লোকটার নেই, হয়তো গির্জার আশ্রয় নেবার জন্যেই মার্জনা চাইছে। পাদরী বললেন, 'বলো পুত্র, আমি তোমার কথা শুনছি।' তাঁরা যেখানটায় ছিলেন, সেই দিকে কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগলো। পাদরী যেন অনুভব করলেন নতজানু লোকটি এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি তার দিকে ফিসফিস করে বললেন, 'অপেক্ষা করো, চুপ করো···' তারপর তিনি উঠলেন, দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটি যে একটু আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলো।

'আবার কি মশাই?' ধর্মোপদেশে অভ্যস্ত পাদরীর মৃদু কণ্ঠস্বর সহসা চিৎকার করে উঠলো। অপর লোকটা তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে এসে পড়েছিলো, আকস্মিক এই রূক্ষ সম্ভাষণে সে হতবুদ্ধি হয়ে পেছিয়ে গেলো. 'এন্‌ৎশুলদিগেন জি মাফ করুন, আমি মনে করেছিলাম···'

ম'সিয়ে ল্যারোয়া শরীরের মধ্যে একটা খুশির হিল্লোল অনুভব করলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? কোথায় রয়েছেন আপনি মনে করেন? আমাকে আমার কাজ করতে দেবেন কি দেবেন না? আমার একজন যজমান রয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত

করতে এসেছে। বেচারি প'য়তাল্লিশ মিনিট ধরে অপেক্ষা করে আছে, বুঝলেন? আশা করি আপনারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন···'
পুলিসের লোকগুলো ফিরে এলো। ওদের একজন বললো, 'কাউকে পাওয়া গেলো না।' জার্মানটা সাধারণ পোশাকপরা অন্য লোকটিকে কি যেন বললো।
পাদরী মশাই বললেন, 'আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, ওই দেখুন গির্জায় একটা ছোট দরজা রয়েছে, স্যাঁ জাঁ-বাতিস্তের বেদীর···'
ওরা সবাই সেদিকে তাকালো। সত্যিই তো! তাহলে···
'আপনি কি বাইরে লোক রেখে এসেছেন, ব্রিগেডিয়ার?'
ব্রিগেডিয়ার বললো, 'হ্যাঁ।'
লোকগুলো সব টুপি খুলে হাতে নিয়ে স্যাঁ জাঁ-বাতিস্তের বেদীর দিকে চললো। ম'সিয়ে ল্যারোয়া দেখলেন তারা ক্রমে দূরে চলে গেলো, তারপর গির্জার বাইরে বেরিয়ে গেলো। তিনি নিজে নিজেই হাসলেন। তাঁর কানে যেন ঈশ্বরের মহিমস্তোত্র বাজতে লাগলো। সর্ব প্রকার পাপ বোধ তিনি হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, এবার তিনি লোকটির স্বীকারোক্তি শুনবেন। তিনি যখন ফিরলেন, দেখলেন সেই কপট অনুতাপী তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে টুপি নেই। মোমবাতির আলোয় তার মুখে ছায়া পড়েছে।
ম'সিয়ে ল্যারোয়া বললেন, 'তুমি স্বীকারোক্তি করতে চাও না?'
'পাদরী মশাই'—'আশ্চর্য, ওর স্বাভাবিক গলার স্বর কি গভীর, মনে হয় যেন বুকের মধ্যে থেকে উঠে আসছে এবং মজুর বা সৈনিকের মতো তার শক্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। 'আপনার সাহসের জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু আমার এখন চলে যাওয়াই ভালো···'
'তুমি যদি এখন বেরোও তাহলে ওরা তোমাকে ধরবে, হে পুত্র।'
ম'সিয়ে ল্যারোয়া স্বীকারোক্তি সময়কার ঐ সম্বোধনের ওপর একটু জোর দিলেন, যেন তাঁর অভিভাবকত্বের অবস্থাটা তিনি আরও বেশি সময় ধরে রাখতে চান। কিন্তু তখনই, তাঁর মধ্যে সত্যিকারের খ্রীষ্টানসুলভ করুণার অভাব রয়েছে বুঝতে পেরে নিজের কথাটা সংশোধন করে নিলেন, 'বুঝলে খোকা?'
'আমার উপায় ছিলো না, তাই বাধ্য হয়ে···!' যুবক মাথা চুলকে ইতস্তত করলো, 'আচ্ছা পাদরী মশাই, ওরা কি আপনাকে বলেনি ওদের কেউ খতম হয়েছে?'
ম'সিয়ে ল্যারোয়া যুবকটির দিকে তাকালেন। তার মুখ দেখে খুব সাহসী মনে হলো, মনে হলো সে আধা-খেঁচড়া করে কিছু করতে চায় না। তাই দ্বিধাগ্রস্থভাবে তিনি জিগেস করলেন, 'তুমি কি জার্মানদের কথা বলছো?'
স্পষ্টতই প্রশ্নটা বোকার মতো হয়েছিলো, তাই সেটা চাপা দেবার জন্যে তিনি আবার বললেন, 'বেশ, এখন তুমি কি করতে চাও?'

'আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি এখানে অপেক্ষা করি, এক কোণে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবো…'

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

ম'সিয়ে লেরোয়া বললেন, 'না। শেষ পর্যন্ত ঐ হতচ্ছাড়ারা যদি আবার ফিরে আসে?'

যুবক অস্পষ্ট একটা ভঙ্গি করলো। মনে হলো সে যেন চোখ দিয়ে গির্জাটা পরিমাপ করছে, যেটা একটা ভবিষ্যৎ মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্র হবে। পাদরী মাথা ঝাঁকালেন।

'না থাকাই ভালো। এসো আমার সঙ্গে। গির্জার পোশাক-ঘর থেকে আমার বাড়ি যাওয়া যায়, বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে…'

যুবকটিকে আর বুঝিয়ে বলতে হলো না। সে বললো, 'কিছু যায় আসে না, একজন পাদরীর পক্ষে এই-ই যথেষ্ট সাহসের কথা।'

এখন অ্যাকাশিয়া ফুলের চমৎকার গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

পাদরী মশাই যখন বাড়ি ফিরে মারীকে বললেন তাঁর একজন অতিথি আজ রাত্রে খাবেন, মারী তখন হতাশ ভাবে হাতদুটো ওপরে তুলে বললো, 'নাঃ আপনি আর কিছুতেই বদলাবেন না। আমাকে বলে গেলেন সামান্য লপ্‌সি ছাড়া আর কিছু খাবেন, আর এখন '

মারী আর কিছু বলতে পারলো না, লোকটির দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেলো। তারপরেই সোজা ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো।

ম'সিয়ে ল্যারোয়া বললেন, 'আমাদের খাওয়ার জন্যে এক ব্রেৎ-এর তরকারি ছাড়া বোধ হয় আর কিছু নেই, তাছাড়া এই যুদ্ধের সময়ে… তুমি ব্রেৎ-এর তরকারি ভালোবাসো?'

'আপনি বেৎ-এর কথা বলছেন? বেৎ তো খারাপ নয়, গাজরের চেয়ে ভালো।'

ম'সিয়ে ল্যারোয়া প্রতিবাদ করে বললেন, 'গাজর যদি গোল-আলুর সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধা যায়, তাহলে সত্যিই ভালো…আর তোমরা যে এখানে বেৎ বলো তা ভুল, বলা উচিৎ ব্রেৎ।'

'প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মত আছে। আমরা এখানে বলি বেৎ।'

তাঁরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ আগে গির্জার যে রকম হেসেছিলেন সে রকম নয়। এ সেই প্রাণখোলা হাসি যাতে অনেক সময় পেটে খিল ধরে যায়। তাঁরা নিজেদের সংযত করতে পারলেন না। ম'সিয়ে ল্যারোয়ার অফিসঘর এটা। সবুজ মখমলের পটভূমির ওপর আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের বিরাট মূর্তি। এই প্রথম ম'সিয়ে ল্যারোয়া পুরো আলোয় আগন্তুকের মুখ পরিষ্কার দেখতে পেলেন। দৃঢ় চিবুকের চেয়েও তার মুখের বড় বৈশিষ্ট্য হলো বালকের মতো দুটি চোখ, উজ্জ্বল বাদামী রঙের কৌতূহলী দুটি চোখ। তার মুখের ওপর যদি সেই ছোট্ট বলিরেখাটা না থাকতো,

তাহলে নেহাৎ অনভিজ্ঞ একটা বালক বলে ধরে নেওয়া যেতো।
'তুমি নিশ্চয়ই তামাক খাও?'
খায় মানে, না খেয়ে কি পারা যায়! উত্তর পাওয়ার আগেই পাদরী প্রায় জোর করেই তাকে ঠেলে দিলেন আরাম-কেদারায়। যুবকের মুখ খুশিতে ভরে উঠলো। সে ধূমপান করলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'লোকে ঠিকই বলে, সর্বত্রই সাহসী মানুষ আছে, কিন্তু কথাটা যে সত্যি তা দেখলে আনন্দ হয় প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মত ও পথ আছে, এবং তার নিজেরটা সে আঁকড়ে থাকবেই।'
না, এ ছেলের কাছে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম, মনে মনে ভাবলেন মঁসিয়ে ল্যারোয়া। তাছাড়া, সে মতলবও তাঁর নেই। বহু বিষয়েই চিন্তার পার্থক্য এত বেশি বলেই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে সন্তোষ লাভ করছেন। মঁসিয়ে ল্যারোয়া যদি পাদরী না হতেন, তাহলে ঘটনাটায় আনন্দ হতো কম। তাছাড়া তাঁর মনে হলো সবুজ মখমলের ওপর যীশুখৃষ্টের বিরাট মূর্তি যেন তাঁকে অনুমোদন করছেন।
কিন্তু তাঁর মধ্যে তখন অন্য জিনিস ঘুরছে। দু তিনবার তিনি তাঁর সূত্র খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। অবশেষে তাঁর চেয়ারটা এগিয়ে এনে অতি-পরিচিতের মতো অতিথির উরুতে চাপড় মেরে দুষ্টুমিভরা কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'তারপর এখন আমাদের মধ্যে···সেই বোমা?'

অনুবাদ / অজ্ঞাত

দোকানের দরজা বন্ধ হলো। ম্যাসিয়া গ্রেগোয়ার পিক জানলা দিয়ে দেখলেন, যে-খরিদ্দার একটু আগে দোকান থেকে বেরুলো, সে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি ছোটখাটো, খাদাখী রঙ, চোখে চশমা, একটু কুঁজো হয়ে চলে।
'ও নিশ্চয় ফরাসী নয়,' মঃ পিক মন্তব্য করলেন। তাঁর কপালে ফুটে উঠলো সামান্য ভ্রুকুটি, খাবার টেবিলে যে ভ্রুকুটি দেখলে মাদাম পিক ভয় পান।
মাদাম পিক গভীর দুঃখের স্বরে বললেন, 'তোমার কি তাই মনে হয় ? ও কি তবে ইহুদি ?'
মঃ পিক কাঁধ ঝাঁকালেন। ইহুদি হোক বা না হোক, লোকটা নিশ্চয় ইংরেজ রেডিওর খবর শোনে।[১] ও যে রেডিওটা মেরামতের জন্যে দিয়েছিলো সেটা অন্যান্য রেডিওর সঙ্গে সেখানেই পড়ে আছে। একটা ছোট লিংকন রেডিও যেটা ভালোমতো কাজ করছে না। কি গোলমাল হয়েছে, দেখতে হবে। অবশ্য যখন সময় পাওয়া যাবে। রাশি রাশি কাজ জমে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চাইছে তার জিনিসটা আগে মেরামত হোক। মেরামত করতে যা দরকার, সেই নতুন ব্যাটারিই এই যুদ্ধের বাজারে মিলছে না।
'আমি তোমার মতো নই', মাদাম পিক বললেন। 'তুমি যেমন জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাও, আমি তা চাই না। কিন্তু একজন ইহুদিও আমাদের এখানে ঢুকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। হাজার হোক, ওদের জন্যেই তো যুদ্ধ বাঁধলো···আমার খোকা মারা গেলো···ওকে মেরে ফেললো।'
মঃ পিক একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'তুমি একথা অনেকবার বলেছো। তুমি ভালো করেই জানো, পিয়েরকে কেউ মারেনি। ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। যারা ইহুদি নয় তারাও সবসময় খুব ভালো লোক হয় না।'
মার্থ পিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কে জানে শেষ পর্যন্ত কি হবে! আগে এত কাজ জুটতো না। খরিদ্দারের মন জুগিয়ে চলতে হতো। কিন্তু জিনিসপত্র সহজে পাওয়া যেতো। কার সঙ্গে কারবার করা হচ্ছে সে-নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। অবশ্য গ্রেগোয়ার বলেন যে সেইজন্যেই আজ আমাদের এই অবস্থা। গ্রেগোয়ারজার্মানদের সঙ্গে সহযোগীদেরকে পক্ষে, পাড়ার বাকি সকলে সহযোগিতার বিপক্ষে। তারা সহযোগীদের বিষয়ে মোটেই ভালো কথা বলে না। মাদাম পিক এসব শুনে একটু ভয় পান। তিনি নিজে সরকারকে সমর্থন করেন। কিন্তু সহযোগিতাকে নয়। তাঁর স্বামী যতই যুক্তি দেখান না কেন। মাদাম পিক মানুষ ভালো, কিন্তু ইহুদিদের ভয় পান। তাদের বিষয়ে কি না বলা হয়! মুদিখানার মালিক মাদাম জেলাভিনেং বলেন, এসব মিথ্যা কথা। যা রটে

তার কিছু ঘটেই। গ্রেগোয়ার সব সময় বলেন যে উনি ইহুদিবিদ্বেষী নন। তবু ইহুদিদের নিন্দা করতে তো ছাড়েন না। হয়তো এটাই ও'র নিরপেক্ষতার প্রমাণ।

দোকানে গানের সুর ভেসে এলো। সুজি সলিদার সত্যিই ভালো গাইতে পারে, মঃ পিক তারিফ করলেন। তিনি গানের সমঝদার। সেইজন্যেই হয়তো রেডিও সারাবার কাজ জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মঃ প্রিনসটনের টেলেফুঙ্কেন রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই, জার্মান রেডিওগুলো চমৎকার। কেউ কেউ আবার সব জার্মান জিনিসকে খারাপ বলে।

'আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না', মঃ পিক বললেন। বার্থ ভাবলেন ও'র স্বামী বুঝি সুজির গানের প্রশংসা করছেন। নভেম্বরের এগারো তারিখের পর তাঁর আর গ্রেগোয়ারের মুখে জার্মানদের গুণগান শুনতে ভালো লাগতো না। গ্রেগোয়ার তাঁর আপত্তি উড়িয়ে দিতেন। 'একটা যুক্তি তো থাকবে। যতদিন ওরা কেবল দখল-করা এলাকায় ছিলো ততদিন ওদের সব ভালো ছিলো। অন্যরা ওদের ঝামেলা পোহাক না। এখন জার্মানরা তোমার নিজের ঘাড়ে পড়েছে বলে বজ্জাত বনে গেছে। এর মানে হয়?'

সত্যিই, নভেম্বরের এগারো তারিখের পর পাড়ার অনেকে মত বদলেছিলো। গ্রেগোয়ার পিক অবশ্য ঘন ঘন মত পাল্টাবার মানুষ নন। বিদেশীরা দেশ দখল করলে কিছু অসুবিধে হবেই। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'তবু কাছাকাছি থেকে দেখে সব অন্যরকম মনে হয়,' মাদাম পিক মন্তব্য করেন।

এ-ধরনের যুক্তি শুনে তাঁর স্বামীর হাসি পায়। তাহলে চিন্তাভাবনার দাম নেই? নিজের কিছু ঘটলেই মত বদলাতে হবে? যেমন কিছু কিছু লোক বলে। তাঁর ছেলের কথা ভেবে জার্মানদের বিপক্ষে যাওয়া উচিত ছিলো। প্রথম কথা পিয়ের জার্মানদের হাতে মারা যায়নি। দলে দলে পালিয়ে আসার সময় একটা নিরর্থক দুর্ঘটনা···ব্যাটারি সারাতে গিয়ে। অবশ্য কেউ কেউ বলে জার্মান আক্রমণ না হলে এসব কিছুই ঘটতো না। ছেলেমানুষি কথা। আর পিয়ের জার্মানদের হাতে মারা পড়লেও একই ব্যাপার হতো। তাঁর নিজের ছেলে বলেই কি মত পাল্টাতে হবে! জার্মানরা তাঁর ছেলেকে মারলেও মঃ পিক সহযোগিতার পথ নিতেন! না হলে যে পরের বার আর একজনের ছেলে মারা যাবে। নিজের ক্ষতি হয়েছে বলেই মতামত ছেড়ে দেবো? এ যেন রোদ গায়ে লাগছে বলে দিনদুপুরে বলা যে রাত হয়েছে! প্রতিশোধ, পালটা প্রতিশোধের ব্যাপারই বা কদিন চলবে? একজন আমার ছেলেকে মারলো, আমি তার ছেলেকে মারলাম, সে আবার···এর শেষ কোথায়? ঠিক আছে, আমি ধরেই নিলাম, জার্মানরা পিয়েরকে মেরেছে। বার্থ এতে খুশি হবে, কারণটা ভগবানই জানেন। ভুল হলেও আমি না হয় কথাটা মেনে নিলাম। তার জন্যে

আমার জীবনদর্শন বদলাবে না।

গ্রেগোয়ার তাঁর জীবনদর্শনের কথা বলতে শুরু করলে বার্থ চুপ করে যান। তিনি জানেন তাঁর স্বামী পিয়েরকে কত ভালোবাসতেন। এটাই কি তাঁর সততার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয়? বার্থ একথা দিনরাত বিশ্বসুদ্ধ লোককে বলে বেড়ান—মঃ রবেয়ার, মাদাম দেলাভিনেং, দোকানের মেয়েরা—সকলকে।

'মাছি মারা···মাছি মারা···'

'আঃ! বাচ্চাটা···জাকো, তুই জানিস যে হাত দিতে নেই।' জাকো রেডিওর বোতাম টিপেছে। সুজি সলিদরের গানের বদলে শোনা যাচ্ছে মাছির কথা। মঃ পিক 'লিলি মার্লেনে'[৩] ফিরে গিয়ে ছোট কোঁকড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ছেলেটার ওপর তাঁর দুর্বলতা একটু বেশি। পিয়েরের তো আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই। বাচ্চাটার অপদার্থ মা তাকে ফেলে গেছে। জাকো দেখতে অনেকটা ছোট্ট দেবদূতের মতো।

'সোনামণি, তোর ঠাকুমার কাছে যা। তোর দাদুর এখন কাজ আছে।' বার্থ বাচ্চাটাকে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে আর একটু হলেই বাতিগুলো ফেলে দিচ্ছিলো, যে-বাতি সকালবেলাই ভিসরের লোক দিয়ে গেছে। একটা সবে মেরামত-করা রেডিও নিয়ে টানাটানি করছিলো। সাড়ে তিন বছরের ছেলেটা ভারি মিষ্টি হয়েছে। ও জন্মেছিলো যুদ্ধের গোড়ার দিকে। 'রেডিও প্যারিস' আর শোনা যাচ্ছে না। সুজি সলিদর—ও'র পূর্বপুরুষ ছিলো এক জলদস্যু, যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছিলো। রেডিও সারানোর কাজটা ভালো। মঃ পিক এপথে এসেছেন বলে খুশি। যদিও আপাতত দু-একটা অসুবিধা আছে। মেরামত করার ঘরটা দোকান থেকে আলাদা। মঃ পিক এখানে একা কাজ করতে ভালো বাসেন, যেমন মুচি চারদিকে জুতো নিয়ে বসে। খরিদ্দাররা এখানে বিরক্ত করে না। প্রত্যেক বছর বসন্তে তিনি দরজা জানালা খুলে রাখেন, যাতে ঘরে রোদ আসে। গানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কাজ করে বেশ আনন্দ। আঃ, বা-হাতটার কি ফুটে গেলো! কি যে হলো আবার! চোখেও কম দেখি!

দিনটা শুক্রবার। মাদাম পিক প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। মিষ্টির দোকানে যেতে হবে। বাচ্চার মিষ্টি চাই। তিনি দোকানে ফিরে এলেন।

'মিষ্টির দোকানে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বাচ্চাকে নিয়ে যাবো, না তোমার কাছে রেখে যাবো?'

মঃ পিক কথাটা শুনতে পাননি। তিনি রেডিও বন্ধ করলেন।

'কি? ওঃ, আচ্ছা। বাচ্চাকে রেখে যাও, আমার অসুবিধে হবে না।'

ছেলেটার বাবাকে জার্মানরা মারলে প্রতিবেশীদের সুবিধে হতো বইকি! তাঁর বিরুদ্ধে একটা যুক্তি পাওয়া যেতো। মঃ পিক ওদের মতো চিন্তা করেন না। এক সময় তিনি লিজনে[৪] যোগ দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য আর ওদিকে মাড়ান

না। লিজন তাঁকে হতাশ করেছে। বড় বড় কথার কোনো মানে হয়! সরকার থাকবে, সরকার দেশ শাসন করবে। সরকারে একজন প্রধান নেতা থাকবে। ব্যাস হয়ে গেলো। হ্যাঁ, ওদের সুবিধা হতো বটে। পড়শিদের কপাল খারাপ। পিয়ের কি ভাবে মরেছিলো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওর ক্যাপ্টেন চিঠি লিখেছিলো। ওর এক বন্ধু—খাবারের সেলসম্যান, সে এখানেও এসেছিলো। ছেলেটার বেশি বুদ্ধি নেই। যত আজেবাজে কথা বিশ্বাস করে। যাকগে, সেটা তার ব্যাপার। মোট কথা, দুর্ঘটনায় পিয়েরের মৃত্যু ঘটেছে সে নিজের চোখে দেখেছে। আর এটাতে এমন কি তফাৎ হচ্ছে! ঐ যে লোকটা আগে বিস্কুটের কারবারে কাজ করতো, এখন সরকারি চাকরি করে, সেও তো সহযোগী। বার্থ তার কথা টেনে এনে গ্রেগোয়ারের সঙ্গে তর্ক করে। বার্থের বুদ্ধি আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত কথায় মঃ পিকের গায়ে আঁচড় লাগে না। আসল কথা—প্রশ্ন বুঝতে পারা, আসল প্রশ্ন। খেলার খবর শোনার দরকার নেই। বোতাম ঘোরাতে হালকা বাজনার সুর শুনতে পাওয়া গেলো। রেডিও রোম বোধ হয়, ইতালিতে ভালো অর্কেস্ট্রা আছে।

ঐ লোকটা...যাকে'বড় ঘোড়া' বলা হতো···কি যেন নাম · ও তো পুরোপুরি সহযোগিতার পক্ষে। যুদ্ধের আগে ওর অন্যরকম মতামত ছিলো। প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পাশ করেনি। এমনিতে ও কখনই সরকারি চাকরি পেতো না। যুদ্ধবিরতির পর ওর দাবিদাওয়ার ব্যাপারে ওর মতামতের জন্য বেশ নাম ছিল। বদলাবার ফলে · নিশ্চয়ই ওর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কারণের গুরুত্ব আছে। অন্যরা সেকথা বলে, সহযোগিতার বিরোধিতা করতে। গ্রেগোয়ার তেমন নন। তাঁর বিচার নিরপেক্ষ। ঐ লোকটার ব্যাপার থেকে কি প্রমাণ হয়? ব্যক্তিগত কারণ ···ব্যক্তিগত কারণ ··জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতায় আমার কি ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারে? প্রজাতন্ত্রের সময় তো আমার অবস্থা খারাপ ছিলো না। সরকার যতই অপদার্থ হোক, আমি তো বেশ ভালোই ছিলাম। ঐ লোকটা যুদ্ধের আগে শান্তিবাদী ছিলো। তাহলে তো ওর পরিবর্তন আসলেপরিবর্তন নয়। প্রত্যেক ব্যাপারে তো একটা যুক্তি থাকবে! আগে ও হৈ চৈ করে শান্তি আনতো, এখন শান্তি বজায় রাখবে সহযোগিতা করে। ওর মতো আর কিছু লোক থাকলে ভালো হতো। ব্যক্তিগত কারণ সত্বেও সবাই মঃ কাতেলাঁর মতো হতে পারে না। ভদ্রলোক যুক্তির ধার ধারেন না। যতদিন সেনাবাহিনী ছিলো, তিনি ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে। অথচ সেনাবাহিনী এখন আর নেই বলে তাঁর মন ভেঙে গেছে।

বিরক্তিকর! সবসময় রেডিওর দিকে নজর রাখতে হয়। গান শেষ হতে না হতেই শুরু হয় বকবকানি।

আমি ঠিক ধরেছিলাম। এ-রেডিওটা সারানো যাবে না। ডিসয়ের লোকটা ঠিকই বলেছিল বটে! খরিদ্দার যা খুশি করুক। অন্য দোকানে যাক। কোথাও

কাজ হবে না, যদি না এমন একজনকে পায়, যার সঙ্গে কালোবাজারের লেনদেন আছে। আমি কালোবাজারি হতে যাবো কোন্ দুঃখে। সেই তো একদিন ধরা পড়ে জেলে যেতে হবে। এমনিতেই যথেষ্ট ভালো রোজগার করছি। আর এত কাণ্ড করতে যাবো কাদের জন্যে? যারা দিনে দশবার লণ্ডনের রেডিও শোনে? আমাকে কি গাধা মনে করো!

অবশ্য মঃ পিক একজন সৎ লোক। এমন কি পড়শিরা—ঐ যে লম্বিয়র গোঁড়া গলপন্থীরা[৫] সেকথা অস্বীকার করে না। এটাই মঃ রুবেরার, কাপড়ের দোকানের মেয়েরা আর বিশ্বসুদ্ধ লোক বুঝতে পারে না। একজন সৎ লোক কিভাবে সহযোগী হতে পারে? কেন, এতে অবাক হবার কি আছে? লোকে এমনই ভাবে বটে! যে তোমার মতো চিন্তা করতে পারে না, তার মতো শয়তান আর নেই। সে বাপ-মাকে খুন করেছে…ইত্যাদি।

'ইত্যাদি,'…জোরে কথা বলতে গিয়ে মঃ পিকের হাত থেকে একটা ছোট নাট মাটিতে পড়ে গেলো। সেটা আর খুঁজে পাওয়া গেলো না।

মঃ পিক মনে করেন,একজন ইংরাজদের সমর্থকও পারিবারিক জীবনে সৎ হতে পারে। ফ্রী মেস'দের[৬] মধ্যে যে ভালো লোক আছে, একথাও তিনি স্বীকার করতে রাজি আছেন। অবশ্য সবকিছুরই সীমা আছে। কম্যুনিস্টরা…তাদের কথা কে বলছে? শয়তানেরা শয়তান ছাড়া কিছু আর নয়।

'রেডিও অপেরা…'

তাহলে ওটা রোম ছিলো না। যাই হোক, ইতালিতে ভালো অর্কেস্ট্রা আছে। আজকাল বুদ্ধি থাকলে গলপন্থী হওয়া অসম্ভব, আমি এমন কথা কিছুতেই বলবো না। বোকা না হলে—ছোট—হ্যাঁ, ঠিক আছে! বোকা—দেশত্যাগীদের রেডিওর বক্তৃতা লিখে রাখার-মতো! তার জন্যে দরকার সেসব শোনা। একজন মেনে নিতেই পারে যে তার শত্রুরা চোর বা ঘুষখোর নয়…অন্তত সকলে নয়। কিন্তু বলা যে শত্রুর একটুও বুদ্ধি নেই…বুদ্ধি…বিদ্যুৎ…হ্যাঁ, বিদ্যুৎ যাচ্ছে…তাহলে…ভেবেছিলাম জাকো…বার্থ ওকে নিয়ে গেছে, না রেখে গেছে?

মঃ পিক তাড়াতাড়ি উঠলেন। তাঁর নাতি কোথায় গেলো? শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দোকানের পেছনে…রান্নাঘরে…মঃ পিকের বুক কেঁপে উঠলো। ছেলেটা নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টুমি করছে। যা ভেবেছিলেন তাই। বার্থ উঠোনের দরজা খোলা রেখে গেছে। জাকো উঠোনে নেই। রাস্তার দিকের দরজা খোলা, যে-দরজাটা আপনি থেকে খুলে যায়। বাচ্চাটা ফুটপাথে বল খেলছে।

'জাকো, ওখানে কি করছিস? গাড়ি এলে…!'

ছোট হাতটি দাদুর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো।

'না, না…বল খেলবো, দাদু!'

দাদু একেবারে গলে গেলেন। কিন্তু ভয়ও হচ্ছিলো। ছেলেটা লম্বা হয়েছে বটে,

গায়ে জোরও হয়েছে। ভারি দরজা একা খুলে রাস্তায় গেলো…আজকাল আগের মতো গাড়ি চলে না—তাই বাঁচোয়া।
'তোর খেলনা নিয়ে এখানে লক্ষ্মী হয়ে বস্। শোন্, কেমন সুন্দর গান।'
কিন্তু ছোট্ট দেবদূতটি দাদু কাজে ডুবে যাওয়া মাত্র সবকিছু নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলো। কয়েকটা জিনিস খুব সশব্দে পড়লো। দোকানের অন্যদিক থেকে আশ্চর্য ভয়াবহ শব্দ ভেসে এলো। কি করে এরই মধ্যে ছেলেটা ওখানে চলে গেলো? বার্থকে বলা উচিত ছিলো, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। দুষ্টুটা ভারি সুন্দর! হতভাগা মা-টার চেহারা পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মিল পিয়েরের সঙ্গে। পিয়েরেও ছোটবেলায় এমন দুরন্ত ছিলো। চমৎকার স্বাস্থ্য, গায়ে ছিলো বেশ জোর।
পিয়ের বেঁচে থাকলে কি ভাবতো? আমি যা ভাবি, তাই। কেন নয়? ওর বুদ্ধি ছিলো। হয়তো ওর অন্যরকম মত হতো। তার মানে এই নয় যে ও গলপন্থী বনে যেতো। আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতেই পারতো নিশ্চয় বেশি নয়· লোকে তো ঠিক একরকম চিন্তা করে না। যুক্তি মেনে চললে, আমি যা ভাবি ও তাই ভাবতো। তবে যদি ওর মতামত অন্যরকম হতো ··কিন্তু এসব কথা ভেবে কি লাভ? বেচারা তো মারাই গেছে!
'জাকো সোনা, তোর খেলনা নিয়ে খেলা কর।'
কেবল বোকারাই ভাবে সবকিছু তাদের পছন্দমতো হবে। হয়তো পিয়ের আমার মতো চিন্তা করতো না। তাতেই বা কি এসে যেতো? যা সত্যি তা সত্যিই, এক আর একে দুই-ই হবে, এমন কি পিয়ের যদি…
তবু ব্যাপারটা খুব সুখের হতো না। আগে পরিবারের মধ্যে মতের অমিল হলেও এমন কিছু এসে যেতো না। আমাদের পুরোপুরি মিল ছিলো। কিন্তু না থাকলেও···আর এখন···এমনিতেই প্রতিবেশীরা সকলে আমার ওপর চটা। যারা মনেপ্রাণে সত্যিকারের ফরাসী, ইংরেজ রেডিও তাদের ভয় দেখায়। এক জন আছে যে কর্নেলের গলা শুনলেই ভয় পায়। আমি একবার শুনেছিলাম·· ওরা যদি জেতে, মজা দেখিয়ে দেবে। বলশেভিজমের কথা ছেড়েই দিলাম। ওদের জয় অসম্ভব, তাই রক্ষা! একেবারে অসম্ভব নয়, তাই যা করার তা করতে হবে। না, অসম্ভবই বলা যায়।
'জাকো সোনা, কোথায় গেলি? ছেলাটা যা দুষ্টু হয়েছে! নাঃ, বাচ্চা রাখা আমার কম্ম নয়। সব জায়গায় টেপ ছড়িয়ে ফেলেছে দেখছি!'
সব আবার ঠিক করে রাখতে একটু সময় লাগলো। তারপর মঃ পিক জাকোর ছোট ছোট সুন্দর, ধুলোমাখা হাত ধুইয়ে দিলেন। জাকো সাবানজলে হাত নেড়ে হাসলো। কি সুন্দর ফর্সা হাসিখুশিছেলে! ওর জন্যে যুদ্ধের আগেকার ভালো সাবান কেনা হয়েছে।
তা বলে পিয়ের সবকিছু বিশ্বাস করার মতো বোকামি নিশ্চয়ই করতো না।

লোকে কি না বলে ! গত যুদ্ধের সময় যেমন বলা হতো, জার্মানরা বাচ্চাদের হাত কেটে দিচ্ছে। যতদিন যুদ্ধ চলেছিলো ততদিন এসবই রটতো। কেউ আপত্তি করলে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হতো। শান্তির সঙ্গে সঙ্গে জার্মান-নিষ্ঠুরতার সব গল্প বন্ধ হয়ে গেলো। এখন একই ব্যাপার। যারা দেশ দখল করেছে তারা সব শয়তান। লোকজনের ওপর নির্যাতন করছে, গুলি করে মারছে, মার কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নিচ্ছে, হাসপাতালে রোগীদের শেষ করে দিচ্ছে। আরও কত গালগল্প বানানো হচ্ছে তার হিসেবই নেই। শুধু জার্মানদের নয়। আমাদের—ফরাসীদের বিরুদ্ধে একই রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বন্দিশিবির···জেল···নখে পিন-ফোটানো···আরও সব নির্যাতন। ওদের কথা সত্যি হলে তো বলতে হবে মার্শালের' পুলিশ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আর ইংরেজরা যে ওয়াশিংটনের ইহুদিদের খুশি করতে দু'-বেলা আমাদের শহরের ওপর বোমা ফেলছে ! হাসপাতাল, স্কুল, কিন্ডারগার্টেন···সব ছারখার করে দিচ্ছে ? সে-বিষয়ে তো একটা কথাও নেই ! না, পিয়ের কখনও এমন বোকা হতো না।

একটা চিন্তা মাথায় এলো।

'ত্যাকো সোনামণি, এই ছবির বইটা দেখ। এই যে বাঘ, সিংহ, ছোট্ট ভেড়া, দুষ্টু নেকড়ে। বাচ্ছাটা এমন ছবি ভালোবাসে ! এবার অন্তত পনেরো মিনিট শান্তি পাবো।'

অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজলো। দরজা বন্ধ নেই।

'দরজা বন্ধ করুন।'

আগন্তুক ইতস্তত করলো। স'াড়াশি কিনতে এসেছে।

'না মশাই, আমার দোকানে ও-জিনিস নেই।'

আগন্তুক ফিরে গেলো। ওর চেহারা অনেকটা মিশেল সিম'র মতো। কিন্তু খামোকা রেডিও-মেরামতের দোকানে তুলো-ধরার স'াড়াশি কিনতে এলো কেন ? আজকাল লোকদের মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। তুলো-ধরার স'াড়াশি। সত্যিই কেউ তা দিলে এখনই বিনা বাক্যব্যয়ে নিতো। কত দাম জিগেস করতো। লন্ডন রেডিওর পোয়াবারো ! এসব লোকগুলো চোখের সামনে বলশেভিকদের দেখলেও চিনতে পারবে না। না, চিনতে পারছে বইকি ! তাদের সঙ্গে মহরম-মহরম চালাচ্ছে। ঐ তো সেদিন কাপড়ের দোকানে মেয়েরা বললো, হিটলারের চেয়ে স্তালিন ভালো। কল্পনা করা যায়—স্তালিন ওদের দোকানে দু'পয়সার তুলো কিনেছেন ! হ্যাঁ, স্তালিন আসতে পারেন বইকি, অবশ্যই নিজে নয়। কিন্তু হিটলার হেরে গেলে এই মেয়েদের দশা কি হবে ? কিন্তু তা হবে না। মঃ লাভাল বলেছেন যে ঐ নেতাকে সে চিরকাল বিশ্বাস করেছে। উনি কখনও ভুল করেননি—চিরকাল লড়াই চালিয়েছেন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। উনি গোড়াতেই বুঝেছিলেন যে মুসোলিনি আসলে শান্তিকামী।

আবার বেল বাজছে। কে এলো ?

'মাদাম, দরজা বন্ধ করুন।'

সকলেই দরজা খোলা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

'জাতীয় সেবা সংঘের জন্যে—আপনার পুরোনো কাপড়।'

'মাদাম, পুরোনো কাপড় কোথায় পাবো ? এটা রেডিও মেরামতের দোকান, বিছানা তৈরির নয়।'

শেষ অবধি দশ ফ্রাঁ দিতে হলো। মহিলাটির ফ্যাকাসে চেহারা, চাপ্টা বুকে অনেক ব্যাজ লাগানো।

জাকোর দিকে তাকিয়ে তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, 'কি সুন্দর বাচ্চাটা ! কেমন লক্ষ্মী হয়ে বসে আছে।'

সত্যিই জাকো খুব মন দিয়ে ভেড়ার ছানার ছবি দেখছিলো। সে উজ্জ্বল চোখ তুলে দাদুর দিকে তাকালো। বুট পরা বেড়ালের ছবি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'এটা কি ?' ওর জানতৃষ্ণা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। পুরো গল্পটা অনেকবার শোনা। তবু দাদু ওকে কোলে নিয়ে আবার শুরু করলেন।

'সেসময় পৃথিবীতে এখনকার মতো শান্তি ছিলো না। ছোট ছেলেরা ডাকাত আর মানুষখেকো রাক্ষসদের ভয়ে রাস্তায় খেলতে পারতোনা। গ্রামে সব হিংস্র নেকড়ে চরে বেড়াতো, তাদের দাঁত ছিলো লম্বা…' ইত্যাদি।

'ও লক্ষ্মী হয়ে ছিলো তো ?' মাদাম পিক ফিরে এসে জিগেস করলেন।

'ছবির মতো আসলে ছবিগুলোই…,'মঃ পিক ভয় পেয়ে থেমে গেলেন। 'কি হয়েছে বার্থ ? তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ?'

সত্যিই বার্থকে খুবফ্যাকাসে দেখাচ্ছিলো। পরনে বহুবার-কাচা সাদা পোশাক, তার ওপর ছাপা ফুল। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। তাঁর হৃৎকম্পন অনুভব করা যাচ্ছিলো। জাকোর জন্যে আনা মিষ্টি দু'হাতে জোরে চেপে ধরেছেন।

'ভীষণ ব্যাপার ! আবার বোমা '

তার জন্যে এত বিচলিত হবার কি আছে। তবে ব্যাপারটা সাংঘাতিক ঠিকই।

পিক প্রশ্ন করলেন, 'কোনো জার্মান মরেছে ?'

'হ্যাঁ, দু'জন। বেচারা ! কিন্তু সেটা আসল কথা নয়।'

'বলো কি ? বেচারা ছেলেদুটোকে ওরা মেরে ফেললো, আর সেটা আসল কথা নয় ?'

'ফারের দোকানদার, মঃ লেপাজ, আজ রাতে ওকে, স্ত্রীর আর মেয়েকে গেস্টাপোরা৮ ধরে নিয়ে গেছে।'

মঃ পিক অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। 'তার মানে ? দুজন কমবয়সের ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে, তারা কেবল কর্তব্য করেছিলো বলে। আর এসব লোক ষড়যন্ত্র করছিলো। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। এতেই তুমি পাগল হয়ে গেলে ?'

বার্থ ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারলেন না। লেপাজদের ঘরে কোথায় নিয়ে গেলো কেউ জানে না। মাদাম লেপাজের বাবা খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়, নিজের চরকায় তেল দিতে। এটা তাঁরই গরজ, এ-উত্তরে কাজ হলো না। জার্মানরা তাঁকে চুপ করতে বললো। ফরাসীরা জানালো, এটা তাদের ব্যাপার নয়।

বার্থের স্বামী বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমরা বোমা ছুঁড়বে, তারপর দোষ দেবে জার্মানদের। এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?'

বার্থ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপাতত রোজ আটটা থেকে কার্ফিউ হবে। আজ থেকে শুরু। খুশি হলে তো?'

'কার্ফিউ?' গ্রেগোয়ার চমকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন খুব তাড়াতাড়ি। কার্ফিউ তো আটদিন অন্তর অন্তর হয়ই। তাতে হয়েছে কি? আসলে তিনি চমকেছিলেন বার্থের কথায় অভিযোগের সুরে। অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? বোমা ফেললে কার্ফিউ হবেই, এ তো জানা কথা। এতে জার্মানদের দোষ কোথায়? যুক্তির বালাই নেই।'

তিনি আপসের সুরে বললেন, 'ব্যাপারটা বিরক্তিকর ঠিকই। আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাবো ভাবছিলাম। সিনে দ্য লারে একটা জার্মান ছবি চলছে—'ইহুদি সুস'[৯]। গত বছর যখন ছবিটা শহরে এসেছিলো, দেখা হয়নি। শুনেছি খুব ভালো হয়েছে। চমৎকার অভিনয়। যাকগে, কি আর করা যাবে। মরে তো আর যাবো না। যুদ্ধে এসব হবেই। কিন্তু তুমি কার্ফিউ হলে, যা একটু অসুবিধে হলেই জার্মানদের শাপ শাপান্ত করবে?'

'নিশ্চয়ই।' বার্থের গলার স্বরে আন্তরিকতা।

'ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনলে আমাদের কি অবস্থা হবে। লন্ডনের হুকুম শুনে আমাদের মাথাগরম ছেলেরা রিভলবার ছুঁড়বে। তার চেয়ে মাঝে মাঝে কার্ফিউ ভালো। অথবা যদি আমার দোকানে জনকমিশনার ঢোকে?'

'তোমার দোকানে জনকমিশনার কি করতে আসবে?'

'বোকা সেজো না। তুমি আমার কথা ভালো করেই বুঝতে পারছো। যাকগে, অন্য কথায় আসা যাক। তুমি যাবার দশ মিনিট পরে, আমি ভাবছি জাকো শান্ত হয়ে বসে আছে, এদিকে…'

'এদিকে এসো, আমাকে এখন রান্না করতে হবে। লেপাজের ব্যাপারে দেরি হয়ে গেলো। মিষ্টির দোকানদার বলছিলো, লেপাজের মেয়ের নাকি প্যারাশুটার-দের[১০] সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো।'

'প্যারাশুটার! দেখছো তো? লোকগুলো ভালো বলতে হবে। যা শোনা যায় সব যদি বিশ্বাস করা যেতো। প্রথম কথা, প্যারাশুটার বলে আসলে কিছু নেই। ওসব ছেলেভোলানো গল্প। ফারের দোকানদার গুপ্তচর, আর ওর স্বভাব-চরিত্র খারাপ।'

'কি যে বলো ! ও খুব ভালো মেয়ে।'

'তুমি ওর দিক টানছো ? তোমার মেয়ে থাকলে,তুমি কি তাকে প্যারাশুটারদের সঙ্গে মিশতে দিতে ? না। তবে ? যুক্তির বালাই নেই। আর আমি যখন আমানদের ভালো বলি, বলি যে তারা যা দরকার তাই করছে, সে-বেলা ? তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ক্ষেপে গেছো।'

'ঠিক তা নয়, তবে বিরক্ত লাগে।'

'ঐ হলো। তুমি ক্ষেপে যাও। অথচ কারের দোকানদারদের মেয়ে প্যারাশুটারদের নিজেদের বিছানায় ডেকেছে বলে তুমি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'তোমাকে কে বললো যে বেচারা মেয়েটা তাদের নিজের বিছানায় ডেকে নিয়েছিলো ?'

'মেয়েটা বেচারাই বটে। তুমিও। হুঁ, যুক্তির তো বালাই নেই। নিজের বিছানায় নয় তো কি ওর মার বিছানায় ডাকবে। আমাদের সময় তো বিছানায় এসব হত। এমনকি আর কোথাও··কি হয়েছে, জাকো ?'

জাকো মিষ্টি খুঁজছে।

'এখন না, মানিক, খাবার পর। নইলে খিদে হবে না। গ্রেগোয়ার, তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না। মেয়েটাকে তুমি ভুল বুঝেছো। তাছাড়া সাতটা বাজলো, এখনও রান্না শুরু করিনি।'

'মিষ্টি—মিষ্টি !'

জাকো তার ঠাকুমার সঙ্গে চলে গেলো। এর মধ্যেই সাতটা বেজে গেলো। বেল বাজলো, আবার দোকানের দরজা খুলে গেলো।

মঃ পিক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দরজা বন্ধ করুন। কি চাই ?'

'রঙ কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন।'

এটাই বাকি ছিলো। তাও আবার সন্ধ্যা সাতটায়। লোকটার গলার স্বর অনেকটা রেমুর মতো। মিশেল সিম', তারপর রেমু—সব সিনেমার নায়ক, আরও কে আসবে।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে হবে। না হলে এরপর এখানে জুতোর ফিতের খরিদ্দার আসবে। তবু চৌকাঠে মঃপিক একটু দাঁড়ালেন। আবহাওয়া এখন ভালোই। গরম, কিন্তু এ-সময়ের পক্ষে বেশি গরম নয়। কালকের বৃষ্টির পর অনেকটা গুমোট কেটে গেছে। উলটোদিকের মুদিখানার মালিকানির সঙ্গে কথা বলে পিক খুব মধুর উত্তর পেলেন না। মাদাম সেজাভিনেৎ এ রকমই বটে। ওদিকের লন্ড্রি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে। রাস্তাটা বেশ শান্ত। ট্রাম-টার্মিনাসে গত ছ'মাস ট্রাম আসে না। একজন পাগলের মতো সাইকেল চালিয়ে চলে গেলো।

লন্ড্রির মালিক বলে উঠলেন, 'দেখলেন মঃ পিক, আজকাল মোটর চলছে না বলে ছেলেছোকরা যা খুশি তাই করে। আপনার নাতি কতবার এখানে

বেরিয়ে এসে খেলে।'

'আর বলবেন না, মঃ ব্রাঁ। এসব ছেলেদের জার্মানিতে পাঠালে ভালোই হয়,' গ্রোগোয়ার মুরুব্বীয়ানার সুরে বললেন। যারা ঠিক তাঁর নিজের শ্রেণীর নয়, তাদের সঙ্গে তিনি সেই ভাবেই কথা বলেন।

'আমি তা বলতে চাইনি।

মঃ ব্রাঁ হঠাৎ সরে গেলেন। নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে ভেতর থেকে ডাকছিলো। মঃ পিক মাথা নাড়লেন। ছেলেদের জার্মানিতে পাঠানো হয়, এটা তো ঠিক। ভালো না লাগলে কি হবে! আর ছেলে-ছোকরাদের একটু শৃঙ্খলা শেখালে মন্দই বা কি! আগে তো সেনাবাহিনীতে শিক্ষানবিসিরব্যবস্থা ছিলো। এখন জার্মানিতে ব্যবস্থা হচ্ছে। না হলে অকর্মা আর গুণ্ডার দলে দেশ ছেয়ে যেতো। আমাদের বরং জার্মানদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

মঃ পিক রাস্তায় একটু ঘুরে এলেন। সেখানেও ষোল-সতেরো বছরের ছেলেরা বেঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কথা বলছে। পিকের যা মনে হলো, তা আর বললেন না। একটা থামে আটাকানো মিলিসের[১] বিজ্ঞাপন পড়লেন। না, আল বিপদের কমতি নেই। নইলে কাগজের ঘাটতি সত্বেও এরা এত বিজ্ঞাপন দেবে কেন। তাছাড়া অল্পবয়সী ছেলেদের দেখলেই বোঝা যায়। সেদিন বল-শেভিক-বিরোধী প্রদর্শনীতে গিয়ে যা দেখেছিলেন, তার তুলনা নেই। ওদের জেলখানায় বসাও যায় না। এসব তো বানানো গল্প নয়!

সেই কথাই মঃ পিক মঃ রবেরারকে বললেন। রবেরার মাথা থেকে লোহার টুপি সরিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলছিলেন —আবহাওয়ার কথা, কার্ফিউর কথা, যা সকলেই বলছে। যে-নাচের আসরে দু'জন জার্মান মারা গিয়েছিলো সেখানে নাকি একজন ফরাসি মেয়েও আহত হয়েছিলো। সকলে বলছে, বেশ হয়েছে। ওর কি দরকার ছিলো শত্রুদের সঙ্গে নাচতেযাওয়ার। মঃ রবেরার বয়স্ক মানুষ, একটু ভীরু। গোঁফে পাক ধরছে, চিবুক দেখা যায় না। তিনি খুব খোলাখুলিভাবে কথাগুলো বললেন না। কিন্তু পিক আসল কথা বুঝে একটু বিরক্ত হলেন। তবে রবেরার সর্বদা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এসেছেন। অন্য পড়শিদের সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক নেই।

'কেন মঃ রবেরার, আমরা দু'জনই তো উনিশ সালে রাইনল্যান্ডে ছিলাম। সে সময় কোনো মেয়ে আমাদের সঙ্গে নাচলে কি আমরা খুশি হতাম না? তবে একটা যুক্তি থাকা চাই।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ও-দেশে মেয়েরা আমাদের সঙ্গে নাচলে, জার্মানরা তাদের মাথা নেড়া করে দিতো।'

'সবদেশেই কিছু মাথা-গরম লোক আছে। তার থেকে কি প্রমাণ হয়?'

'না, না, আমি কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। কেবল কথার কথা···জার্মানরা যা করছে, আমরা তার সব করলে আর দেখতে হতো না।'

'আমরা ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।'

'জার্মান ভাষা শিখতে পারি। না, আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

পিকের এ-ঠাট্টা ভালো লাগলো না। ফরাসীরা যখন জার্মানির এক অংশ দখল করেছিলো, সেসময়কার কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি তখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে গডেসবার্গে ছিলেন। আর ভিসবাদেন···সুন্দর শহর! তখন তাঁর দিকে লোকে বোমা ছুড়লে কি তিনি খুশি হতেন? কি কোনো সৈন্যের বুকে ছুরি বিঁধলে কম্যান্ডার তা পছন্দ করতেন।

'যুক্তি থাকা চাই,' তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন।

মঃ রবেয়ার জানতেন না যে পিক রাইনল্যান্ডের কথা ভাবছেন। তাঁর নীল চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'কি বলছেন?'

'না, বলছিলাম কি, সব জিনিসের একটা যুক্তি থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

রান্না শেষ হয়নি। খেতে বসতে আটটা বাজলো। আজ শুক্রবার, খাবার খুব বেশি নেই। বার্থ কি-একটা রেঁধেছে…ডিম পেলো কোথায়? কালো-বাজারে কিনেছে নাকি? কালোবাজারে কিছু কিনলে বার্থ সে-কথা স্বামীকে বলেন না। শুনলেই গ্রেগোয়ারের খাবার আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমি কালোবাজারি করতাম? যদি সকলেই তাই করতো, তবে দেশের অবস্থা কি হতো? অনেকেই করে বইকি, সবাই করে। ভাগ্যিস জার্মানরা আছে!

বার্থ বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি কি মনে করো, জার্মানরাও একটু-আধটু কালোবাজারি চালায় না?'

পিক ইতস্তত করলেন। একথা মেনে নেওয়া মানেই এক বিশেষ দলকে সাহায্য করা। কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। মঃ লাভাল এ নিয়ে ইঙ্গিতেও দিয়েছিলেন। হাজার হোক, জার্মানরা দেবতা নয়—মানুষ, এমনকি একটু…

'হ্যাঁ, আমি বলছি না ওরা করে না, তবে ওরা করলে ঠিক কালোবাজার বলা যায় না।'

জাকো কিছু খাচ্ছে না।

'লক্ষ্মী, এইটুকু খেয়ে নাও। দাদুর জন্যে এক চামচ, ঠাকুমার জন্যে এক চামচ, বাবার জন্যে এক চামচ। আহা, তোমার বাবা…'

ছেলেটা কি সুন্দর! ফর্সা রঙের নিচে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। ঐ চোখ তুলে তাকালে, ছোট নরম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, ওকে মিষ্টি না দিয়ে পারা যায়!

'যাও, খেলা করো।'

জানলা দিয়ে ওঁরা দেখলেন, জাকো উঠোনে বল নিয়ে খেলছে। সুন্দর ছোট

রবারের বল। জাকো এখনও ভালো করে খেলতে পারে না। বলটা যার বার যে-কোনো জায়গায় ছোঁড়াটাই মজা। জাকোর হাসির শব্দে শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আরও মিষ্টি হয়ে উঠছিলো। বাগান থেকে ভেসে আসছিলো ফুলের সুন্দর গন্ধ।

গ্রেগোয়ার বললেন, 'রাস্তায় মঃ রবেয়ারের সঙ্গে দেখা হলো। ওর কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি?'

এটাই বার্থের ভয়। মঃ রবেয়ার চিরকাল খুব ভদ্র। সে যদি একদিন গ্রেগো-য়ারের সঙ্গে ভালো করে কথা না বলে, তবে বুঝতে হবে অবস্থা খারাপ।

'না, না, তা নয়। তবে এমন আজেবাজে কথা বললো।'

মাদাম পিক স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'হয়তো ও গলিজমের দিকে ঝুঁকেছে। তুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবে নাকি? ও, ভুলেই গিয়েছিলাম —কার্ফিউ!'

'বাড়িয়ে বলছো। রাস্তায় না বেরলেই হলো!'

'তাই নাকি? আচ্ছা আমি দেখছি, অবস্থাটা কি রকম!'

রবেয়ারের কথাগুলো গ্রেগোয়ার যত ভাবছিলেন তত আশ্চর্য মনে হচ্ছিলো। ও রকম ঠাট্টা মোটেই সুবিধার নয়। বুড়ো বয়সে লোকটার ভীমরতি হয়েছে। বার্থ খুব উত্তেজিত অবস্থায় ফিরে এলেন। না, দরজার বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই। সবকিছু বন্ধ। উনি একতলার জানলা থেকে দেখেছেন। রাস্তায় জার্মানরা ছাড়া কেউ নেই।

'জার্মানরা। এখানে, এ-রাস্তায়?'

'হ্যাঁ, জনা বিশেক হবে। রাস্তার মোড়ে ভিড় করে রয়েছে, পথ বন্ধ করে। হাতে বন্দুক। রাস্তার ওদিকটায় কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'এখানে?'

মঃ পিক আর কিছু বললেন না। ভেবে দেখলেন, তাঁর নিজের ব্যবহার অর্থ-হীন। জার্মানরা যখন দেশে রয়েছে, এই শহরেই রয়েছে, তখন তাঁর বাড়ির পাশে থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? না থাকার কোনো কারণ নেই। সকলে যাতে কার্ফিউ মেনে চলে, ওরা তাই তদারক করতে এসেছে। রাস্তায় তিনি যেসব ছেলেদের ঘুরতে দেখেছিলেন, মঃ পিকের তাদের কথা মনে হলো। 'এর থেকে কিছুই প্রমান হয় না।'

তবু ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগলো না। কিন্তু বার্থেরও ভালো লাগছে না দেখে ইচ্ছে করেই উলটো সুরে ধরলেন। প্রমাণ করলেন যে জার্মানদের উপস্থিতি সব দিক থেকে ভালো। ওরা রয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

'কিছু হলে ওরাই আমাদের বাঁচাবে। চারদিকে গোলমাল চলছে। যতসব বাজেবাজে লোক

একটু ভেবে আবার বললেন, 'আমি উঠোনে গিয়ে সিগারেট ধরাবো জাকোকে নিয়ে।'

জাকো পা দিয়ে বল ঠেলা শিখছেলো। মানব প্রতিভার নতুন আবিষ্কারের ফলে যেমন উৎসাহ হয়, তার তেমনি উৎসাহ হচ্ছিলো। বল ছুঁড়ছিলো ডাইনে। বাঁয়ে। কিছুক্ষণ একটা ছোট্ট সবুজ-হলদে মেশানো কাঠের গাড়ি তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। গাড়িতে কয়েকটা পাথর জড় করা রয়েছে। জাকো ঘাড় ধরে গাড়িটা টানতে লাগলো। সে যেন ট্রেনের ইঞ্জিন।

ঠাকুমার চোখে স্নেহ উপচে পড়ছে। সত্যিই ছেলেটা এত মিষ্টি!

'আমি যখন পঁচিশ নম্বর রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে গড়েসবার্গে ছিলাম…' মঃ পিক পুরনো দিনের গল্পে ফিরে গেলেন। প্রত্যেকবার ধোঁয়া ছাড়ার পর তিনি এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন এই প্রথম সিগারেটটা দেখলেন।

জাকোর আর গাড়ি নিয়ে খেলতে ভালো লাগছিলো না। সে আবার বল নিয়ে ছোড়াছুঁড়ি আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো। বলটা দরজার নিচে গড়িয়ে গিয়েছিলো, যে-দরজা আপনি থেকে খুলে যায়। জাকো ছুটে গেলো। হঠাৎ তার পা লেগে ছিটকিনি খুলে গেলো। কি হয়েছে ভালো করে না বুঝেই জাকোর দাদু দরজার দিকে ছুটলেন।

কিন্তু যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নয়। জাকো ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে বল কুড়োচ্ছে। গলির মধ্যে মঃ পিক কেবল দেখতে পেলেন একজন লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ জার্মান সৈন্য। বন্দুক তুলে সতর্কভাবে বাচ্চাকে তাক করে সে গুলি ছুঁড়লো। দেখা গেলো তার হাতের টিপ অব্যর্থ।

অনুবাদ / সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

১ জার্মানির দখলে ফ্রান্সের যে-অংশ ছিলো, সেখানে ইংরেজ রেডিও শোনা ছিলো নিষিদ্ধ।

২ ফ্রান্স এ সময় পরাধীন ও মুক্তঅঞ্চলে বিভক্ত ছিলো। কিন্তু মুক্ত-অঞ্চলেও জার্মান প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিলো।

৩ লিলি মার্লেন : বিখ্যাত জার্মান গান।

৪ লিজন : এক দক্ষিণপন্থী সংগঠন।

৫ সেনাপতি দ্য গল ফ্রান্সের প্রতিরোধ-যুদ্ধের এক নেতা ছিলেন।

৬ ফ্রাঁ মেস' : এক উদারপন্থী গুপ্তসমিতি।

৭ মার্শাল পেতা : জার্মানদের সহযোগিতায় ফ্রান্সের মুক্তঅঞ্চল শাসন করতেন।

গেস্টাপো : হিটলারের নিজস্ব পুলিশবাহিনী, যার কুখ্যাতি সর্বজন-বিদিত।

৯ ইহুদি সুস : নাৎসি জার্মানিতে তৈরি কুখ্যাত ইহুদি-বিদ্বেষী চলচ্চিত্র

১০ জার্মানদের দখল-করা দেশে মিত্রশক্তি প্যারাশুটার পাঠাতো।

১১ মিলিস : কুখ্যাত ফরাসী সংগঠন, নাৎসিদের সহযোগী।

তার বোন ছিল খবরের কাগজে টাইপিস্ট—মেয়েটার বেশ সাহস আর কর্তব্য-জ্ঞান—সেই ইভনের। সুশ্রীই তাকে বলা চলে, যদিও ছোট নাকটা একটু উঁচুতে ওঠানো। চোখ দুটো বড় বড় আর নীল। আমি তার সঙ্গে প্রেম করতে পারতাম, কিন্তু তার স্বভাবে চপলতা ছিল না, আর আমি বিয়ে করা—তাদের একসঙ্গে আমি প্রথম দেখি ভেল দিভ-এ। আমি খেলাধুলোর ভক্ত নই, তা সত্ত্বেও স্পোর্টস-রিপোর্টারের সঙ্গে আমাকে পাঠাবেই যত সব বড় টুরে, ফুটবল, রেস ইত্যাদিতে—ওদের নাকি খেলার আবহাওয়াটা চাই। 'তোমাকে গোটা পঁচিশ লাইনের একটা ভূমিকা লিখে দিতে হবে, ক্যালেপ।'

এই নামটা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমার নাম হল পিয়ের ভাঁদের-মাল্যাঁ। আমি প্রথমে তামাশা করে সই করেছিলাম ক্যালেপ। করেছিলাম যে-সব হাঁদা লেখা আমার ডাইনে বাঁয়ে লিখতে হত সেগুলোর জন্যে। আমার আসল নামটা রেখেছিলাম ভালো করে লেখা গম্ভীর-সম্ভীর প্রবন্ধগুলোর জন্যে। কিন্তু হাঁদামিগুলোরই জয় জয়কার হল এবং ক্যালেপ হয়ে উঠল বিখ্যাত, আর পিয়ের ভাঁদেরমাল্যাঁ ক্রমে ক্রমে ক্যালেপের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জীবনটা যে কি !

তা বছর দশেক আগে ভেল দিভেই দেখা। ছয় দিনের মধ্যে একটা সন্ধ্যায় কড়া বেগনি আলোয় সাইকেল-চালিয়েরা ঘুরছিল তো ঘুরছিলই। আমি ঘণ্টাখানেক ধরে নিচে মাইক, টেবিল আর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে বসে ছিলাম। মঞ্চের উপর দিকের অংশ থেকে সত্যিকার ক্রীড়ামোদীর দল ঐ ভদ্র-লোকের উদ্দেশে নানা কটুকাটব্য করছিল। তারপর আমি উঠে গেলাম উপরে সাধারণ দর্শকদের জায়গায়। সেটা একেবারে ভরে গিয়েছিল সেদিন। আমার বেঞ্চি থেকে নিচে তাকিয়ে প্রথম সারির কাছাকাছি সেই দানোয়-পাওয়া ছোক-রাকে দেখতে পেয়েছিলাম—সে শূন্যে মুঠো ছুঁড়ে রেসের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল, তার পাশের মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল—আবহাওয়ার জন্যে আমার যা দরকার ছিল ঠিক তাই। আমি তাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করবার জন্যে যেই এগিয়ে গিয়েছি,অমনি পাশের সেই মেয়েটি আমাকে ডাকল। 'মসি-য়ো ক্যালেপ !' একেই বলে খ্যাতি। না, তা না। দেখলাম মেয়েটা আর কেউ নয়, সেই ইভন এবং তার পাশের পাগল ছোকরা হল তার ভাই এমিল দোর্যাঁ, ইস্পাত কারখানার এক মজুর। ইভনেরই মত তার নাকটা উঁচুতে ওঠানো, কিন্তু চোখ অমন সুন্দর নয়। তার বাদামি রঙের চুল থাক হয়ে লেপটে ছিল এবং তার কপালে মুক্তোর মতো ঘাম জমেছিল। চেঁচাতে পারে বটে ছোকরা। তার স্ত্রী রোজেৎ-এর সঙ্গে সে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। মেয়েটা ছোটখাট,

তার চুল কালো, চামড়া একটু শ্যামাটে, তাতে জায়গায় জায়গায় লাল ছোপ, চোখদুটো স্বচ্ছ। যদি সে একটু সাজগোজ করত, তাহলে তাকে বেশ সুন্দরই দেখাত। আর এমিল,সে আবার রেস নিয়ে মেতে পড়েছিল,জলের মধ্যে মাছের মত সে রেসের অন্ধিসন্ধিতে বিচরণ করছিল। আমি কস্মিনকালে এ রেসের কিছুই বুঝিনি। ও তাদেরই একজন যারা খেপে গিয়ে যা উৎসাহে উছলে উঠে রেসের পথের উপর টুপি ছুঁড়ে দেয় যদি-না ছুঁড়বার জন্যে চাবির গোছাটা হাতে থাকে (ওরা তারপর বাড়িতে যে কি করে ঢোকে তাই ভাবি)।

অতঃপর যেন ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা ঘটানো হত—সর্বত্রই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত, এমিলের সঙ্গে। একবার মেত্রোতে, আর-একবার ফ্রান্স চক্কর দেওয়ার রেসের শুরুতে শর্তমাইওতে, কত জায়গায় যে কি বলব! ও ছিল একেবারে সাইকেলপাগল। যেখানেই দু-চাকা চলছে সেখানেই ওর আবির্ভাব, সাইকেল-রেস দেখতে ওর ক্লান্তি নেই। আমার ওপর নজর পড়লেই চিনত। 'নমস্কার, মঁসিয়ো ব্ল্যলেপ।' আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম আমাকে ভাঁদের-মাল্যাঁ নামে ডাকতে, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

কথাবার্তা হত। ও সে সময় কাজ করত কোদ্র্ কারখানায় মিস্তির কাজ। রোজ-গার ভালোই করত। মানে ও তাকে ভালো রোজগার বলত। দারুণ কাজের লোক। খাটাখাটিতে তার জুড়ি ছিল না। কারখানা থেকে বেরিয়েই ও সাই-কেল চেপে চলে যেত প্যারিসের অন্য প্রান্তে লিলা অঞ্চলে। সেখানে জানি না কিভাবে ও একটি মনমাতানো ছোট্ট বাগান করেছিল, তাতে ও তরিতরকারি আর ফুলের চাষ করত। ও বলত, কোদাল কোপালে ওর বিশ্রাম হয়। রবি-বারটা পুরোপুরি রেখে দিত সাইকেলটির জন্যে—মাদামকে নিয়ে প্যারিস থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরে চলে যেত। হয়ত বলত পিকনিক করতে যাচ্ছি, নয় বলত বিয়ে করার আগে যে কাফিখানায় তারা একসঙ্গে খেয়েছে সেখানে আবার খেতে যাচ্ছে।

ইভন আমাকে এক সন্ধ্যায় নিয়ে গেল তার ভাইয়ের বাড়ি। মাদাম দোর্য়াঁ তখন অন্তঃসত্ত্বা। এক সচিত্র সাপ্তাহিকের জন্যে—কি উদ্দেশ্যে জানি না, আমার ওপর ভার পড়েছিল রাস্তার লোকদের ইন্টারভিউ করার। রু্য পিপকুাস, বুলভার দে জিতালিয়ঁ্যা আর প্লাস মোবের-এ তিন-চারজন মূর্তিমানকে প্রশ্ন করে এমন সব বোকা-বোকা উত্তর পেয়েছিলাম যে আমার বিরক্তি ধরে গিয়ে-ছিল। তখন ইভন, প্রোতোপোপোফ নামে একজন ফোটোগ্রাফার (অবশ্যই সে এক জেনারেলের ছেলে) আর আমি এই তিনজন ক্যামেরা ফ্লাশলাইট সব নিয়ে উপস্থিত হলাম বুলোঞ-বিয়াঁকুর-এ সেই ছোট্ট আস্তানাটায়। সেখানে ছিল এমিল, রোজেৎ—সে তখনই বেশ গোলগাল হয়ে উঠেছিল, রোজেতের এক বোন ও তার স্বামী। লোকটা বেশ লম্বা, কটা চুল, বছর তিরিশেক বয়স, সে কাজ করত তার স্ত্রীর মতই র‍্যনো কারখানায়, এক রকম কামারের কাজ।

লোকটা একটু চুপচাপ ধরনের। এমিলকে কি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আমার মনে নেই, সে কি উত্তর দিয়েছিল তা-ও মনে নেই, তবে তার জবাবগুলো চমৎকার হয়েছিল। এক পাত্র করে মদ খেয়েছিলাম আমরা। ভায়রাভাইটির সঙ্গে আমি বেশ গলাবাজি করেছিলাম, কেননা লোকটা স্পষ্টতই ছিল কমিউনিস্ট এবং দু-তিনটে ব্যাপারে আমাদের ঠোকাঠুকি লেগেছিল। এমিল আমাকে জানিয়েছিল, বাচ্চাটা যখন জন্মাবে তখন সে একটা দুই-গদিওয়ালা সাইকেল কিনবে কিস্তিতে, তার ও তার স্ত্রীর জন্যে।

ঐ দু-গদির সাইকেলেই তাদের আমি আবার দেখলাম পরের বসন্তকালে সেন-তীরের শাঁপাঞতে দুরন্ত রোদের মধ্যে। 'ওঃ, মসিয়ো ক্যালেপ!' এমিল তার বাহনটির কলকব্জা গুণাগুণ আমাকে ব্যাখ্যা করল—আমি ভদ্রতা করে তাকে তার ভায়রার খবর জিজ্ঞেস করলাম। ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারির পর তখন সময়টা বেশ উত্তেজনাময়। কিন্তু এমিল রাজনীতির কথা এড়িয়ে গেল, সে তার গাড়ি নিয়ে বিভোর।

তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হল ম'লেরিতে মোটর সাইকেলের রেসে। কিন্তু এ রেস তার মতে একটা মেকি ব্যাপার, এর সত্যিকার কোন গুণ নেই। তার ইচ্ছে ছিল পারী-নিস সাইকেল রেসটা দেখার, কিন্তু কারখানার কাজ করে সে উপায় নেই। সেটা ১৯৩৫ সাল হবে। তারপর আবার কয়েকটা রাজপথে তার দু-গদির সাইকেলের ওপর। এখন তাদের বাচ্চা ছেলেটাকে একটা ছোট্ট চুপড়ির মধ্যে বসিয়ে সেটা সাইকেলের সামনের ডান্ডার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্বামী-স্ত্রীতে নিয়ে চলেছিল। বাচ্চাটা দেখতে ঠিক এমিলের মত।

তারপর আর একটা বাচ্চা হয়েছিল, একটা মেয়ে। সেটা ১৯৩৬ সাল, ধর্মঘটের সময়। আমি এমিলকে দেখলাম দখল-করা কারখানায় বুকে সেই অবিশ্বাস্য সভা-আসরগুলোর একটাতে। ঐ সব সভা-আসরে নামকরা শিল্পীরা আসত ধর্মঘটীদের সামনে গান গাইবার জন্যে। কোন বিদ্বেষ নেই, বেশ মজা পাচ্ছে, এই রকম একটা ভাব দেখলাম তার। 'এ কি, এমিল! তুমিও ধর্মঘট করলে?'
'ওঃ, মসিয়ো ক্যালেপ, সকলে যা করছে তা তো করতেই হয়, সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না।' নিশ্চয় এটা সেই ভায়রাভাইয়ের প্রভাব।

আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভেল দিভ-এ। সালোঁ দ্য লোতো-তে আবার সামনা-সামনি হলাম। কোন-একটা পারী-ব্রুবে রেসে তাকে ক্লিন্সিতে দেখলাম দূর থেকে, আমরা দুজন দুজনকে দেখে হাত নাড়লাম। তারপর দেখা আর-এক রেসে। আমি যে আহাম্মরি কাগজে কাজ করতাম, এ রেসের ব্যবস্থা করেছিল সেই কাগজ। আমাকে রাতারাতি রেসের পরিচালক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রেস শুরু হওয়ার জায়গায় আমি হাতে এক তেরঙা ফিতে বেঁধে একগাদা ব্যাজ উল্টো করে লাগিয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছি এমন সময় শুনলাম, 'ওঃ, মসিয়ো ক্যালেপ!'

এমিল এবং তার স্ত্রী, দুজনেই আগের মতই রয়েছে। তবে রোজেৎ একটু যেন ক্লান্ত। ওরা একটা স্প্যানিশ শিশুকে দত্তক নেবে বলে ঠিক করেছে. প্যারিসে কি তা নেবার অধিকার আছে? 'তোমারা আবার একটা বিদেশি বাচ্চাকে ঘাড়ে নিচ্ছ কেন, তোমরা তো রাজার হালে নেই?' রোজেৎ হেসে বলল, 'দুজনের জন্যে যখন জুটছে তখন তিনজনের জন্যেও জুটবে।' এবার নিশ্চয় এর পেছনে সেই ভায়রাভাইটি আছে, সে-ই ওদের মাথায় এটা ঢুকিয়েছে। 'তার খবর কি? অনেক দিন তাকে দেখিনি—ও, কগড়াঝাটি হয়েছে বুঝি?'...'না, তা না, সে স্পেনে রয়েছে, সে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছে'—এমিলের উচ্চারণ একটু অদ্ভুত, ফরাসিতে যে-জায়গায় দুটো শব্দ জুড়ে যায়, ও সেখানে আলাদা করে বলে। কিন্তু স্প্যানিশ বাচ্চাদের দত্তক নেবার অধিকার তো প্যারিসবাসীদের দেওয়া হয়নি। পরে ভ‍ঁ্যাসেনের বাসে আমি কথাটা এমিলকে আবার বললাম। সে মাথা নেড়ে বলল, 'দেওয়া উচিত ছিল—ওরা তো আমাদের জন্যে প্রাণ দিয়েছে।' এইসব লোক দেখি প্রচারকার্যে বেশ টলে যায়।

মিউনিক-চুক্তির সময় আমার ওপর ভার পড়ল রাস্তার লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি করার। এবারও নিরুপায় হয়ে এমিলের শরণ নিলাম। কিন্তু এবার এমিলের অংশটা ছাটাই করে দিল কর্তারা। সে যা বলেছিল তা হজম যায় না, এটা স্বীকার করতেই হবে। তা-ও তো আমি অনেক নরম-সরম করে দিয়ে ছিলাম। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে সৈন্যতলব পর্যন্ত আমি তার কথা আর বিশেষ ভাবিনি। কিন্তু মাজিনো লাইনের পেছনের সেই ঘাঁটিতে, মেস শহরের পাশে এক ছন্নছাড়া গেঁয়ো জায়গায়, তখন আমি এক পদাতিক দলে লেফটেন্যান্ট। একদিন অফিসার-ক্যান্টিনে রেডিও চলছিল, মরিস শেভালিয়ে গাইতে আরম্ভ করেছিলেন 'মিমিল', হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এমিলের মুখ,তার শক্ত চুলগুলো এবং উপরে-ওঠানো নাকটা। আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না দৃশ্যটা। এটা আমার বোকামি তো বটেই। এই সময় এমিল কোথায় রয়েছে? এবং সেই কমিউনিস্ট ভায়রা? স্পেন থেকে ফিরে এসে লোকটা নিশ্চয় খুব ঝঞ্জাটে পড়েছিল! আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটার সুযোগ কমে এসেছিল। আর সাইকেল রেস হত না, ইংল্যান্ডের রাজার সফর বা পোশাকের ফ্যাশন নিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে ইন্টারভিউও আর হত না।

তবু পুরো যুদ্ধের মধ্যে, মারামারির মধ্যে তাকে আমি আবার দেখলাম—এমিলকে। সেই যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানার ভেতরে। আমরা যখন এন এবং ওয়াজ-এ লড়াই করে ওপরওয়ালাদের হুকুমে সব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে এসে মনে মনে জ্বলছি, তারপর। তারিখটা ১২ই কি ১৩ই জুন হবে। আমি চোখের সামনে বরাবর তা দেখতে পাব। আর-এ এক ছোট শহর। চতুর্দশ লুইয়ের আমলেরএক কেল্লা রয়েছে, তাতে দীঘি,ফোয়ারা,ছাটা-গাছের ঘন নিশ্চুপ বীথি, বড় বড় পৌরাণিক মূর্তি। চৌরাস্তার খোলা জায়গাটা যেন চষা হয়ে যাচ্ছে,অন-

যত কনভয় চলেছে পেছন দিকে। গির্জার দরজায় কয়লার অক্ষর : 'কর্বেং দলেরা এখান দিয়ে গিয়েছে,' 'যার জন্যে আমরা আঁকের-এ চলেছি—'আর আমরা সেখানে রয়েছি সাঁজোয়া সৈন্য ও অন্যের ট্যাঙ্ক এবং বয়ে-আনা আহতদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে। জার্মানরা আর-র পথে এক কিলোমিটার, বড় জোর পনের শ মিটার দূরে রয়েছে। কতক্ষণ ওদের ঠেকানো যাবে ? কনভেন্টের সামনের রাস্তায় মেয়েদের ইস্কুলটা দখল করে বসেছে ডাক্তার ও নার্সরা ; ওদের সঙ্গেই আমাদের দুপুরে খেতে হবে, কেননা ক্যান্টিন—না, ক্যান্টিন বলে আর কিছু নেই। খুব গরম পড়েছিল, গুমট. সীসের মত ভারী একটা আকাশ মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে তার জলে ঘাসের রং ফিরে পাচ্ছিল, পর মুহূর্তেই তার মুখ আবার কালো হয়ে উঠছিল। উঠোনের ছোট গাছগুলোর তলায় একটা লম্বা কাঠের টেবিল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিল—ডাক্তাররা, কয়েকজন অফিসার এবং এক কোনায় ছোট অফিসাররা, নার্সরা এবং সেই সব আহত সৈন্য যাদের বসার ক্ষমতা ছিল এবং যারা অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কোন উঁচু-নিচু ভেদ ছিল না। শাদা উলের পোশাকে একটি ছোটখাট নার্স মস্ত একটা ক্যাপ পরে আমাদের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। সে প্লেট আনছিল, রাঁধুনিদের সাহায্য করছিল, অফিসারদের কথায় কথায় সেলাম ঠুকছিল এবং তার ফ্রকটা দুই হাতে তুলে এক কোণে গাদা-করা অস্ত্রগুলো টপকে টপকে হাঁটছিল।

জার্মান গোলন্দাজ-বাহিনী আমাদের মাথার ওপর দিয়ে কামান দাগছিল। ওরা নিশ্চয় রাস্তার ওপর, বেরুবার পথে গোলাবর্ষণ করছিল।

ওখানে একজন সৈনিক ছিল। সৈনিকই মনে হল। তার খালি গা, বাঁ হাত আর কাঁধ যেমন-তেমন একটা প্লাস্টারে মোড়া এবং আড়াআড়ি একটা কাপড়ের পটিতে ঝোলানো। দিন তিনেক সে দাড়িগোঁফ কামায়নি। সে যখন আমাকে বলল, 'মসিয়ো ব্যুলেপ,' আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। আমি এখন লেফটেন্যান্ট ভাঁদেরমালা। লোকটা কে ? 'আমাকে চিনতে পারছেন না ? দোয়াঁ ইভনের ভাই—।' আরে কি কাণ্ড, এমিল ! সে আমাকে বলল, সে সাঁজোয়া-বাহিনীর এক কমাণ্ডো দলে আছে। ডানকার্কের পর যথেষ্ট ট্যাঙ্ক তাদের দেওয়া হয়নি, কেননা প্রথমে সে একটা হচকিস চালাত। 'ও তো আর সাইকেলের তুলা নয়, কি বল, এমিল ?' সে বিষণ্ণভাবে একটু হাসল। তার কাঁধে নিশ্চয় যন্ত্রণা হচ্ছিল, মাঝেমাঝেই সে অন্যমনস্কভাবে ওখানে প্লাস্টারের ওপর তার ডান হাতটা বোলাচ্ছিল। সে এসেছিল রাবুইয়ের অঞ্চল থেকে। তারা, মানে তাদের কমাণ্ডো দল, মেশিনগান দিয়ে রাবুইয়ে রক্ষার চেষ্টা করছিল, রাস্তাটা···সৈন্য-বাহিনী চলে যাওয়ার পর—'বড় অদ্ভুত লাগছিল···রাবুইয়ে···ঐখান দিয়ে আমরা প্রায়ই তো সাইকেল চালিয়ে বেড়াম, আমরা দুজন, আমি আর রোজেং।' রোজেং আর বাচ্চাদুটোর কি হয়েছে সে জানে না, হয়ত তারা এখনো

পানাম-এ আছে, জার্মানরা এসে পৌঁছেছিল, কিংবা হয়ত, যেটা আরো খারাপ, তারা রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়েছিল এই সব · একটা খোলা কাটল খবে ধরে নয়। আমি শেষটা আর শনেতে পারলাম না, ডাক্তার-ক্যাপ্টেন আমাকে ডাকছিলেন। সকলের মধ্যে একটা কথাবার্তা শরে হয়ে গেল। নানা রকম গজেব। আমেরিকানরা লড়াইতে যোগ দিচ্ছে, রুশরা জার্মানদের আক্রমণ করেছে, এবং প্যারিসকে কমিউনিজম কাব্জ করেছে। বিশ্বাস না করেই শোনা-কথা লোকে আউড়ে যাচ্ছে এবং একজন আর-একজনের দিকে তাকাচ্ছে, দেখতে চায় ও লোকটা এ সম্বন্ধে কি ভাবছে। এভাবেই সেদিন প্রথম আমাদের ওপর পরাজয়ের চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। একটা সেলারে ভালো মত মজুত করা ছিল, জার্মানদের হাতে তা পড়তে দেওয়া হবে না, ওরা মদ খেতে জানে না। ডাক্তার ক্যাপ্টেনটি বেশ মোটাসোটা, বয়স অল্প, বরুশের মত গোঁফ আছে, সে বলল 'প্যারিসে শ্রমিকরা এ সবের কি বুঝবে ? ভেবে দেখ, তোরেজ এসে পৌঁছচ্ছে জার্মান-বাহিনীর সঙ্গে···'

ঠিক এই সময়ে এমিল তার গলা চড়াল। খুব চড়াল না। একটু যেন চেপে রাখল, তবে বেশ প্রত্যয় ছিল তার গলায়। সে বলল, 'আমি যখন রাঁবুইয়ের প্রবেশ পথে ছিলাম, সেখানে জানেন, প্রেসিডেন্টের কেল্লা-বাড়ির সামনে, জানেন মসিয়ো অ্যালেপ — আমাদের মেশিনগান আর বন্দুকগুলো রাস্তার দিকে নিশানা করা ছিল ··তখনো জার্মানরা এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু প্যারিসের বাসিন্দারা অবিরাম আসছে···তাদের সঙ্গে কতরকম যে লটবহর, বুড়োরাও··· তারপর শ্রমিকদের দল···এক-একটা কারখানার একসঙ্গে···ও তো দেখলেই চেনা যায়···ওরা যাবার সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সামসঁ কারখানার দল··· তারপর সিএ° কারখানার···তারপর জানেন কাদের দেখলাম ? আমার ভায়রাভাই আর আমার শালী, একবার ভাবুন দেখি··হঠাৎ···তারপর ওরা আমাদের সব বলল···কারখানায়, আর রঁ্যানো কারখানার ব্যাপার তো অন্য সব কারখানারই মত। ওরা যখন কারখানায় জানতে পারল যে জার্মানরা প্যারিসে আসছে, তখন ওরা সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলতে চাইল, সব যন্ত্রপাতি, কারখানার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে, তখন ওদের ঠেকাবার জন্যে সরকারী রক্ষী পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তারা ওদের ওপর গুলি চালাবার হুমকি দিল··হ্যাঁ, তা আপনি বলতে পারেন বটে, ওরা কিছুই আর বুঝতে পারছিল না ··জার্মানদের জন্যে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক রেখে দেওয়া, ভেবে দেখুন একবার, অ্যাঁ ? কোন-কিছুরই আর মাথামুণ্ডু বোঝা যাচ্ছে না।'

সকলের মত আমিও ঘুরে এমিলকে দেখলাম—তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

এবার যখন অ্যাম্বুল্যান্স ওকে নিয়ে গেল, তখন আমি ভাবলাম আর কি কখনো

ওর সঙ্গে আমার ! এরপরই যার সঙ্গে আমার আবার দেখা হল সে ইভন, সেই সুন্দর নীল-চোখ মেয়েটা। মার্সেইতে দফতরটার সরিয়ে নিয়ে গেছে এমন এক কাগজের সে টাইপিস্ট। অনেক জল ইতিমধ্যে পোলের নিচে দিয়ে গড়িয়ে গেছে। জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছিল ছেলেগুলো গাইছে : 'মার্শাল, এই তো আমরা রয়েছি তোমার সঙ্গে!' কেউ-কেটা গোছের যুবকরা এক ধরনের ইউনিফর্ম পরে ফুটপাথের ওপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। মুক্তঅঞ্চল তখন পুরোপুরি মোহমুক্ত। আমাকে ইভন বলল, 'এমিল? সে প্যারিসে ফিরে এসেছিল, তারপর তাকে পালাতে হয়। কারখানার অন্তর্ঘাত চলছিল।' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, এমিল অন্তর্ঘাতে হাত লাগাবার লোক নয়।' মনে হল, ইভন তার নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। কি রকম একটা অনুভূতি শুরু হল। তাকে ক্রমেই বেশি বেশি তার ভাইয়ের মত দেখাচ্ছিল। আমি ভাবি কেন সে বিয়ে করেনি এখনো!

বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে আমি গেলাম লিয়'তে। আমার কাগজটির মালিক সংস্করণের পর সংস্করণ বাড়িয়েই চলেছিলেন। আমাকে যেতে বলা হল কামার্গ-এ, মানুষের জমিতে ফিরে-যাওয়ার ব্যাপারটা সবিস্তারে রিপোর্ট করতে হবে। এক সন্ধ্যায় যখন আমি কামার্গ-এর ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, তখন পেরাশ-এর প্ল্যাটফর্মে একটা লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগতে লোকটা বলল, 'দেখে চলতে পারেন না? আরে—মসিয়্যো ব্লুলেপ!' আবার আমার এমিল। তার হাত আর কাঁধ? একেবারে সেরে গেছে। বাচ্চারা তাদের দাদু-দিদিমার কাছে —আর য়োজেং? 'ও! সে কাজ করছে।'—'সে কি? ছেলেমেয়েকে ছেড়ে? তোমরা তো আবার একটা স্প্যানিশ বাচ্চাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলে!' ইভনের মতো ওর চোখেও সেই অদ্ভুত দৃষ্টি—'এই রকম দিনে নিজের বাড়িতে ছেলে-পিলে নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় নেই।'—ও কি করে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলল না। আমি তার ভায়রার খবর জিজ্ঞেস করলাম। ও এড়িয়ে যাওয়ার মত করে একটা উত্তর দিল। ওর ট্রেন ছাড়ল।

বলতে পারা যায়, ১৯৪১-এর গ্রীষ্মকালে লোকের ধারণাগুলো বদলে গেল। কেন জানি না। জার্মানরা মস্কোর সামনে গিয়ে পৌঁছেছিল, কিন্তু মস্কো দখল করতে পারেনি। ট্রেনের মধ্যে লোকের মুখ খুলতে আরম্ভ করেছিল। যেমন বিশ্বাস করা হত প্রত্যেকে কিন্তু তেমন সত্যিই ভাবত না। তার্ন অঞ্চলের এক জায়গায় ভিড়-ঠাসা করিডরে বাক্স-পেটরা এবং ঘন ঘন শৌচাগারে-যাওয়া মানুষদের মাঝখানে এমন সব কথা হচ্ছিল যা শুনলে গা শিউরে ওঠে, আবার হাসিও পায়। আমি গলা শুনেই এমিলকে চিনলাম। সে বলছিল, 'সবুর কর না একটু। দেখ কি প্যাণ্ডাই ওদের দেয় ওরা।' ওর চোখদুটো যেন জ্বলছিল। ভেল দিভ-এর এমিলকে, সাইকেল-চালিয়েদের উদ্দেশে যে তার টুপি ছুঁড়ে দিত, সেই এমিলকে আমি আবার দেখলাম বটে, কিন্তু ও এখন আর

সাইকেল নিয়ে কথা বলছিল না, কথা বলছিল দুঃখের নিয়ে।···'গতবারে তুমি আমাকে তোমার ভায়রার খবর বলনি।' হঠাৎ ওর মুখ যেন এক মুহূর্তে কুয়াশায় ঢেকে গেল। এমিল হাত ঝাঁকি দিয়ে তার কপালের ওপর থেকে এক গুচ্ছ শত চুল সরিয়ে আমার দিকে ঝুঁকল। আমি ওর ভঙ্গিটা ভুল বুঝলাম। 'তোমাদের বুঝি মন-কষাকষি হয়েছে?' ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'জার্মানরা—ওরা যখন তাকে মেশিনগান চালিয়ে মারল, তখন তার শরীরটা ওরা পা দিয়ে মাড়িয়ে গেল··তার মুখটা ওরা জুতোর গোড়ালি দিয়ে থেঁত-লে দিল··মাথার খুলিটা চ্যাপটা করে দিল।' আমি মোটেই ভাবিনি এমন ঘটনা শুনব। সেই ভায়রাভাই! সেই কমিউনিস্ট! আমি হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করেছিল সে?' ও কাঁধ ঝাঁকাল। ও-সব কথা বলবার মত জায়গা এটা ঠিক নয়। যাই হোক যা ঘটেছিল তা এই—কারখানায় সে তার পার্টির নির্দেশে আবার কাজ শুরু করেছিল, সেখানে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে··· কারখানার উঠোনেই জার্মনরা দশজনকে গুলি করে মারতে চায়। তখন অন্য শ্রমিকরা তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্যে জার্মানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···হ্যাঁ, ঝাঁপিয়ে পড়ে খালি হাতে···ভায়রাভাই ছিল তাদের পুরোভাগে···তারপর ওরা তার শরীরটা পা দিয়ে থেঁতলায়।

এমিল যখন বলছিল 'পা দিয়ে থেঁতলায়' তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। তার চাপা স্বরের মধ্যে সবুজ পল্টনদের এক জংলী নাচ ছিল, টুপি-পরা জানোয়ারদের এক উন্মত্ততা ছিল। আমি কিছু-একটা বলতে চাইলাম···'কি সাংঘাতিক! কিন্তু ধর্মঘট করা কি যুক্তিসঙ্গত?' এমিল প্রথমে কোন উত্তর দিল না। তারপর আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, 'মসিয়ো ব্যুলেপ, আমরা জার্মান নই। যুক্তিসঙ্গত? যুক্তিসঙ্গত হবার ব্যাপার এটা নয়, জার্মানদের তাড়াতে হবে। ছত্রিশ সালের কথা আপনার মনে আছে? সেবার আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন আমি ধর্মঘট করছি। হ্যাঁ, আজকেও সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না···এবং একজন যখন পড়ে যায় তখন আর দশজনের উঠে দাঁড়ানো দরকার।' এক দশাসই জার্মান অফিসার আমাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেল, তার গা থেকে জার্মান পল্টনী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তার মুখে কোন ভাবলেশ নেই, যা কোন্ কায়দায় করা যায় শুধু তারাই জানে। 'ওরা সাজপোশাক করে ভালো,' বলে এমিল অন্য কথা পাড়ল।

পুরো ১৯৪২ সাল আমি ওকে আর দেখিনি। সব-কিছুই একটা অদ্ভুত মোড় নিচ্ছিল। ভিশিকে সমর্থন করার মত লোক আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

সাংবাদিকের কাজ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। খবরের কাগজ পয়দা করা হত এক শিশি গঁদ আর সরকারী ইস্তাহার দিয়ে। মাঝে মাঝে অবিশ্যি এখানে-ওখানে দু-একটা কথা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত। সেন্সর দফতরে কি যে সব ত্যাঁদোড় লোক ছিল। তবে সুখের বিষয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল খুব সাধারণ। যখন নভেম্বর এল, আমেরিকানরা আলজেরি-এ ঢুকল, জার্মানরা ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে নিল তখন যাদের মনে সন্দেহ ছিল তারা একেবারে চুপ করে গেল। আমাদের কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। মালিক খুব ভড়ংদার লোক, সে আমাদের কিছুকাল যথারীতি মাইনে দিল যেন কিছুই ঘটেনি। আমার জীবনে এই প্রথম আমি ঘটনার গতি লক্ষ্য করতে ও বুঝতে আরম্ভ করলাম। প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের পক্ষ থেকে কয়েকবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তখনো পথ হাতড়াচ্ছি। তারপর এল সেই রাত যখন হিটলার পেতাঁর বাহিনীকে খতম করে ভিশির রাজত্বের ওপর চরম আঘাত হানল।

অবশেষে আমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার কাজ শুরু করলাম। যে-সব কাগজে বন্ধুরা ছিল তাতে আমার প্রবন্ধ নেওয়া হত। যে-লেখাগুলো পাশে বেরুত তা পড়লে খুব সুখ হত না। তবে কাগজে ভঁদেরমালাঁর নাম বা ক্যালেপের স্বাক্ষর আমি দিতাম না। জীবনযাত্রার ব্যয় যা দাঁড়িয়েছিল পুরোপুরি কালোবাজারে না খেলেও—রেস্তোরাঁয় একটা বাড়তি পদ নিলেই—ওরে বাব্বা, যা দামটা হাঁকত! কি করব, আমি যে ভিশির জাতীয় রূপকার্য নিয়ে গল্প বানাতে পারতাম না, পোকামাকড়কে সেলাম করতেও পারতাম না।

আমি যখন জানলাম ইভনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন আমার বেশ কষ্ট হল। বেচারী! তাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল ম'ল্যুক জেলে। শুনি, জেলটা খুব খারাপ এবং ঘর-ছাপিয়ে কয়েদী। কি করেছিল মেয়েটা? হায়রে, জেলে আর শিবিরে লাখ-লাখ লোক বন্দী যেখানে, সেখানে কি জানা সম্ভব তারা সবাই কে কি করছে? ইভন ছিল সাহসী মেয়ে, সব সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখত। নামের বানান ভুল করত এই-যা, সেগুলো ঠিক টাইপ করেছে কিনা দেখতে হত।

নিসে যখন আবার এমিলকে দেখলাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না ও আমাকে দেখেছে কি না। তবে আমার মনে হল ওর ভাবটা এমন যেন আমায় দেখতে পায়নি। আমার ইচ্ছে হল ওর পেছনে ছুটি, বিশেষত ইভনের খবর জিজ্ঞেস করবার জন্যে, তারপর···নিশ্চয় অবিবেচনার কাজ হবে বলে···ও ভয় পায়নি। ভেবে ভেবে এমিল তো এই ক্যালেপ-ভায়াকে ভালোই বাসে। তা নয়, আমি যে একা ছিলাম না। বুঝতেই তো পারেন। যাই হোক, ও এখনো বেঁচে আছে।

আমি কিছুদিন আমার বাড়িতে এক ইহুদি সাংবাদিককে লুকিয়ে রাখলাম।

তাকে ধরবার জন্যে খোঁজ করা হচ্ছিল, যদিও ইহুদি হওয়া ছাড়া আর-কোন অপরাধ সে করেনি। সরে পড়ার জন্যে তার ভুয়ো পরিচয়পত্রের দরকার ছিল। প্রতিরোধ দলে আমি যাদের চিনতাম তাদের কাছে চাইলাম। সে যাই হোক, তাকে লুকিয়ে তো রাখলাম ইতিমধ্যে নিজের বাড়িতে। কিন্তু যে করছি না এতে নিজেরই খারাপ লাগে শেষ পর্যন্ত। ইভনের গ্রেপ্তারের খবর আমাকে কেমন অদ্ভুতভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

এদিকে আমার অতিথি নিজের একটা ব্যবস্থা নিজে করে ফেলেছিল। সে নাকি এমন কিছু লোকের সন্ধান পেয়েছিল যারা ভুয়ো কাগজপত্র বানিয়ে মোটা দামে বিক্রি করে। তা যোগাড় করে গ্রামাঞ্চলে কোন জায়গায় সে পাড়ি দেবে ঠিক হল। হঠাৎ এক সকালে দরজায় ধাক্কা—এক কোম্পানি সেপাই, ফরাসি পুলিশের এক কমিশনার ও তার চেলাচামুণ্ডা এবং গেস্টাপোর দুই পাণ্ডা। এ কাহিনীর বিশদ বিবরণ দেবার ইচ্ছে আমার নেই, এখানে তার কোনো প্রয়োজনও নেই। ওরা আমাদের মারধোর করল। ফরাসিরা আমাকে রেখে দিল। সে ইহুদি বেচারার যে কি হল কেউ জানে না। সে নিশ্চয় গরুভেড়ার সেই মালগাড়ির মধ্যে ছিল যেটা জার্মানিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্রতো থেকে বেরুবার পথে যেটা ভুলে ফেলে রাখা হয়। গাড়িটা তালাবন্ধ ছিল এবং তার ভেতরের সব আওয়াজ পাঁচ-ছয় দিন বাদে থেমে গিয়েছিল। আমি বেঁচে গেলাম — ছয় মাসের জেল, ভাড়াটের নাম না-জানানোর জন্যে।

এবার জেলের উঠোনেই এমিলকে আবার দেখলাম। বেড়ানোর সময়। বেড়ানোই বটে! উঁচু কালো দেওয়ালগুলোর মাঝখানে একটা কুয়ো, তার চারদিকে সকলের ঘোরা—একজন আর-একজনের পেছনে বেশ দূরত্ব রেখে, কথা বলার অধিকার নেই। ও ছিল আমার পেছনে, আমি ওকে দেখিনি। হঠাৎ শুনি কে যেন ফিসফিস করে বলছে : 'আরে! মসিয়ো ক্যালেপ!' ভুল হবার উপায় নেই ও—এমিল। আমরা বেশি কিছু বলতে পারিনি। প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে একবার কুয়ো বেড় করে ঘোরা। 'ইভনের খবর?'...'ও এক বন্দী-শিবিরে আছে। অবস্থা খুব খারাপ নয়।' ...'আর রোজেৎ?' উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে এল না। আমরা ঘুরছিলাম। পাহারাদার আমাদের দিকে দেখছিল। অবশেষে একটু অন্যরকম গলায় বলল, 'সাইলেসিয়াতে। জানুয়ারি মাস থেকে। কোন খবর নেই...'

আমি যেন একটা চোট খেলাম। আমার সেলের মধ্যে আমি সব সময় রোজেতের কথা ভাবতাম। কোন্ জায়গায়? নুনের খনিতে? কে জানে? ছোটখাট মেয়েটা। আমি ভেল দিভ-এ প্রথম তাকে যেমন দেখেছিলাম, সেই রকমই আবার তাকে দেখতে লাগলাম, ছোটখাট মেয়ে—ভায়রাভাই, ইভন, রোজেৎ—পোড় খাওয়া পরিবার, ওরা নিজেদের রেয়াত করেনি। অথচ ওদের কোন লাভ ছিল না। আমার সঙ্গে সেলে এক কালোবাজারী আর এক পকেটমার ছিল,

তারা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত, কারণ আমি ছিলাম রাজনীতিক কয়েদী। বাস্তবিক এ একেবারে চূড়ান্ত, আমি কিনা রাজনীতিক…

আর একবার দেখা পায়খানায় যাওয়ার সময়। আমি ছিলাম করিডরে। আমার পাশ দিয়ে এমিল গেল। আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কি যেন, মসিয়্যো কুলেশ!' আশ্চর্য প্রশ্ন আমাকে! আমি কোনমতে উত্তরটা দিতে পারলাম। যখন বেড়ানোর সময় আবার তার দেখা পেলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মোজেং কি করেছিল?' ও উত্তর দিল, 'কিছু না, তার কর্তব্য…'

কালোবাজারী লোকটা বলত তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়, কেননা এই জেলে গাদা গাদা কমিউনিস্ট রয়েছে, তার চোটটা অন্য সকলের ওপরে পড়ে। এবং সে আমার দিকে ইঙ্গিত করত। আমি শেষে তাকে বললাম, 'আমি মোটেই কমিউনিস্ট নই, এমনকি দ্য-গোলপন্থীও নই। সে বলল, 'যাই হোক, তুমি তো রাজনীতিক, সুতরাং তোমাকে বেছে নিতে হবে…'

একদিন সন্ধ্যায় জেলের মধ্যে এক অদ্ভুত গোলমাল শুরু হল। দরজায় দড়াম দড়াম আওয়াজ, লোকজনের যাতায়াতের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমরা তিনজন একটা অস্পষ্ট উদ্বেগ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি হল আবার? তারপর করিডরে পায়ের শব্দ, তালা-খোলার শব্দ। তখন অন্ধকার। দরজা খুলে গেল, আলো নিয়ে জেলরক্ষী, তার সঙ্গে আর একজন রক্ষী আর পেছনে তিনজন কয়েদী যারা হুকুম দিচ্ছে মনে হল। এমিলের গলার স্বর, 'এই যে ও, কোণের দিকে—ভাঁদেরম্যাল্যাঁ।' রক্ষী বলল, 'ভাঁদের-ম্যাল্যাঁ, বেরিয়ে আসুন।' ব্যাপার কি? বিদ্রোহ? এমিল ব্যাখ্যা করল, 'এক সঙ্গে জেল ভেঙে পালানো।' আমার সঙ্গী দুজন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, কিন্তু তাদের ওরা ঠেলে দিল সেলের মধ্যে—রাজনীতিক ছাড়া আর কেউ নয়। ওরা গোণাতে লাগল।

এমন চমৎকারভাবে কিছু সংগঠিত হতে আমি :কখনো দেখিনি। জেলের পরিচালক যেন একটা ছোট ছেলে, কয়েকজন রক্ষী বন্দীদের পক্ষে, অন্য রক্ষী-দের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বিদ্রোহীরাই কর্তৃত্ব করছিল। তাদের তালিকাটা পরিচালকের কাছে। এমিল বলছিল, 'শুধু দেশপ্রেমীদেরই বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে। আমাকেও দেশপ্রেমীদের মধ্যে ধরেছিল। কি বলব, আমার খুব গর্ব হচ্ছিল।

পরের ঘটনাগুলো আমি সবিস্তারে আর বলছি না। সেই রাত্তিরে লরি করে চলা, রেলওয়ে পোলের নিচে সেই ভীষণ দুর্ঘটনা, তারপর এক পাহাড়ী গ্রামে গিয়ে পৌঁছনো, সেইসব ভালো মানুষ যারা আমাদের লুকিয়ে রাখল, নতুন কাপড়-চোপড় এনে দেওয়া, সকলের সেই আশ্চর্য সহৃদয়তা। তবু আমি আগে কখনো মনে করিনি আমাদের দেশে এত নিষ্ঠা আছে, ভালো

লোক এত আছে · অন্য কোনো শব্দ আমি খ‍ুঁজে পাই না···ভালো লোক। এমিল আমাদের সঙ্গে আর ছিল না। আমাদের ছোট ছোট দলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। আমার সঙ্গে ফ্রেমর্ঁর এক উকিল, দ‍ুজন দ্য-গোল-পন্থী যাদের একজনকে আমি চিনতাম, একজন সাংবাদিক এবং ব্রেক-এর একজন কৃষক। সবসুদ্ধ আটজন জেল থেকে পালিয়েছে, তাবুন একবার।

অতঃপর আমার নাম আর ভাঁদেরম্যাল্যাঁ নয়, এমন কি দ্যুলেপও নয়। আমার জন্যে যে পরিচয়পত্র তৈরি করা হল তাতে আমার নাম বাক হানি। নিখ‍ুঁত পরিচয়পত্র, যে দ‍ুর্ভাগা ইহুদিকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম তাকে জোচ্চোররা যে পরিচয়পত্র বেচেছিল মোটেই সে-রকম নয়। আমার সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল আমার বাবার কোন জায়গা আছে কিনা। প্রথমে আমি বললাম, 'না।' তারপর তারা যখন বলল, 'তবে আমাদের সঙ্গে এস,' তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?' 'কেন, মাকিতে'। আমি স্বীকার করছি আমি তাতে খ‍ুব আকৃষ্ট হইনি। গ্রীষ্মকাল এবং প‍ুরো গরম শ‍ুর‍ু হয়েছিল। মাকি! আমি মাকিতে গিয়ে থাকবার কথা মোটেই ভাবতে পারিনি।

গাঁয়ের লোকেরা আমাকে যা যোগাড় করে দিল তাই প‍ুঁজি করে আমি 'এস' পর্যন্ত যেতে পারলাম, সেখানে আমার বন্ধ‍ু 'ওয়াই'-দের (আমি তাদের গোলমালে ফেলতে চাইনে) একটা স‍ুন্দর কেল্লা-বাড়ি আছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে আমার খাপ খাইয়ে নেবার মত সময় ওরা আমায় দেবে। ওরা আমাকে দেখে যে খ‍ুব খ‍ুশি হয়েছে এমন মনে হল না। কিন্তু ব্যবহার ঠিকই ছিল। পল 'ওয়াই'-এর অবাক ভাবটা তো কাটছিলই না। সে আমাকে খালি প্রশ্ন করছিল। তার উদ্বেগের কারণ হয়েছিল সেই গ্রাম যেখানে আমরা অমন আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। পল বলছিল, 'তাহলে পাহাড়ের ভেতর ঐ ছোট্ট জায়গাটায় ওরা সবাই এখন কমিউনিস্ট? কমিউনিস্ট কেন? মোটেই না। ভালো লোক, এই বলা যায়। ওদের একটা 'জাতীয় মোর্চা সমিতি' আছে। তাতে পল 'ওয়াই' নিশ্চিন্ত হচ্ছিল না। সে বলছিল, যেভাবে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে তা বেশ ভয়ের ব্যাপার।' আমি কিছ‍ু বলিনি, তবে আমি ঠিক করে ফেললাম ওদের বাড়িতে বেশি দিন থাকব না। ওর ভয় জার্মানদের কাছ থেকে আসে না। জার্মানদের মেশিনগান নিয়ে রাস্তা চলতে ওর জানালা দিয়ে দেখা যায়, যখন তারা 'এস' মালভ‍ূমির ওপর বিদ্রোহীদের তাড়া করতে বেরোয়। ও অঞ্চলে নাকি বিদ্রোহীরা আছে।

আমি খ‍ুব সন্তর্পণে শহরে গিয়ে ঢ‍ুকলাম। আমার বন্ধ‍ুরা আমাকে সাহায্য করল। তারপর আমার দেখা হয়ে গেল প্রোতোপোপোফের সঙ্গে, হ্যাঁ সেই প্রোতোপোপোফ, জেনারেলের ছেলে, আমাদের কাগজের সেই ফোটোগ্রাফার, যার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম এমিলদের বাড়ি। দেখলাম ও একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে। স্তালিন বলতে অজ্ঞান। ও বলল, ওর বাবা ছিল আহাম্মক, জোল-

কিছুই বুঝত না এবং ওর দুর্ভাগ্য, লাল ফৌজে ঢুকে দেশের জন্যে লড়াই করতে পারছে না। সে আসলে কি কাজ করে আমি জানি না, তবে সে একটা বড় সচিত্র সাপ্তাহিকে আছে এবং প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে সে আমার ছুটকো প্রবন্ধ লেখার এবং তার ফোটোর বিবরণ লেখার বন্দোবস্ত করে দিল। প্রধান সম্পাদক লোকটি বেশ ভালো মনে হল। আমার নিজেকে জাহির করার দরকার নেই, আমি স্বাক্ষর করি ওদেৎ দ্য লুস'। কেউ ভাবতে পারবে না এই রকম নাম যার, সে লোকটা কুলেপ। আমার কাজ তো আমি করছি।

যেখানে আমার বাস, সে এক ছোট শহর। প্রথমে আমি কারুর সঙ্গে কথা বলতাম না। তারপর এখন আমি প্রায়ই পাদ্রি মশায়ের সঙ্গে দেখা করি। এ পাদ্রি এক দশা-ধরা মানুষ। উনি সামরিক ধাঁচের লোকদের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করেন। উনি ঐ অঞ্চলের মেয়েদের নিয়ে উলবোনা ইত্যাদি কাজের এক দাতব্য-কেন্দ্র খুলেছেন। ঐ অঞ্চলের মেয়েরা মানে ছোটখাট ব্যবসায়ীদের স্ত্রীরা, কৃষকবউরা, এমন কি শ্রমিক মেয়েরা (আমাদের এখানে একটা লেমনেডের ছোট কারখানা আছে)। এই সব মেয়ে কাদের জন্যে কাজ করে তা কেউ বলে না, তবে তা বোঝা যায়। ১৯৪০ সালে যদি এই কানাকানি হত! এখন সারা দেশটাই এই রকম হয়েছে। আমি কসাইয়ের ওখানে রেডিও শুনতে যাই। সে-ও এক অদ্ভুত লোক। ভবঘুরেদের সব উদ্বাস্তু যাদের কোন কার্ড নেই, তাদের সে মাংস দেয়। এও লোকে জানে যে ওখানকার ডাক্তার মাকির লোকদের চিকিৎসা করেন, তাদের আস্তানা কাছেই। সেদিন এক জখম-হওয়া লোকও এসেছিল। ছোট শহরটা বাইরে থেকে খুব শান্তশিষ্ট, কিন্তু যদি বেশ ঠাওর করে দেখা যায়—কসাইয়ের দোকানে মাঝে মাঝে এমন লোকেরা আসে যারা পাদ্রির সঙ্গে গোপনে দেখা-করা লোকদের মত। তারা সবাই কথা বলে মোটামুটি ভালো, এমিলের মতো তারা কে, কি করে, আমি কিছুই জানি না। যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইতালিতে লড়াই তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। ভিশিতে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে লোকে ভেতরের খবর বলে। রুশ রণক্ষেত্রের মানচিত্রে লোকে ছোট ছোট আলপিন এগিয়ে এগিয়ে পোঁতে।

পাশের শহরে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভাল্মি বার্ষিকী[1] উপলক্ষে এক ধর্মঘট হয়। জার্মানরা তিনশ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। একজন ধর্মঘটী ওদের আঙুল গলে পালায়। পাদ্রিমশায় তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। তাকে এক আবাদের কাজে ঢোকানো হবে। সে বলছে, গুপ্ত সৈনিকদলে ঢোকাটা তার বেশি পছন্দ। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, এরা, এইসব লোক এই রকম খেপে উঠেছে। ফরাসি বলে গর্ব হয়।

১। ভাল্মি ১৭৯২ সালে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সেনারা প্রুশিয়ানদের পরাজিত করে।

আমাদের শহরের ছবিতে মাত্র একটি কালো ছায়া। এক মকেল থাকে শহর থেকে বেরুবার মুখে সেই হলদে বাড়িটায়। শুনি,১৯৪০ সালে জার্মানরা যখন এই পথ দিয়ে গিয়েছিল তখন সে তাদের দুই হাত মেলে অভ্যর্থনা করেছিল, খাদ্য সংগ্রহের জন্যে তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল, সে তাদের সঙ্গে মদ খেত মোট কথা, তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার ওপর, তার সাত বছরের ভাই-পোটা কসাইয়ের ছেলের সঙ্গে খেলতে খেলতে বলল, 'আমি যখন বড় হব,তখন আমার কাকার মত হব, মিলিশিয়ায় লোক হব। কাকার মত আমি দিনে দেড় শ ফ্রাঁ রোজগার করব কিছু না করেই…।' এ নিয়ে লোকে কথা বলাবলি করে। ও সম্ভবত এ কাজের একমাত্র লোক নয়। কিন্তু অন্যরা কারা তা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। এ লোকটা মাঝে মাঝে ডাক পার্শেলে ছোট এক-একটা কফিন পায়, সব লোক তা নিয়ে গোপনে হাসাহাসি করে।

প্রোতোপোপোফ আর আমি একদিন গেলাম গ্রানোবল-এর কাছে সরকারী 'কাঁপাইয়' দলের শিবিরে রিপোর্টাজ করতে। বেশ গরম সেদিন। চার ঘণ্টা মোটরবাসে। জায়গাটা খুব সুন্দর। লালচে পাতাওয়ালা গাছ—যাক, বর্ণ-নার কোন দরকার নেই। যখন দলের নায়করা তাদের সৈনিকদের প্যারেড করাচ্ছিল, মার্চপাস্ট, আবার মার্চপাস্ট, ব্যূহ রচনা, যা শতবার আমরা আগে দেখেছি এ কথা বলতেই হবে। এমন সময় দুটো লরি এসে থামল শিবিরের প্রবেশ-মুখে এবং তা থেকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে নামল কিছু অস্ত্রধারী লোক। তারা আমাদের দিকে বন্দুক নিশানা করে ধরল। জন কুড়ি তারা, আর এ দিকে ছিল শ দেড়েক। কিন্তু এদের অস্ত্র ছিল না। এদের নায়কদের মুখ-গুলো যা দেখতে হয়েছিল! অতি সহজেই 'কঁপাইয়'রা রাজি হয়ে গেল তাদের পোশাক, তাদের সব সরঞ্জাম দিয়ে দিতে। প্রোতোপোপোফ এবং আমি, আমাদের দুজনকে কিন্তু স্পর্শ করা হল না। ওরা সবাই ছিল যুবক, পরনে জ্যাকেট, বড় জুতো, হাফপ্যান্ট আর পায়ে-জড়ানো পশমের পট্টি, পোশাকে আশাকে তেমন মিল ছিল না, তবে একটু সমতা এনেছিল মাথার 'বেরে' টুপি। যারা ওদের পরিচালনা করছিল, তাদের একজন যখন আমাকে বলল, 'আরে, আপনি এখানে কি করছেন, মসিয়ো বুলেপ ?' তখন স্বভা-বতই আমি চমকে উঠলাম। আবার এমিল। তাহলে ও এখন প্রতিরোধদলে সৈনিক হয়েছে। 'কঁপাইয়' দলের একটা সাইকেল ছিল, সেটা সে নিয়ে যাবেই। যেভাবে সেটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল, তার মুখে যে খুশি ফুটে উঠেছিল তা দেখবার মত—'ঠিক আছে, ওটা আমাকে লরিতে উঠিয়ে দাও।' এমিলকে দেখছি কেউ বদলাতে পারেনি। যেমন তারা এসে-ছিল, তেমনি চলে গেল।

বাড়ি ফিরে ঘটনাটা পাদ্রি মশায়ের কাছে বর্ণনা করবার জন্যে আমার মুখ চুলকোচ্ছিল। নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত যে কি রকম বদলে যায় তা আশ্চর্য—

কিছু কাল আগে যদি হত, তাহলে আমি এমিলকে মনে করতাম ডাকাত। আজ, চিন্তা করে নয়, সহজ স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারগুলোর মানে বদলে গেছে, তাৎপর্য বদলে গেছে। শুধু আমার কাছেই নয়। যেমন, ঐ কসাইয়ের কাছে। পাদ্রি মশায়ের কাছে এবং এখানে প্রায় সব লোকের কাছে, যারা সারা জীবন কাজ করেছে আইনকানুনকে সম্মান করতে করতে, শহর-কর্তাকে সেলাম করতে করতে—দীনভাবে। যারা গির্জার উপাসনায় যেত, যারা ধর্মের আচার-বিচার মানত। লেমনেড কারখানার ঐ মালিক, যার দুই ছেলে জার্মানিতে, কারণ তারা যখন যায় লোকে তখনো সংগঠিত হয়নি, একেবারে গোড়ার দিকে, এবং যে-মালিক এখন তার শ্রমিকদের জার্মানিতে পাঠানো ঠেকায়। রেজিস্ট্রার আর ডাক্তারের স্ত্রীরা। আমি কসাইকে এমিলের ভায়রার কাহিনী বর্ণনা করেছি, যাকে জার্মানরা পা দিয়ে থেঁতলেছিল। শুনে ও বলেছে, 'আচ্ছা, মার্শাল টিটো—লোকে যা বলে তা কি সত্যি যে উনি কমিউনিস্ট?' তাতে ও একটু অস্বস্তি বোধ করে। আমি তাকে তো বলতে পারি না যে আমি যখন জেল থেকে সরে পড়ি তখন আমি এ কথা জিজ্ঞেস করিনি কে আমাকে পালাতে সাহায্য করেছে।

১১ই নভেম্বরের[১] অল্প পরেই ওরা আমাদের শহর ঘিরে ফেলল। জার্মানরা।

১। মনে হয় এখানে ১৯৪৩ সালের ১১ই নভেম্বরে গ্রানোবল-অঞ্চলে যে-ঘটনা ঘটে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান-বার্ষিকীতে গ্রানোবল-এ প্রতিরোধ-যোদ্ধারা বোমা বিস্ফোরণ করে, মিছিল করে এক সংগ্রামী আবহাওয়া সৃষ্টি করে। নাৎসী কাগজের রিপোর্টে বলা হয় যে, ঐদিন ফরাসি শ্রমিকরা, যাদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট, এক জার্মান-দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এবং তাদের বহু লোককে গ্রেপ্তার করে জার্মানিতে বন্দীশিবিরে চালান দেওয়া হয়।

ঐদিন গ্রানোবল-এর উত্তরে ওয়াইয়োনা-তে যা ঘটে তা আরও চমকপ্রদ। মাকির যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে পতাকা ও সামরিক বাদ্যসহ মৃত সৈনিকদের স্তম্ভের সামনে অনুষ্ঠান করে। তারা এই শহরকে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাদের আয়ত্তে রাখে।

আর এক ১১ই নভেম্বরও স্মরণীয়। সেটা ১৯৪০ সাল। নাৎসী দখলের বিরুদ্ধে সেই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ, যার সংগঠক ছিল প্যারিসের কিশোর ছাত্রছাত্রীরা। তারা সেদিন আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ-এ গিয়ে দল বেঁধে দাঁড়ায়। তখন দালাল ফরাসি-রক্ষীরা এসে তাদের বাধা দেয়। অতঃপর ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করে। হঠাৎ মেশিনগানধারী জার্মানরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গুলি চালায়। কিশোরকিশোরীরা গান গাইতে গাইতেই প্রাণ দেয়।

খুব ভোরে, তখনো বেশ অন্ধকার। লোকমুখে শোনা গেল, ওরা মিউনিসি-পাল ভবনে যায়, কিন্তু সর্বপ্রথম যায় সেই হলদে বাড়িতে, সেখান থেকে সেই মিলিশিয়ার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা মিউনিসিপাল ভবনে পৌঁছয়ঃ আমি ডাকবিভাগের একটি মেয়ের বাড়িতে যে-ঘরে থাকতাম, আমার সৌভাগ্য ওরা সেখানে আসেনি। বাস্তবিকপক্ষে, আমার কি-ই বা ভয় ছিল? আমার পরিচয়-পত্র তো নিয়মমাফিকই ছিল। ওরা কুড়িজন যুবককে নিয়ে চলে—তাদের মধ্যে একজনের বছর উনিশ বয়স, সে পালাবার চেষ্টা করলে ওরা তাকে গির্জার পেছনে গুলি করে মারে। যেভাবে ওরা বেচারা বুড়ো পাদ্রিকে গ্রেপ্তার করে, সেটাও খুব সাংঘাতিক। শোনা গেল, ওরা তাঁকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারে, তিনি কয়েকবার পড়ে যান, তিনি বলছিলেন, স্বর্গ-স্থিত আমাদের পিতা, তোমার নাম পুণ্য হোক -তোমার রাজত্ব শুরু হোক।' যখন ওরা তাঁকে গাড়ির মধ্যে তোলে, তখন সেই মিলিশিয়ার লোকটা নাকি সেখানে ছিল এবং সে তাঁর উদ্দেশে চিৎকার করে বলে,'বিদায়, বদমাশ কমিউ-নিস্ট।' ঐ দেখুন। এখন পাদ্রিকেও অমন আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সারা শহরে হলদে বাড়ির লোকটার বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ। ওর যদি কিছু ঘটে তবে আমি অন্তত নাকী কান্না কাঁদব না।

লোক বলে, মানে কসাই আমাকে বলল, এই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে এই কারণে যে, কাছেপিঠে একটা প্রতিরোধ-শিবির ছিল, তারা রাতারাতি সরে পড়ে, পাদ্রিই নাকি তাদের আগে থেকে খবর দিয়েছিলেন। ডাক্তার নিশ্চয় জানেন তারা কোথায় গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের এখানটা তো টিকটিকিতে ছেয়ে গেছে। রাত্তিরে মোটরসাইকেলে ঘুরে বেড়ায়। বিচিত্র সব লোক এসে দেখা দিয়েছে 'যাত্রীনিবাস' হোটেলে, বুরিয়' রেস্তোরাঁতে। তারা যে দরজায় আড়ি পাতে তা লোকে দেখে ফেলেছে। আগে ইংরেজি বেতার জোরে চালিয়ে দেওয়া হত, এখন লোকে শোনে শুধু নিচু আওয়াজে। ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট গিয়েছিল। গেস্টাপো এল, কিন্তু এবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল না। এ থেকে এই ধারণাই হয় যে, ওরা দেখতে চায় তাঁরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। শহরে মাঝেমাঝে বোমা ফাটে, বাড়িঘর ভাঙে —একটা কফিখানা, জার্মান অফিসের সামনের অংশটা, 'সিনেমা প্যালাস'-এ গ্রেনেড। আট দিনের মধ্যে তিনবার রেলওয়ে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

আমার বোকার মত মনে হয়—এ সবই যেন এমিলই করছে। তাকে কি আবার আমি দেখতে পাব? তার বোন কেমন আছে? এখন আমার যখন বয়স বাড়ছে, আমি মনে মনে বলি, আমি একটা গবেট ছিলাম, আমার উচিত ছিল ইভাকে বিয়ে করা। খুব ভালো মেয়ে সে, চোখ দুটো বড় সুন্দর। একসঙ্গে থাকলে আমরা সুখী হতাম হয়ত - আমি বোধ হয় জীবনের সব মানে বুঝতেই ভুল করেছি। পেছন দিকে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। খালি নিজের কথাই

ভেবেছি

সারা অঞ্চলে সন্ত্রাস। জার্মানরা টহল দিচ্ছে। সবার ধারণা লেমনেড কারখানায় ওরা হানা দেবে। 'র‍্যালেভ' বলে যাকে ওরা নির্লজ্জভাবে জাহির করে তাতে যোগ দেবার জন্যে ওরা ঝিয়ের স্বামীকে তলব করেছে। লোকটা এখন তার পা প্লাস্টারে মুড়ে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখাবে—আমি মনে করি ও ভুল করছে। ওর মাকিতে চলে যাওয়া উচিত। সৈন্যদল থেকে সরে পড়ার চেয়ে যোদ্ধা হওয়া ভালো।

আমি আবার এমিলকে দেখলাম। কিন্তু স্বপ্নে। এক শহরে, যেটা গ্রানোবলও নয়, প্যারিসও নয়। একটা মস্ত বড় অ্যাভিনিউ, নির্জন, বিষণ্ণ। শীতকাল। জার্মানদের দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওরা ছিল সেখানে, পাতাখসা গাছগুলোর পেছনে, দরজার অন্ধকার চৌকাঠের সামনে—আমার হাতে একটা স্যুটকেস ছিল আমি তাড়াহুড়ো করছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না চার ঘণ্টা দেরি কার হয়েছে, আমার, না ট্রেনের। হঠাৎ গুলির আওয়াজ পর পর, যে মানুষগুলো ওখানে থাকা ছাড়া আর-কিছু করেনি তারা পড়তে লাগল—ঐ সব এবং সেই আবছা কাহিনীটাও যা আমি লোকমুখে শুনেছি, একটা লোককে গ্রেপ্তার করে তার কব্জিতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিগে তার উপর ওদের কুকুর লেলিয়ে দেয়—ঐ সব—এই সময় এমিল দেখা দিল। একটা চমৎকার ঝকঝকে সাইকেলের ওপর ও ছিল। মিউজিক হলের খেলোয়াড়দের যেমন সাইকেল হয় সেই রকম। আমি বুঝতে পারলাম এই সাইকেলটাই ও 'কঁপাইয়ঁ'দের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। ও আমার কাছাকাছি এল এবং বলল, 'নমস্কার, মঁসিয়ো ব্যুলেপ...' হঠাৎ আমি টের পেলাম আমার পেছনে কিছু ঘটেছে। দেখি সেই হলদে বাড়ির বাসিন্দা, সেই মিলিশিয়ার লোকটা। সে এমিলের দিকে বন্দুক তাগ করছিল। আমি চিৎকার করতে চাইলাম। আমার গলায় আওয়াজ আটকে গেল। কিন্তু এমিলই গুলি চালাল, মিলিশিয়ার লোকটা রাস্তার ওপর পড়ে গেল, তার রক্ত ঝরতে লাগল অবিশ্রান্ত...

আমি চমকে জেগে উঠলাম নিজেকেই নিজে ভয় পেয়ে। আমি কি সত্যিই একজন মানুষের মৃত্যু কামনা করছিলাম? লোকে বলে ঐ লোকটাই পাদ্রির নামে লাগিয়েছিল, জার্মানদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের শিবিরে। বাস্তবিক আমি হয়ত জীবনের সব ব্যাপারেই ভুল করেছি। আমি কল্পনায় রোজেৎকে দেখি সাইলোসিয়ার বন্দীশালায়, তার গায়ের রংয়ে সেই লালের ছোপ। তার হাত, তার চুল এখন কেমন হয়েছে দেখতে? এই তো শীত এসে গেছে। তার নিশ্চয় শীত করছে, ভীষণ শীত। আর সারাদিন খাটুনির ধকল। ভাবলে অসহ্য লাগে। প্রত্যেক দিন একটু বেশি বেশি অসহ্য লাগে।

আমি শহরের মধ্যে গিয়েছিলাম। বাসে সেই হলদে বাড়ির লোকটা ছিল।

ভালো পোশাক পরা। উদ্ধত রকম নতুন জুতো, ওভারকোট, চামড়ার দস্তানা। বাসটার ভীষণ ভিড় ছিল। যদি কেউ ঐ লোকটার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিত, তাহলে ও দাঁড়িয়েই থাকত। অন্যদের চাপে ও সোজা থাকত। ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে যে এমন সব ফরাসিও আছে যারা অন্য ফরাসিদের তুলে দেয় জার্মানদের হাতে। গ্রানোবলএ, ক্রেয়ম'-ফেরাঁর ওরা হত্যা করতে আরম্ভ করেছে তাদের যাদের ওরা বলে জামিনদার। ওদের খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে, 'মিলিশিয়ার লোকেরা, তোমরা সন্দেহভাজন মানুষগুলোর হদিশ রাখ…'

আমি আর এমিলের দেখা পাই না, কিন্তু সর্বত্র মিলিশিয়ার লোকটাকে দেখি। জানি না, আগে তো ওকে এত দেখা যেত না। ও লিয়ঁ'তে একই ট্রেনে আমার সঙ্গে ছিল। আমার অ্যালার্ম-ঘড়িটা যখন ঘড়ির দোকানে সারাতে নিয়ে গেলাম তখনো সেখানে তাকে দেখলাম। একবার গ্রামাঞ্চলে, সেই ছোট গ্রামটার কাছে যেখানে নীল জানালাওয়ালা একটা মস্ত কারখানা আছে—আমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা দুজন একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলাম। চারদিকের মাঠঘাট জনশূন্য। আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। হায়রে, আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না।

কসাইকে এখান থেকে পনের কিলোমিটার দূরে রেললাইন পাহারা দিতে মোতায়েন করা হল। একটা পুরো রাত। ও আমাকে বলেছে, জার্মানরা এখন পাহারার কাজে তাদের সাহায্য করার জন্যে সাধারণ ফরাসিদের এবং মিলিশিয়ার লোকদের নিযুক্ত করছে।

আমি যদি জানতাম এমিল কোথায় আছে তাহলে, তার কাছে পরামর্শ নিতে যেতাম। সবই এমন ঘটছে যেন এমিল আগের মতই আমার জীবনে দেখা দিয়ে তার দিক ঠিক করে দিচ্ছে। তাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে? আমি তো ঘুরেছি যথেষ্ট। আমি তুলুজ-এ গিয়েছি,মার্সেইতে গিয়েছি। এমিলকে আবার দেখার গোপন ইচ্ছে আমার ছিল। কোন-এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কোন এক নির্জন রাস্তায় সে কি হঠাৎ দেখা দেবে না? না, দেখা দেয়নি।

মার্শাল টিটোকে নিয়ে কসাই এখনো বিব্রত। শেষ পর্যন্ত সে-ও আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে, ঐ কসসাই। টিটো কি—তাতে তার কি আসে যাচ্ছে, যখন তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছেন? ঐ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি কেমন কেঁপে উঠলাম। মনে হল আমি যেন এমিলের গলা শুনলাম, ও তার নিজস্ব উচ্চারণে বলছে, 'সে স্পেনে রয়েছে, সে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছে…' তাহলে আমিও তো কসাইয়ের মত দেখছি। এমন কি আরো খারাপ। এমিল কি বলছে আমি বুঝতে পারছিলাম না, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়া। আমার মনোযোগ যাচ্ছিল তার উচ্চারণের দিকে, সে যা বলছিল তার দিকে নয়।

আর সেই ইভন, তার দুই নীল চোখ—সে বন্দীশিবিরে—খারাপ নয় মোটেই

ওপর—খারাপ নয়। এখন ডিসেম্বর। সামনেই বড়দিন। রোজেক্তের ছেলে-মেয়েরা কি দাদু-দিদিমার বাড়িতে খ্রীস্টমাসের গাছ পাবে? কত বয়েস হল তাদের? ছেলেটা বড়, তার নিশ্চয় ছ-বছর হল···আর মেয়েটা, মেয়েটা তো জন্মেছিল যখন···

এ বছর শীতটা সাংঘাতিক। আমি আর রেডিও শুনি না, বড্ড বেশি সময় যাচ্ছে, তেমন অদল-বদল কিছু হচ্ছে না। গত বছর, এই তিন মাস আগেও আমি মিত্রবাহিনীর অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম। একদিন-না-একদিন অবতরণ নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তা আর আমার কাছে অত্যাবশ্যক কিছু মনে হয় না। সেই ভারবাভাই বা ইভন বা রোজেৎ ওরা কি মিত্রবাহিনীর অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করেছিল? হাত লাগাতে হবে। হাত না লাগিয়ে এভাবে ব্যাপার চলতে দেওয়া যায় না। অস্ত্র, যদি অস্ত্র থাকত। সেই দিন রাস্তায় যখন আমি হলদে বাড়ির লোকটাকে আসতে দেখলাম। আঃ! অস্ত্র···

আমাকে রোজ সকালে খবরের কাগজ 'পাতি দোফিনোয়া' দেয়। সেটা কাগজ-ওয়ালা রেখে যায় আমার দরজার পেছনে, মানে মাছি আটকানোর জালমোড়া খোলা পাল্লা আর বন্ধ দরজার মাঝখানে। আমি যখন প্রাতরাশ করি তখন আমার বাড়িওয়ালী কাগজটা এনে আমাকে দেয়। ইদানীং কাগজটা খুব ছোট হয়ে গেছে, সপ্তাহে তিনবার বেরোয়। তারপর আবার গ্রানোবল-এ যখন ঐ সব ব্যাপার ঘটতে থাকে তখন কয়েকবার তো কাগজ আমি পেলামই না। ওরা ওখানে দুজন সাংবাদিককে হত্যা করে। আমি রেডিও আর শুনি না বলে, অন্তত নিয়মিতভাবে আর শুনি না বলে, ভিশির মিথ্যে কথায়-ভরা এই হাস্যকর কাগজটা সকালে পড়তে কিছু আগ্রহ বোধ করি। কফি গিলতে গিলতে বড় অক্ষরের একটা হেডিং আমার নজরে পড়ল। আবার, তোর নিকুচি··· দক্ষিণ ক্রান্সরাইখের জার্মান সামরিক অধ্যক্ষের ইস্তাহার সেটা···বিজ্ঞপ্তি··· তিনজনের প্রাণদণ্ড নিষ্পন্ন···নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ, ফলে নাৎসী-বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি...ওরা নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিত···এবং নাৎসী-বাহিনী যখন ওদের ঘিরে ফেলে তখন ওরা বাধা দেয়। নাৎসী-বাহিনীর এই ভদ্রলোকরা বলছে, তিনজন সন্ত্রাসবাদী। তিনজন সন্ত্রাসবাদীর নাম ওরা দিয়েছে···একজন ছাত্র, যার নামটা যেন আলোর আলো, দ্বিতীয়জনও ছাত্র, তৃতীয়জন ইস্পাত-কারখানার শ্রমিক—প্যারিসের এমিল দোর্য়াঁ।

এমিল···এমিল দোর্য়াঁ···প্যারিসের···

অস্ত্র—অস্ত্র, আমাকে অস্ত্র দাও। ভগবান সাক্ষী, আমি তো ফরাসি-বাহিনীতে লেফটেনান্ট ছিলাম। আমি বিদ্রোহীদের অস্ত্র চালানোর শিক্ষা দিতে পারব, আমিও। নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের শিবিরের সঙ্গে এখানকার

ডাক্তারের যোগাযোগ আছে। লোকের মুখে শুনলাম তিনিই এই সেদিন শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফিরে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলতে পারবেন...এমিল...এমিল...নাৎসী-বাহিনীর ক্ষতি করা...আর ঐ হারামজাদা মিলিশিয়ার লোকদের...আমি লেফটেন্যান্ট ভাঁদেরমাল্যাঁ, আমি আলুভাতে মার্কা ফাক ফ্যানি নই, স্বার্থপর বুর্জোয়া নই। এমিল...পাহাড়ে যেখানে বরফ পড়ছে সেখানে আজ বা কাল যে-প্রতিরোধ-দলে গিয়ে সে যোগ দেবে তারা কারা তা নিয়ে লেফটেন্যান্ট ভাঁদেরমাল'্যার একটুও মাথাব্যথা নেই। কোন-এক মার্শাল টিটো, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করুন বা শয়তানে বিশ্বাস করুন, কিছু আসে যায় না। তিনি যে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, হিটলারের বিরুদ্ধে সেটাই আসল...

প্রিয় এমিল...আজই। তোমার দেখা আমি চিরকালের জন্যে পেয়েছি,এমিল। আজ লেফটেন্যান্ট পিয়ের ভাঁদেরমাল'্যা তার জীবন নতুন করে আরম্ভ করছে। সাথীদের প্রতি তো বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে না।

যখন একজন পড়ে যায় তখন আর দশজনের উঠে দাঁড়ানো দরকার।

অনুবাদ / অরুণ মিত্র

আমার কাছে নিজের বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করার চাইতে সম্মানজনক এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আজকের দিনে ফরাসীরা তার নিজের দেশের মানুষের জন্যে আর্জিপত্রে নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারে না। ফ্রান্সের জন্যে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরও জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে অত্যন্ত সংগোপনে। কারণ জানানো তো দূরের কথা, অধিকাংশ সময়ে কর্তৃপক্ষ প্রাণদণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম পর্যন্ত ঘোষণা করার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে চাইতো না। সংবাদপত্রগুলোকে শুধু এইটুকু উল্লেখ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো যে অতজন 'শত্রুপক্ষের লোক,' অতজন 'আতঙ্কবাদী', নয়তো অতজন 'কমিউনিস্ট, ইহুদি বা সমর্থকদের' গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করা হয়েছে কিংবা অমুক দিনে গুলি করে মারা হয়েছে। শাতোব্রিয়াঁর বন্দীশিবিরে যে সাতাশজনকে গুলি করে মারা হয়েছে, আমি যদি তাদের নাম জানতে পারতাম, নিজের নামে স্বাক্ষর না করে এই বিবৃতিতে আমি তাদের সবার নামই ব্যবহার করতাম, কেননা তাদের কেউ কেউ আমাকে এই কাহিনীটি লেখার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলো।

১৯৪১ সালের অক্টোবরে ব্রিটানিয়ায় শাতোব্রিয়াঁর শিবিরটায় চারশোর বেশি রাজবন্দী ছিলো। এদের অধিকাংশই হয় কমিউনিস্ট, নয়তো কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করা হয়। প্রায় সবাই দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বন্দী হয়ে রয়েছে, শুধু অল্প কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যুদ্ধের শুরুতে। আগের মতো একই ক্লান্তিকর ধারায় গড়িয়ে চলেছে শিবিরের বন্দীজীবন, কেবল সমর্থনযোগ্য ছোট্ট একটা গুজব যে অচিরেই কয়েকজনকে মুক্তি দেওয়া হবে। হঠাৎ বিশে অক্টোবর, সেটা ছিলো সোমবার, বন্দীদের কাছে খবর পৌঁছলো যে চল্লিশ মাইল দূরে নাঁৎ-এ একজন পদস্থ জার্মান কর্মচারীকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে।

দুপুর একটা নাগাদ জার্মান সামরিক সদর-দফতরের একজন অফিসার শিবির পরিচালকের সঙ্গে গোপনে কি যেন পরামর্শ করলেন। ওটা বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন-কে বেছে নেওয়ার ব্যাপার। প্রায় দুশোজনের নথিপত্র সচিবের হাতে তুলে দেওয়া হলো, যিনি ওগুলো প্যারির আভ্যন্তরীণ-মন্ত্রকের কাছে নিয়ে যাবেন এবং ওখানেই শত্রুপক্ষের লোকজনদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা হবে।

কিন্তু ওদের শত্রুপক্ষের লোক বলা হয় কেন? ওরা তো কেউ জার্মান নয়? পদস্থ জার্মান কর্মচারীটিকে হত্যা বা হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গেও ওদের কোনো

সম্পর্ক ছিলো না। তা সত্ত্বেও ফরাসী সরকারের আভ্যন্তরীণ-মন্ত্রকই ওদের শত্রুর হাতে তুলে দিতো. হত্যা করার জন্যে জার্মানদের হয়ে ওই সরকারই অত্যন্ত কৃতার্থ চিত্তে ফরাসী বন্দীদের নামের তালিকা তৈরি করে দিতো।
সোমবারের সেই সন্ধ্যেবেলাতেই শিবিরের বাইরে ফরাসী প্রহরীদের পরিবর্তে জার্মান সান্ত্রী মোতায়েন করা হলো। পরের দিন সকাল নটা পর্যন্ত বন্দীদের ছাউনির মধ্যেই আটকে থাকতে হয়। রাত নটা নাগাদ ছায়া দেখতে পেয়েছে ভেবে সান্ত্রীরা হঠাৎ শিবির লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দশ নম্বর ছাউনিতে ঘুমেয়ে থাকা একজন বন্দীর কানের পাশ দিয়ে গুলিটা ছুটে বেরিয়ে যায়। জার্মান প্রহরীদের বিশ্রাম দেওয়া হলো মঙ্গলবার সকালে। সারাটা দিন গুজবের আর অন্ত নেই। সবাই বলাবলি করতে লাগলো শিবির থেকে তিনজনের নাম পাঠানো হয়েছে। এমন কি একজন ফরাসী আরক্ষীর হঠকারী মন্তব্যের ভিত্তিতে এমনও শোনা গেলো যে অধিকাংশ অপরাধীকেই বাছা হবে উনিশ নম্বর ছাউনি থেকে, যে ছাউনিতে বন্দীর সংখ্যা মাত্র একুশ। মঙ্গলবার রাত নটায় জার্মান সান্ত্রীরা আবার ফিরে এলো।
পরে উনিশ নম্বর ছাউনিতে বেঁচে থাকা একজন বন্দীর কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠি দেখেছিলাম। বন্দীটি লিখেছে, "সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আমরা গল্পগুজব করেছিলাম এবং কি ঘটতে চলছে সে সম্পর্কে কারুর সামান্যতমও কোনো বিভ্রান্তি ছিলো না। আলোচ্য বিষয় ছিলো—গিলোটিনে চড়ানো হবে, না আমাদের গুলি করে মারা হবে? সেদিনও রাত্তিরে কল্পিত ছায়ার অজুহাতে অন্য একজন সান্ত্রী গুলি চালিয়েছিলো। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ভোরের দিকে কোনো রকমে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম···
বুধবার সকাল নটায় আমরা গেলাম কফির জন্যে লাইন দিতে। সবাই স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম, এমন কি প্রায় দেখতেও পেলাম—সারা শিবির জুড়ে নেমে এসেছে প্রতিহিংসার উদ্যত থাবা। দশটা নাগাদ লেফটেন্যান্ট মরো এবং সহ-লেফটেন্যান্ট তুইয়া আমাদের ছাউনির পাশ দিয়ে রাজপথের ওপর শিবিরের প্রধান ফটকটার দিকে চলে গেলেন। ওঁদের ভঙ্গি দেখে মনে হলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাক যাতায়াতের পক্ষে ফটকটা উপযুক্ত কিনা সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছেন। কয়েক মিনিট পরে সহ লেফটেন্যান্ট তুইয়া আরক্ষী-সৈনাদের নতুন করে নির্দেশ দিলেন। শিবির পাহারার কাজে ওদের নিযুক্ত করা হলো, এমন কি নতুন নির্দেশে যে দলটাকে তুলে নেওয়া হয়েছিলো তাদেরকেও আবার ফিরিয়ে আনা হলো। ছাউনিতে ফিরে আসা বন্দীদের মুখেই খবরটা শুনলাম। আমরা সবাই তখন পি-১ ছাউনিতে ভিড় জমালাম, কেননা বন্ধুদের পাওয়ার সেটাই ছিলো আমাদের শেষ সুযোগ। দুপুরে আমরা টেবিল সাজালাম। বাড়ি থেকে পাঠানো বেশ বড় একটা মাছ রাঁধার ব্যবস্থা করেছিলো প্রুমার্শ। মিশেল তাকে হাতে হাতে সাহায্য করেছিলো।"

উনিশ নম্বর ছাউনিতে মধ্যাহ্ন-ভোজের আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়েছিলো দ্বিতীয় একটা চিঠি থেকে। বাকিছু সবর সমস্ত উজাড় করে সুন্দর একটা ভোজ দেবার জন্যে ত্যাঁবো তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলো। কে যেন জিগেস করলো, 'তোমার না তামাকের তিনটে প্যাকেট ছিলো? ধূমপান করে ওগুলো শেষ করে দিলে হয় না?' চায়ের জল গরম করতে ভুলে যাওয়ার জন্যে প্যুমার্শ নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলো। 'সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, তাই না? ওহে, জলটা এখুনি উনুনে চাপিয়ে দাও, নইলে হয়তো আমাদের আর চা খাওয়ারই সময় হয়ে উঠবে না।' সত্যিই তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো, জলটা ফুটে ওঠারও সময় পায়নি।

আবার আমরা প্রথম চিঠিটাতে ফিরে যাই: "বার্তলেমি আমারই টেবিলে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছিলো, থমকে জানলার দিকে তাকাতেই সে বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। কাঁটাতারের যে বেড়াটা আমাদের থেকে পি-২ ছাউনিটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম আরক্ষীসৈন্যের ছোট দলটা ফটকের দিকে মুখ করে 'প্রস্তুত' অবস্থায় স্থির হয়ে রয়েছে। তুইয়া নিজে ফটক খুলে একজন জার্মান অফিসারের সঙ্গে আরক্ষীবাহিনীর সেই ছোট দলটাকে মার্চ করিয়ে সোজা নিয়ে এলেন আমাদের ছাউনিতে। দরজা ঠেলে আমাদের অভিবাদন জানাবেন বলে তিনি মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর জার্মান অফিসারটির সঙ্গে এগিয়ে এলেন।

'আপনাদের সবাইকে জানাই আমার অভিবাদন,' অত্যন্ত নম্রভাবেই তিনি কথাটা বললেন। 'যাঁর যাঁর নাম ডাকা হবে, তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হন।'

প্রস্তুত আমরা হয়েই ছিলাম। সবাই দাঁড়িয়ে ছিলো আমার বিছানার সামনে, কেননা ভেতরে ঢুকতে বাঁদিকে ওটাই পড়ে সবার আগে। একটা তালিকা থেকে সহ-লেফটেন্যান্ট নামগুলো পড়ে চলেছেন—মিশেল, ত্যাঁবো, প্যুমার্শ বার্তলেমি ...মোট পনেরোটা নাম। ষোলো নম্বর নামটা দ্যলাভাকারির, কিন্তু এবার আর কেউ সামনে এগিয়ে এলো না। একটু নীরবতার পর কে যেন বললো, 'ও পি-১ ছাউনিতে।' সহ-লেফটেন্যান্ট তুইয়া ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, যাবার আগে পেছন থেকে কপাটটা টেনে দিলেন। ছাউনিতে আমরা তখন মাত্র ছ জন, মৃত্যুর সুনিশ্চিত কবল থেকে ফিরে আসা মানুষের মতো পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছি..."

অন্য একটা চিঠি থেকে জানতে পেরেছি: "দশ নম্বর ছাউনির দরজার সামনে সহ-লেফটেন্যান্ট পলকের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন, অদ্ভুত একটা হাসি ফুটিয়ে চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন. তারপর কেবল একটাই মাত্র নাম ডাকলেন -- গ্যী মকো। নামটা আমাদের গলায় গিলোটিনের তীক্ষ্ন ফলা কিংবা তপ্ত বুলেটের মতো সোজা হৃদপিণ্ডে গিয়ে বিঁধলো।" মকো রীতি-

মতো লম্বা-চওড়া, সতেরো বছরের অমলধীত কিশোর, যাকে সব বন্দীরাই অসম্ভব ভালো বাসতো।

প্রথমটা ছাড়া আর সব ছাউনি থেকেই একজন দুজন করে অপরাধীদের সংগ্রহ করার কাজ শেষ হবার পর আরক্ষী-সৈন্যের ছোট দলটা কুচকাওয়াজ করতে করতে হাসপাতালের দিকে চলে গেলো এবং গারদেৎকে নিয়ে আবার ফিরে এলো। গারদেতের তখন হাঁটারও ক্ষমতা ছিলো না। সব মিলিয়ে মোট সাতাশ জন। পি-২ শিবিরের মাঝখানে ছ নম্বর ছাউনিতে ওদের সবাইকে বাড়িতে শেষ সংবাদ পাঠাবার জন্যে একটুকরো কাগজ আর একখানা করে খাম দেওয়া হলো। কেরভিয়েল নামে একজন মাত্র অপরাধীকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার এবং তাকে বিদায় জানাবার অনুমতি দেওয়া হলো, যে ওই একই শিবিরের বন্দিনী।

এখন সব ছাউনিতেই বন্দীরা অপেক্ষা করছে। টেবিল চেয়ার আর শয্যাগুলোকে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে এনে সবাই তার ওপর দাঁড়িয়ে জানলার সামনে ভিড় করেছে। বের গির্জার যাজককে শিবিরে প্রবেশ করতে দেখা গেলা। চাপা স্বরে অনেকেই বলাবলি করলো শাতোব্রিয়াঁর যাজক নাকি জার্মানদের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখেন না। স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাদাম কেরভিয়েলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো। এখন সমস্ত আশাই নিশ্চিহ্ন। দুটো পঁচিশে যাজক ছ নম্বর ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন। কাঁটায় কাঁটায় যখন আড়াইটে, রাজপথে বড় বড় জার্মান ট্রাকগুলো এসে থামলো। ছ নম্বর ছাউনি থেকে ভেসে আসছে একটা গানের সুর : ফরাসী বিপ্লবীদের সংগীত—মার্সেইএজ। দেখতে দেখতে সারাটা শিবির প্লাবিত হয়ে উঠলো সেই গানের সুরে।

তিনটের সময় তিনটে জার্মান ট্রাক এসে থামলো ছ নম্বর ছাউনির সামনে। সহ-লেফটেন্যাণ্ট দরজা ঠেলে আর একবার নাম ডাকতে শুরু করলেন। নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে সামনে এগিয়ে আসছে আর আরক্ষী-সৈন্যরা তাদের পকেট খালি করে হাতদুটো একসঙ্গে বেঁধে প্রত্যেককে ট্রাকে উঠতে সাহায্য করছে। প্রতিটা ট্রাকে নজন করে শত্রু। জানলায় ভিড় করে দাঁড়ানো অন্যান্য বন্দীদের ওরা বাঁধা অবস্থাতেই হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে আর সারাক্ষণই মার্সেইএজ গেয়ে চলেছে।

ডাক্তার তেনিন তাঁর ট্রাক থেকে জার্মান অফিসারটিকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই যে মশাই, শুনছেন ···মনে রাখবেন, জার্মান গুলিতে ফরাসীদের মরাটা গৌরবজনক। কিন্তু...' মকোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে উনি বললেন, 'সতেরো বছরের এই কিশোরটিকে গুলি করে মারাটা জঘন্যতম অপরাধ।'

সেদিন বিকেলে যা যা ঘটেছিলো, বহু বন্দীর চিঠি থেকে তা স্পষ্টই জানতে

পেরেছি, প্রয়োজন বোধে প্রতিটা খুঁটিনাটি বিবরণের জন্যে তা উদ্ধৃতও করতে পারি। একজন বন্দী জানিয়েছে, "আমাদের ছাউনির সবাই গায়কদের মধ্যে থেকে ভাঁবোর চড়া আর মকোর কচি সুরেলা কণ্ঠস্বর আলাদা করে চিনতে পেরেছি। কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছি রোদ্দুরে শীর্ণ ছায়াগুলোকে নড়াচড়া করতে। আমাদের অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয়নি যে কমরেড-দের ট্রাকে তোলা হচ্ছে। বিদায় মুহূর্তে ওদের দেখার জন্যে আমরা সবাই উত্তরের জানলাগুলোতে ভিড় করলাম। প্রতি দশগজ অন্তর আরক্ষী-সৈন্যরা তখনও নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর খানিকটা দূরে, ফটকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার উঁচু মিনারটার নিচে,মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা রাইফেল হাতে জার্মান সৈন্যদের গাঢ় মূর্তিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ ফটকের সামনে ঘোড়ায় টানা একটা এক্কা এসে থামলো—দুধওয়ালি। একজন প্রহরী লাগাম ধরে গাড়ির মুখটাকে ঘুরিয়ে ঘোড়ার দাবনায় চাপড় মেরে ওটাকে ফটকের সামনে থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিলো। ছায়া তখন ম্লান হয়ে এসেছে,ঝির-ঝিরে একটা বাতাস বইছে। শেষ শরতের তুলনায় আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার। শিবিরের কড়া নির্দেশ অনুযায়ী কাউকেই বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি। কেবল আমাদের ফক্স-টেরিয়ার, কিকি, বেলাশেষের রোদে ঘাসের ওপর আনন্দে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অবশেষে ইঞ্জিন চালু করার শব্দ শোনা গেলো,ট্রাক-গুলো এবার ছেড়ে দেবে। আমাদের আশে-পাশে, এমন কি বেড়ার ওপারের ছাউনিগুলো থেকেও আরও জোরে আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মার্সেইএজের সুর, যেন সারা বন্দীশিবিরটাই গান গাইছে। প্রস্তুতের ভঙ্গিতে রাইফেল উঁচিয়ে আরক্ষী-সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রয়েছে—একের পর এক ট্রাক তিনটে শিবির ছেড়ে বেড়িয়ে গেলো। সামরিক সম্মানে মৃত্যুবরণ করার জন্যে আমাদের কম-রেডদের নিয়ে যাওয়া হলো।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ছাউনি ছেড়ে অন্যসব বন্দীরা বাইরে বেরিয়ে এলো। কুচকাওয়াজের ময়দানে চারশো বন্দী সমবেত সুরে মার্সেইএজ গাইছে। সহ-লেফটেন্যান্ট তুইয়া, সাতশজন বন্দীকে ট্রাকে তুলে দেওয়া জার্মান অফি-সারটার সঙ্গে যাঁকে একটু আগে করমর্দন করতে দেখা গিয়েছিলো, সেই মুহূর্তে যাঁকে কেমন যেন ক্লান্ত আর বিব্রত মনে হচ্ছিলো, পরক্ষণেই তিনি জার্মান সান্ত্রীদের লক্ষ্য করে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। পরস্পরের মধ্যে আকারে-ইঙ্গিতে বন্দীরা হঠাৎ গান থামিয়ে দিলো আর সেই নৈঃশব্দ্য জল্লাদদের কাছে বৈপ্লবিক গানের সুরের চাইতে আরও ভয়াবহ বলে মনে হলো। এমন কি সহ-লেফটেন্যান্টও তখন বন্দীদের ছোটখাটো দু একটা প্রশ্নের জবাব না দেবার মতো সাহস অর্জন করতে পারেননি—নামের তালিকা ছাড়াও যে সংবাদ দলে দলে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সারাটা শিবিরে। তুইয়া জানিয়েছেন ট্রাকে নিয়ে যাওয়া বন্দীদের চারটে পনেরোয় গুলি করে মারা হবে। সঙ্গে সঙ্গে

বন্দীরা সিদ্ধান্ত নিলো ঠিক ওই সময়টাতেই ওরা সবাই এক জায়গায় সমবেত হবে।

চারটে পনেরোয় সবাই ছাউনির বাইরে এসে দাঁড়ালো, যেন এখুনি হাজিরার নাম ডাকা হবে। সবাই নিশ্চুপ, কারো মাথায় কোনো আবরণ নেই। একের পর এক নিয়ে যাওয়া বন্ধুদের নামগুলো উচ্চারণ করা হচ্ছে, আর তার জবাবে কোনো না কোনো কমরেড জানিয়ে দিচ্ছে, 'গুলি করে মারা হয়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জানাবার মতো নতুন কোনো ঘটনাই ঘটেনি, কেবল মাদাম কেরাভিয়েলের দুঃসাহসিকতা ছাড়া। স্বামীকে বিদায় জানাবার জন্যে উনি যখন ছ নম্বর ছাউনিতে এসেছিলেন, মকোকে দেখে সত্যিই খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন মকোর পরিবর্তে ওঁকে নেওয়া হোক। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চান, কিন্তু কিশোরটি বাঁচুক। ওঁর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এখন অন্ধকারে অন্য বন্দিনীদের সঙ্গে উনি দুটো মহিলা ছাউনির মাঝের আঙিনাটুকুতে, পায়চারি করছেন। এক সময়ে উনি ওদের বললেন, 'মিছিমিছি আমরা কেন বুক চাপড়ে কাঁদতে যাবো? আমরা তো এখানে ফুল তুলতে আসিনি, এসেছি সংগ্রাম করতে।' একটু চুপ থেকে উনি কি যেন ভাবলেন। 'যাই ঘটুক না কেন, রোববারে আমোদ-প্রমোদের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার যেন কোনো পরিবর্তন না হয়। সারাটা সন্ধ্যে উনি সবার সঙ্গে ওই ভাবেই কথা বললেন, কিন্তু রাত্তিরে ছাউনিতে ফিরে আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু পরের দিন ভোরে দেখা গেলো উনি আবার ঠিক আগেরই মতো দুঃসাহস আর শুদ্ধতায় ভরা—শান্ত, স্থির।

বৃহস্পতিবার বন্দীরা হত্যানুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারলো। অপরাধটা সংগঠিত হয়েছিলো শাতোব্রিয়া' থেকে দু কিলোমিটার দূরে একটা বালিখাদে। বিপ্লবী-সংগীত গাইতে থাকা অপরাধীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো শহরের মধ্যে দিয়েই। অতিক্রম করে যাওয়ার সময় শহরের প্রতিটি মানুষ মাথা থেকে টুপি খুলে তাদের অভিবাদন জানিয়েছিলো। বালিখাদের আশে-পাশের বাড়িগুলো জার্মানরা ঘিরে ফেলে মেশিনগান উঁচিয়ে কৃষকদের দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার নির্দেশ দিয়েছিলো।

বালিখাদে তিনটে সারিতে মোট নটা খুঁটি আগে থেকেই পুঁতে রাখা হয়েছিলো। তিনক্ষেপে হত্যাপর্ব সমাধা করা হলো—তিনটে পঞ্চান্নয়, চারটেয় এবং চারটে দশে। সাতাশজন বন্দীকেই চোখ না বেঁধে হাত খোলা অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। অন্তিম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত ওরা সমানে গান গেয়েছিলো আর দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠেছিলো: 'ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক! সোভিয়েত রাশিয়ার জয় অনিবার্য! কমিউনিস্ট পার্টি লাল সেলাম!'

ক্যারারিং স্কোয়াডের কম্যান্ডিং অফিসারটিকে ডাক্তার তীনন বলেছিলেন, 'একজন ফরাসী অফিসার কি ভাবে মারা যায় এখুনি নিজে চোখে দেখতে পাবেন।' দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার খনি-শ্রমিক ত্যাঁবো তারই দিকে তাগ করা দশজন জার্মান সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলো, 'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক!' ট্রাক থেকে নামার সময় ত্যাঁবো একজন আরক্ষী-সৈন্যের কাছে শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে নেবার জন্যে আগুন চেয়েছিলো, তখন সে যে কটা কথা তাকে বলেছিলো, মরতে চলা মানুষগুলো ছাড়া সে কথা আর কেউই শুনতে পায়নি। পরে সেই আরক্ষীটি এ সম্পর্কে তুইয়াকে কিছু জানাতেই তিনি মৃত মানুষের মতো একেবারে পাংশুল হয়ে উঠেছিলেন।

আর সামরিক-আরক্ষীরা অবশ্য ব্যাগের মধ্যে রাখা নিহত সাতাশজন ব্যক্তির যাকিছু সম্পদ অন্যসব বন্দীদের কাছে উপুড় করে দিয়েছিলো—কারুর ঘড়ি, কারুর আংটি, কারুর বা একখানা চিঠি। সারা শিবির, সারাটা শহর জুড়ে নেমে আসা বেদনাবিধুর সেই আতঙ্ককে ওরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়েছিলো। কফিনের পরিবর্তে জার্মানরা যে প্যাকিং বাকসের ব্যবস্থা করেছিলো, সেই অবস্থায় কবর দেওয়ার ব্যাপারটা শাতোব্রিয়াঁর নগরপাল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে সে রাতটার জন্যে মৃতদেহগুলোকে রেখে দিতে হয়েছিলো পৌরভবনে। কফিনের ব্যবস্থা করা হলো পরের দিন সকালে। আরক্ষদেরই কাছে থেকে পাওয়া খবর—কফিনের তুলনায় একটি মৃতদেহ এত বড় ছিলো যে একজন জার্মান সৈন্যকে শাবল দিয়ে জোর করে ঢোকাতে হয়েছিলো। পৌর-কবরখননকারী এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে, সেই জার্মান সৈন্যটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠেছিলো, 'চুপ কর্ ফরাসী কমিউনিস্ট কুত্তা কোথাকার!'

সেদিনই আশপাশের বিভিন্ন কবরখানায় কফিনগুলোকে তিনটে তিনটে করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো। পরিবারবর্গকে কবরখানাগুলো পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো বটে, কিন্তু কোনটে কার কবর তা ওরা কেউ বুঝতে পারেনি, কেননা কফিনের গায়ে কোনো নাম ছিলো না।

হত্যাপরাধ অনুষ্ঠিত হবার পরের দিন থেকেই আশপাশের মানুষ নিয়মিত সেই বালিখাদটাতে তীর্থস্থানের মতো পরিদর্শন করে আসছে। খুঁটিগুলো তখনও পোঁতা ছিলো, বালিতে জড়িয়ে ছিলো চাপ চাপ কালো রক্তের দাগ। ছাব্বিশে অক্টোবর, রোববার খুঁটিগুলোকে সরিয়ে ফেলা হলো, কিন্তু তার আগেই পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ পায়ে হেঁটে সেই বালিখাদটাতে ফুল রেখে এসেছে।

আরক্ষী-সৈন্যের মাধ্যমেই এ সমস্ত কাহিনী শিবিরে পৌঁছেছিলো, এমন কি ওদের কাছ থেকে হত্যাপরাধের বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া গিয়েছিলো। যে

শী মকোকে শিবির থেকে বিদায় নেবার সময় চোখের জলে ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছিলো,অন্যদেরই মতো সারাটা পথে তার সাহসের কোথাওকোনো অভাব ছিলো না। বালিখাদে পেঁছে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে অচেতনা অবস্থাতেই তাকে গুলি করে মারা হয়েছিলো! মাকে লেখা তার শেষ চিঠির একটা নকল আমি দেখেছিলাম ঃ "সত্যিই আমি মরতে চাইনি, মামণি। তবু অন্তরের সবটুকু দিয়ে আমি বিশ্বাস করি, এই মৃত্যু কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করবেই। আমার ছোট ভাইটির কাছে এই আমার শেষ বিদায়—ওকে বোলো মন দিয়ে পড়াশুনা করতে আর সত্যিকারের মানুষ হতে শিখতে। সাড়ে সতেরোটা বছর আমার জীবনে খুবই অল্প সময়, তবু তার জন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই।"

সেই থেকে প্রতি বছর, পয়লা নভেম্বর, পুণ্যদিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে অগণন তীর্থযাত্রীর সমাগম হতো ওই বালিখাদটাতে। যেখানে যেখানে খুঁটিগুলো পোঁতা ছিলো, সেইসব জায়গা আর কবরখানার নতুন কবরগুলো-কে ওরা ফুলের মালা আর তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দিতো। জার্মান কর্তৃপক্ষ এইসব তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো এবং ফুল নিয়ে আসা 'অপরাধী-দের' খুঁজে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো,কিন্তু ওরা একজনকেও ধরতে পারেনি।

অনুবাদ / অসিত সরকার

প্রবন্ধ

স্যাঁ-পল রু, অথবা আশা

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর এটাই আরাগঁ-র প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে, বর্ষীয়ান কবির মৃত্যু-পরিস্থিতির কথা শুনে, অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন আরাগঁ। তার ঠিক পরেই, এক আবেগঘন মানসিক অবস্থায়, এ প্রবন্ধ লেখেন তিনি। জার্মানরা যখন ব্রিট্যানি বিধ্বস্ত করে, স্যাঁ-পল রু তখন বাস করছিলেন কামারে গ্রামের কোনিলিয়ো বাসভবনে—নামটা তাঁরই দেওয়া। জায়গাটা ব্রেস্ত্-এর কাছেই। সঙ্গে ছিলো তাঁর কন্যা দিভিনে, আর মারি নামে একজন পরিচারিকা। কামারের পতনের কয়েকদিন পর চারজন মাতাল সৈনিক কবির বাড়িতে প্রবেশ করে দিভিনের ওপর চড়াও হয়। তার আর্তনাদ শুনে ছুটে আসে পরিচারিকাটি, আর মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যান বৃদ্ধ কবি। মারিকে গুলি করে সৈনিকরা। কবিকে আঘাত করে রাই-ফেলের কুঁদো দিয়ে। কয়েকদিন পর মারা যান স্যাঁ-পল রু।
পয়েজি পত্রিকার ১৯৪০ সালের শরৎ সংখ্যায় প্রবন্ধটি আরাগঁ-র নামেই প্রকাশিত হয়। পয়েজি প্রকাশিত হতো বৈধ ভাবেই। তাই আরাগঁকে নিজের বক্তব্য রাখতে হয়েছিলো পরোক্ষভাবে। তা সত্ত্বেও, ভিশি সেন্সরশিপ বাদ দিয়ে দেয় বেশ কয়েকটা অনুচ্ছেদ, যেগুলো হয়তো অসন্তুষ্ট করে তুলতো বিজেতাদের। মুক্তির পর প্রকাশিত পয়েজি-র প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকরা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটা পুনর্মুদ্রিত করেন। এখানে সেই পুনর্মুদ্রিত পাঠটাই দেওয়া হলো।

*

১১ নভেম্বর, ১৯১৮ : ঘোষিত হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান। আর কবিতা হারালো তার স্বপ্নচর গায়ক গীয়ম অ্যাপোলিনেয়রকে। স্পেনীয় যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকার মৃত্যু দিয়ে, শেষ হলো আমাদের শান্তির অন্তিম বসন্তে—ঠিক ফ্রান্সের সীমান্তে মারা গেলেন কবিতা নির্মানের যন্ত্রউদ্ভাবক অন্তোনিও মাচাদো। এক কবির হত্যার পথ বেয়ে একইভাবে শেষ হলো আমাদের নিজেদের বিপর্যয়। বিখণ্ডিত ফ্রান্সে আমরা মৃত্যুর হিসাব করতে বসলাম। আর সেই মৃতদের মাঝে, সনাক্ত করা গেলো স্যাঁ-পল রুকে, যিনি পরিচিত ছিলেন 'অনন্য' নামে। বিচিত্র এক ভবিতব্য। তাঁর মৃত্যু ঢাকা পড়েছিলো নিবিড় রহস্যের মোড়কে। ব্রিট্যানি, যেখানে মায়াময় মূর্তিরা আসে সাগরের সান্নিধ্যে তার সীমান্তে কিভাবে শেষ হয়ে গেলেন তিনি—বলতে গেলে দ্বিধান্বিত হতে হয়। এমন কি জীবিতাবস্থাতেও নীরব হয়ে গিয়েছিলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

একদিন কিন্তু আমাদের তরুণেরা অবাক হয়ে ভাববে—তাঁর জীবদ্দশায় কেন তাঁকে এত অবহেলিত হতে দিয়েছিলাম আমরা! ফরাসী পদ্যের পুনর্গঠনে, উৎকট ছন্দ আর অতিশয় চিত্রকল্পের গণ্ডী থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজে আঁসিয়েনেৎসের রচয়িতার ভূমিকাকে আজও আমরা স্বীকৃতি দিইনি। লাঁসো, দুমিক্ ধরনের পাঠাপুস্তকে তাঁর অনুপস্থিতি যতটা ভাস্বর, ততটা আর কেউই নয়। কালো এক হীরে। এই মুহূর্তে আমার কাছে তাঁর কোনো বই, বিশেষত লা বুক্ এমিসোর [পাপের বোঝাবাহী পালানো ছাগল] থাকলে বর্ণনা করতে পারতাম কিভাবে জন্ম নিয়েছিলো ৭-৫ বা ৫-৭ ষট্-মাত্রিক ছন্দ, আ্যাপোলিনের-এর সময়কালে যা পেঁছেছিলো-এক গৌরবদীপ্ত উৎকর্ষতায়। কিন্তু শুধু মৃত্যুই স্যাঁ-পল রু্য-কে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত আর এই মৃত্যুর মাঝে লুকিয়ে আছে এমন কিছু প্রতীক যা স্পষ্ট হবে ভবিষ্যতে। আমি শুধু বলতে চাই কোন্ পরিস্থিতিতে জেনেছিলাম 'অনন্য'-র পরিণতির কথা।

জুন মাসের প্রথম দিক। পটভূমি ডান্‌কার্ক। আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত মৃত্যুধারা। আমরা পার হয়ে গেলাম বিধ্বস্ত শহর। চোখে পড়লো সেই হতশ্রী স্টিমারটা। ভোরের বেলায় ওই স্টিমারই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের। স্টিমারটা মরক্কোবাসীতে ঠাসা। সংকীর্ণ এক ফেরীঘাটে আমাদের ফেলে রেখে ভেসে গেলো সেই স্টিমার। আর কোনো বোট আসার আশাও বড় ক্ষীণ। পকেটে আমরা অনুভব করতে পারছি ম্যালোল-বেঁ্য-র বালুকনা আর বুকের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি। আমার সঙ্গী ত্রিশজন ছাত্র। ওদেরকে আমি শিখিয়েছি আনুগত্যের কৃত্রিম আদব-কায়দা আর প্রাথমিক চিকিৎসা। উপকূল-মুখী সুদীর্ঘ যাত্রায় দু পাশ থেকে শত্রুর অবিরাম গুলিবর্ষণে নিদারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে, সমুদ্রের মুখোমুখি খোয়া-পাথরে উবু হয়ে বসে আছে ওরা। সমুদ্রের চড়ায় আটকে আছে দশখানা জাহাজ: আমাদের সম্ভাব্য পরিনতির ইঙ্গিত বুঝি। ঠিক তখনই ওরা গাইতে শুরু করেছিলো 'কামারের মেয়েরা'*

আমাদের এ বিছানার মশারি
লাল-রঙা কাপড়ে যে তৈয়ারি···

আকস্মিকভাবেই, ঐ অশালীন সঙ্গীত আমাকে পেঁছে দিলো অনেক দূরান্তের এমন এক জায়গায়, যে জায়গা আবার দেখার আশা আমি করিনি। সেই নীলাভ উপসাগর, তার রক্ত-লাল সব শিলা, যেখানে, যেন কোনো গহন স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম কোমিলিয়া বাসভবনের অধীশ্বর 'অনন্য' স্যাঁ-পল রু্যকে।

---

* "কামারের মেয়েরা", এক অশ্লীল গান, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিলো। ব্রিটানির এই কামারে নামক গ্রামেই বাস করতেন স্যাঁ-পল রু্য, আর সেখানেই তিনি মারা যান।

আমাদের সামনে সমুদ্রের মধ্যে যেন নিজের মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির ফ্রান্স, এবং সেই স্পন্দমান স্থানে ওই চিন্তাটুকুই হয়ে উঠতে পারতো আমার অন্তিম চিন্তা।

সেই মুহূর্তে আমার জানা ছিলো না, আমি বুঝতে পারিনি ওই কবির স্বপ্ন দেখাটা কত আশ্চর্য ছিলো। এই সেই কবি, যাঁকে প্রায় পনেরো বছর আগে, যৌবনের সবথেকে অশান্ত সময়ে, কাঁটার মুকুটের মত শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেছিলাম আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধুরা—যে শ্রদ্ধা প্রত্যাখ্যান করেছিলো বধির পৃথিবী।

(ক্লসের দা লাইল্যা-র ভোজসভায় স্যাঁ পল রু্যাকে সংবর্ধনা জানানোর সেই রোদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ন আমি যেন এখনও দেখতে পাই। আর কি অবশিষ্ট আছে তার? সমস্ত ভনিতা আর ভুলত্রুটি সত্ত্বেও এই সত্যটুকু থেকে যায় যে বিস্মৃত স্যাঁ-পল রু্যা অন্তত একবার এমন কিছু জনের কাছ থেকে আবেগ-রঞ্জিত অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, যাদের কাছে কবিতা ছিলো প্রজ্ঞার থেকে অধিক কিছু, পেয়েছিলেন এমন জনদের কাছ থেকে যারা নির্মাণ করতে চেয়েছিলো তাঁর সম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার এক স্মৃতিসৌধ। 'অননা'-র প্যারিতে প্রত্যাবর্তন সম্ভবত ওই উদাসীনতাকে সাময়িকভাবে চঞ্চল করে তুলেছিলো, যে শহর বরাবার কাব্যিক চিত্রকল্পের বদলে মনোহর টুপির দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে সহজে। তাঁর প্রত্যাবর্তন হয়তো বা মৃত্যুপথযাত্রী র‍্যাবোঁ মার্সেইতে অঘোষিত ও অলক্ষিত প্রত্যাবর্তনের এক ক্ষুদ্র বদলাই ছিলো। সেই আশ্চর্য বিকেল উদযাপিত হয়েছিলো কোনো সূর্যগ্রহণ অথবা ধূমকেতুর গতিপথের মতো, এবং সেই বিকেলটুকুই, অবশেষে যখন মারা গেলেন স্যাঁ-পল রু্যা, ফরাসীদের কাছে তাঁর নামকে আজ সমাধিফলকে উৎকীর্ণ কোনো নামের থেকে বেশি কিছু করে তুলেছে। এই কবির রচনা উপলব্ধি করার জন্যে ফ্রান্সের এখনও বহু বছর ও বহু পরিবর্তন দরকার। স্বয়ং শার্ল পেগীই সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছেন।

পরাজয়ের সড়কে দাঁড়িয়ে আরও একবার কোসিলিয়ঁ বাসভবনের অম্বিরের ছবিটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ও পুনরাতিক্রম করে নর্ম্যাণ্ডি থেকে দক্ষিণমুখী চলেছিলাম আমরা, এক দীর্ঘ যাত্রীদল। আমাদের গাড়িগুলো আহত মানুষজনে একেবারে ঠাসা। তখন, বিধ্বস্ততার চিহ্নগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে, প্যারি থেকে আগত উদ্বাস্তুদের আমরা প্রথম দেখেছিলাম। হরেক রকম ঝোলাঝুলি আর গৃহস্থালির জিনিসপত্র গাদা করা চাকা-লাগানো ছোট ছোট গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। শত্রুবাহিনী আগুয়োন। তাই উঁচু সড়ক ছেড়ে নেমে যাচ্ছিলাম আমরা। সেই উঁচু সড়কের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ওরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলো, 'এটাই কি রেন্তে যাবার রাস্তা? আমরা কাম্যারেতে যাবো গো।' মনে হলো, এরা কি

উন্মাদ ! সমুদ্রমুখী পথ শহরে সাঁজোয়া-বাহিনীর জন্যে উন্মুক্ত, ওদের সমগ্র গ্রামাঞ্চল, ক'শে-র বনভূমি, আর সেইপলমুখী এইসব ভুল্যাট জুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। আমি চিৎকার করে ওদের বললাম লোয়ার নদীর দিকে যেতে, ব্রিট্যানি আর কামারের দিকে যেন না যায়। আর তখনই আমি আরও একবার উচ্চারণ করলাম সেই শহরের নাম, যে শহর আমার কাছে 'অনন্য'-র শহর। ক্যালভারির পথযাত্রী পিটার-এর মতো আমিও জানতাম—আমাদের উপেক্ষিত কবিকে আবারও অস্বীকার করছি আমরা, দেশের শেষ শৈল-শ্রেণীতে ফেলে রেখে যাচ্ছি তাঁকে, ঠিক যেমনভাবে ইস্পাত-প্রবাহ আর সাগরের ধাবমান জলরাশির মাঝে অবরুদ্ধ হয়েছে আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের দুর্দশা।

শান্তিময় গ্রামাঞ্চলের ওপর দিয়ে, শস্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চললাম আমরা, সেই ধর্মীয় যুদ্ধের পর থেকে এইসব গ্রাম-ক্ষেত কখনও কোনো সৈনিকের পদশব্দ শোনেনি। চললাম তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ভেসে বেড়িয়েছে শুধু গান, আর গানের সুর। পায়ে পায়ে পেরিয়ে গেছি অনেক দুর্গ, অনেক শহর, পেরিয়ে গেছি কত কত স্পন্দমান স্থান, যেখানে মিনতি জানিয়েছে ইতিহাসের স্মৃতি আর উপকথার অশ্রু—আমাদেরও নিয়ে চলো সঙ্গে। অবশেষে পথচলা থেমেছে সুউচ্চ দুর্গময় এক অঞ্চলে, যেখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসেছে সিরানো দারতাঞা আর কাস্তেঁ ক্যাকাসে-র প্রেত। সন্ধ্যায় বেতারযন্ত্রের পাশে বসে কথা বলেছি নিজেদের যন্ত্রণা নিয়ে, এবং অগ্রিপা দোবিনে'র (এক প্রোটেস্ট্যান্ট সৈনিক এবং ষোড়শ শতাব্দীর কবি) সঙ্গে তাঁর নিজের দেশে দাঁড়িয়ে গলা মিলিয়ে বলেছি ঃ

গভীর গহন শহরগুলো সীমান্তের গায়ে···

আমাদের হৃদয়ে আর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণার ছোঁয়া, কার জন্যে অথবা কোন মহত্ত্বের জন্যে এই শোক, তেমন স্পষ্ট ছিলো না।

তারপর, মাটির বুক থেকে যখন নেমে গেলো জল, তখন একদিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্ত্রব্যবসায়ীদের এক শহরে। কাগজের মণ্ড আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া প্রাচীন এক নগরের ছায়ায় সেই শহর। রাস্তায় আমারই মতো হেঁটে চলেছে মানুষ-জন। পরনে তাদের তকমা-খুলে-দেওয়া পুরনো পোশাক বা উর্দি। অলস, পরাজিত মানুষ। প্লাস ওজেরব্-তে লাতিনলিপি উৎকীর্ণ এক লালচে ফোয়ারা এবং বাজার, বোতলভরা সুরার নমুনা সাজিয়ে ভিড় করে রয়েছে সুরাপ্রস্তুতকারকরা। আর সেই ভিড়ের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছেন এক দীর্ঘদেহী মানুষ, পেছনে তাঁর গ্রেট্ ডেন্ কুকুর ঃ বড় সম্ভ্রান্ত পশু, সাধারণ যাদা একে দেওয়া যায় না। কাছাকাছিই বাস করতেন এক কবি, বিগত যুদ্ধের সময় থেকে অন্ধ এবং শয্যাশায়ী, কিন্তু চোখদুটি

বঞ্চিত হলেও অবিরাম সৃজন করে চলেছিলেন নিজের জগৎকে। তাঁর কাছ থেকে জানলাম—দীর্ঘদেহী ওই মানুষটি লরেন্স, স্যাঁ-পল রুা-র পুত্র। প্রায় একই সময়ে মরক্কো থেকে আসা একটা চিঠি এবং প্যারি থেকে আসা এক পর্যটকের কাছ থেকেই 'অনন্যা'-র মর্মান্তিক মৃত্যু ও তাঁর কন্যার করুণ পরিণতির কথা আমি বিশদভাবে জানতে পারি। স্বর্গকে অবজ্ঞা করে যে মেয়ের নাম রাখা হয়েছিলো দিভিনে, তাঁকে আহত করেছে, অবমাননা করেছে জাহান্নামের শয়তানরা। সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিলো দায়সারা দুটো লাইন। আমার মাতৃভূমির গোপন ক্ষতগুলোই তার গভীরতম ক্ষত : যাদেরকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে অথবা উপেক্ষা করা হয়েছে নীরবে। মাতৃভূমির শহীদদের আজ আমরা সম্মান জানাতে পারি শুধু আমাদের অন্তরে, কিন্তু একদিন তার অনামী বীরদের পদচিহ্ন চুম্বন করবো আমরা। কে করবে ফ্রান্সের যন্ত্রণার হিসেব? তার প্রকৃত ক্ষতের, অপরিসীম ত্যাগের, তার অদ্যাবধি অস্বীকৃত শৌর্যের যথাযথ, বিস্ময়কর পরিমাপ করবে কে? অবর্ণনীয় আতঙ্কের মধ্যে বাস করে এসেছে এমন সব মানুষকে আমি তো হাসতে দেখেছি। এখনও কি আমরা শিখবো না কিভাবে স্বীকৃতি দিতে হয় সৌন্দর্যকে···

এই শহরে, আমারই বন্ধুর বাসায় খুঁজে পেয়েছিলাম অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাস এক কবির বেশ বড় একটা বাঁধানো পাণ্ডুলিপি কবিতা আর প্রবন্ধের সংকলন। অননুকরনীয় শর্টহ্যান্ড ধাঁচের হস্তলিপিতে স্যাঁ-পল্ রুার রচনাসংকলন। হয়তো বা ঘটনাচক্রেই আমার হাতে এসে পড়েছিলো ওই পাণ্ডুলিপিটা। কিন্তু এমন সব বিষয়বস্তুই বাছাই করা হয়েছিলো লেখার জন্যে, যার বহু বাক্য আমাদের জীবনের এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ব্যাপারটা ঠিক আপতিক নয়। 'লে রূপোজোয়র দ্য লা প্রসেসিয়' (চলার পথের প্রতিটি সরাই-খানা) থেকে 'ভান-মেলা কবরখানা' নামে একটা কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা। কবিতাটা এ রকম :

চলে গেছে ওরা, চলে গেছে ছোট ছোট মেষপালকেরা,
গোঁফ যাদের বাদামী, শান্ত গাঁয়ে ঘর, যেখানে ঈশ্বর-
পুত্ররা চন্দ্রালোকের মতো বিবর্ণ আর পূর্ব-পুরুষেরা
ক্যালভারির প্রস্তরতুল্য বর্ণময়।
চলে গেছে ছোটরা, মৃত কোনো গাধাকে প্রহার করছে
এক মদ্যপ, তার শবের কাছে, সীমান্তের প্রান্তে, চলে
গেছে ওরা।
ওদের মাতার মাতা, উপেক্ষিতা, তাই ক্রন্দনরতা :
'জলের কিনারা ছুঁয়ে আমাদের দেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন
করে দিলো কে; প্রচুর মদিরা যারা পান করে, স্বর্ণাভ
যাদের গোঁফ,আমি যে দেখেছি তাদের বর্বর অহঙ্কার,

তোর সুন্দর বাহারে ! তোদের কয়েকটা
মৃত্যুই শুধু বাঁচতে পারে আমার জীবন ।'
এবং ওরা উত্তরে বলেছে :
'এই তো আমি, স্বদেশ আমার !'
গোঁফ যাদের বাদামী, ঘর যাদের শান্ত কোনো গাঁয়ে,
যেখানে চন্দ্রলোকের মতো বিবর্ণ সব ঈশ্বরপুত্রেরা আর
পূর্বপুরুষেরা ক্যালভারির প্রস্তরতুলা বর্ণময়, সেই
সব ছোট ছোট সুরাপায়ীরা এমন কথাই বলেছিলো ।

এ কবিতায় নিশ্চিতভাবে তিনি আমাদের কথাই বলেছেন। শিহরণ ছাড়া এ কবিতা পড়া যায় না, কবিতাটির অন্তিম বিপর্যয় আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় বিদ্রুপভরা এক তিক্ত স্বাদের মুখোমুখী :

মৃতদেহের এই প্রচণ্ড ব্যারিকেড অন্তত কৃষ্ণকেশী
মানুষের ভূখণ্ডকে চিরদিন রক্ষা করে যাবে স্বর্ণাভ
হানাদারদের হাত থেকে···

পাণ্ডুলিপিটা পুনরায় পড়তে গিয়ে বুঝলাম—শুধু কবিতাটুকুই আমাকে আন্দোলিত করছে না। ওই শব্দগুলোর মধ্যে দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন স্যাঁ-পল রু, যেন জীবন নিজেই কথা বলছে আমার সঙ্গে। এত স্পষ্ট করে কথা বলছেন স্যাঁ-পল রু যে কথাগুলোকে প্রসঙ্গচ্যুত করতে আমি দ্বিধা-বোধ করছি, নিজেকে আবদ্ধ রাখছি দুটি বাক্য উদ্ধৃত করার মধ্যে। বাক্যদুটি মাক্স 'নরদোকে দেওয়া তাঁর এক উত্তর থেকে নেওয়া। নরদো, ভের্লেন ও বোদলেয়ার সহ তাঁর যুগের আত্মিক মহত্ত্বে যাকিছু অবদান রেখেছিলো, তার সবটুকুকেই অবক্ষয় ও হিস্টিরিয়ার লক্ষণ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন :

'বৈপ্লবিক সংকট, নেপোলিয়নিক যুদ্ধ এবং ১৮৭০-এর সাম্প্রতিক রক্তপাত ফ্রান্সকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে, তাঁর এই অনুমানটি বাড়াবাড়ি নয় কি ? এই-সব বিপর্যয়, বিশেষত শেষোক্ত ঘটনাটি আমাদের ল্যাতিনসুলভ মূর্খতাকে শুধরে নিতেই বরং সাহায্য করেছে, আমাদের বুকে পা রাখতে এসেছিলো যে ফাউস্ত, তার চিন্তাশক্তিকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের বাধ্য করেছে।'

এটা যখন পড়ি, সংবাদপত্রগুলো তখন গুরুত্বসহকারে প্রশ্ন তুলছিলো প্রাণবন্ত সেই ফ্রান্স শেষ হয়ে গেছে কিনা, এবং আজকের ফ্রান্সকে অপরাধীর মতো নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য করা উচিত কিনা। তাই, আমার স্বদেশের সমস্ত ক্যালভারি জুড়ে, 'চলার পথের প্রতিটি সরাইখানায়' আমি খুঁজে পেয়েছিলাম 'অনন্য' স্যাঁ-পল রুকে। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর তাঁর রেখে-যাওয়া এক যন্ত্রণাময় আশা, যে আশার খোঁজ মেলে তাঁর খণ্ড-বিখণ্ড হৃদয়ে। এ প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য স্যাঁ-পল রুকে এমন এক ভবিষ্যতের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যেখানে

তাঁকে ভুলে যাওয়া হবেনা, চিরদিনের জন্যে যুক্ত করা হবে কাঁটাহীন এক গোলাপের সঙ্গে, এ গোলাপ আমাদের ফ্রান্স, আমাদের নিজস্বতা। প্রবন্ধ শেষ হোক স্যাঁ-পল রয়ুর নিজস্ব কথা দিয়েই, আবার তাঁকে বলতে দেওয়া হোক ভূখণ্ডের প্রান্তস্থিত সেই গ্রামের কথা, জুন মাসে লেইগলের পথ ধরে কোথায় চলেছিলো পলাতকের দল, আর শ্বপাঙ হানাদারেরা তাদের আগেই সেখানে পৌঁছতে পারে কি না ঃ

রসকাঁভেল

সাধারণ চিত্র, বর্ণময় শিশু, গ্রাম, সে এক ছোট্ট গ্রাম, সেখানে এক প্রকাণ্ড পাথুরে ছাগলের গলায় ঘণ্টি বাজে রুন-ঝুন রুন-ঝুন, অগভীর সাগরে তার নগ্নপদ ডুবিয়ে দেয় রসকাঁভেল, দোদুল কোনো জলযানের পাদদেশে বিস্তীর্ণ যে সাগরের নীলবর্ণ শরীর।

আহা, মোর সহজ-সরল ভবিতব্য, ডুমুর, দেওদার আর ইউ গাছের ছায়ায় ছায়ায় যেখানে পাখিদের গানের সঙ্গে মেশে শিশুদের তীক্ষ্ণ কলরব···

সন্ধ্যায় শোকাকুল করমোরা পাখিদের নীড়মুখী ফেরা, অনেক অনেক নিচে, কামারের শৈলসানুতে সেই নীড়, ঊষাকালে নীড়ছাড়া পাখি, কেউ কেউ ডানা মেলে ত্রিভুজ আকারে, জঙ্গী বাহিনীসম সাগরের বুক ছুঁয়ে উড়ে যায় অন্য পাখিরা, শিকারী কুকুরের ঝুলে পড়া কানের মতো নিচু এই উড়ে উড়ে যাওয়া, সাগরের বুকে যার ক্লান্ত শরীরখানি মৃতদেহের অবশেষ শুধু।

এখানে মানুষ হাসে কাঁদে, এখানে মানুষ বাঁচে-মরে, সব যেন উপকথা এক, পৃথিবীর মানুষ আর সাগরের মানুষ। এখানে প্রতিটি দিনই কর্মদিবস, অবিরাম মেহনত শুধু এবং প্রতিটি দিন রবিবার হেথা কেননা মদ্যপ যতো—আহা, ছোট ছোট পীতাভ চোখে ব্রিট্যানির বিষণ্ণ সে মুখ শস্যক্ষেত আর প্রান্তর আর ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে অবিরাম আসে যায় কালভারিতে, সময়ের সপুঁষ ক্ষতে ক্ষয়ে-যাওয়া কালভারি এই।

"গোলাপ এবং পথের কাঁটা" থেকে এ কবিতাটা আমি শুধুমাত্র এই কারণেই উদ্ধৃত করিনি যে কারকাসঁর কবি জো বুসকে আমাকে যে মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলেন এটি তার শেষ কবিতা, বরং উদ্ধৃত করেছি এই কারণে যে এ কবিতার অন্তিম স্তবকটি শুরু হয়েছে এমন এক পঙক্তি দিয়ে যা এক পিতার ভালোবাসা এবং এক শহীদের ভবিতব্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে ঃ

এখানে, এইখানেই তুমি জন্মেছিলে দিভিনে···

এই বিষণ্ণ যুগের মানুষেরা, আমার স্বদেশবাসীরা, এসো, ধীরে ধীরে পুনরা-

বৃত্তি করো 'অনন্য'-র শিক্ষাকে, যা এখন আর কারুর কাছেই দুর্বোধ্য নয় :
এখানে, এইখানেই তুমি জন্মেছিলে দিভিনে…
এইখানে, পৃথিবীর আর চিন্তার দুরূহতম প্রদেশে, ফ্রান্স আর সাগরের;
সীমানায়, সমস্ত কবিতার সীমান্তে, আমাদের সকল আশার সীমারেখায়।

অনুবাদ / অসীম চট্টোপাধ্যায়